ভারতের কৃষ্ণভাবনা



সেবন্তী সিন্‌হা

ভারতের কৃষ্ণভাবনা

সেবন্তী সিন্‌হা

ISBN : 978-93-87800-40-3

9 789387 800403

₹ 300

SANSKRIT PUSTAK BHANDAR
38, Bidhan Sarani, Kolkata-6
Phone : (033) 2241 1208
sanskritpustakbhandar@gmail.com
www.sanskritpustakbhandar.com

● প্রকাশক ঃ
দেবাশিস ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
Ph. 2241-1208

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০১৮

ISBN : 978-93-87800-40-3

● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র।

● মুদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মঙ্গলাচরণ

ফুটিল কুসুম কামারপুকুরে
অবনী প্লাবিত সুবাসে যার
ধরার স্বর্গ দক্ষিণেশ্বর
ধন্য হয়েছে পরশে তার।

জীর্ণ ধরার শীর্ণ তনুতে
উষ্ণ শোণিত করিয়া দান
মানবের প্রেমে পাগল ঠাকুর
কালিমা তাহার করেছো পান।

ভাঙ্গিয়া প্রাচীর অজ্ঞানতার
লোকশিক্ষার খুলিয়া দ্বার
সর্বধর্ম সমন্বয়ের
তুমিই হয়েছ সূত্রধার।

প্রণমি তোমার চরণকমলে
জগতের প্রভু তারণহার
যে লবে শরণ তোমার চরণ
না রবে দুঃখ ভুবনে তার।

সূচীপত্র

অবতরণিকা

কত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হল এই ভারতীয় সভ্যতার। এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এক বিপুল সংখ্যক মানুষের এক সুনিবিড় আস্থা, এক সুগভীর বিশ্বাস যাকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে জন্মলাভ করেছে কত অগণিত বেদ-পুরাণ-উপনিষদ-সাহিত্য যার প্রায় সমস্তটির প্রাণবায়ু হলেন এক অবিস্মরণীয় বহু-বিতর্কিত পরম শ্রদ্ধার সেই বিরাট পুরুষ-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ থেকে শুরু করে তার অনেক পরবর্তী সময় পর্যন্ত দেখি এক বিপুল সংখ্যক মানুষের হাসি-কান্না-আনন্দ-দুঃখ-চিন্তা-ভাবনা-সামাজিকতা-রাজনীতি-সমাজচেতনার সঙ্গে দুগ্ধের সঙ্গে ধবলতার মত জড়িয়ে আছে এই আস্থা, এই বিশ্বাস। অসংখ্য শ্রদ্ধালু মানুষের হৃদিযমুনার কুলে মনোরূপ কদম্ববৃক্ষ-মূলে অধরে মধুবর্ষী মুরলী ধারণ ক'রে বঙ্কিমঠামে সদা দণ্ডায়মান সেই ব্রজদুলাল। তাই যুগ থেকে যুগান্তরে অসংখ্য মানবকুল তাঁর ধরাধামে আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে গোলকধাম প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত সমগ্র লীলা ও তাঁর গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছু জানতে বড়ই ব্যগ্র। কিন্তু কৃষ্ণকথা তো আর পাঁচটা পার্থিব বস্তুর মত সঙ্কীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়! কৃষ্ণকথা হল পরম অপার্থিব তত্ত্ব যা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সীমাহীন পরিসরে অগণিত শাস্ত্র, গ্রন্থ, সাহিত্যে যার সমুদায় মন্থন করে তাঁর সম্পর্কে অন্তরে একটি সামগ্রিক স্বচ্ছ অখণ্ড বোধ-চিত্র নির্মাণ করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। তাই মানুষকে তাঁর সম্পর্কে সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ পাঠ ক'রে আত্মতৃপ্ত থাকতে হয়। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খণ্ড, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যার ফলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের অন্তরে আংশিক বা বিকৃত ধারণা গড়ে ওঠে। তাই বিভিন্ন শাস্ত্রে, গ্রন্থে, সাহিত্যে তাঁর সম্পর্কে যা অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তার থেকে অতি কিঞ্চিৎ মাত্র চয়ন ক'রে আমার এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর গবেষণাপত্রে গ্রথিত করার প্রয়াস করেছি। বিভিন্ন শাস্ত্র ও গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেগুলি অতি স্বল্প হলেও উৎসুক মানবকুল একটি ক্ষুদ্র পরিসরে আত্মস্থ ক'রে যাতে তাঁর সম্পর্কে তাঁদের অন্তরে একটি সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারেন সে ব্যাপারে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কারও কাজে লাগলে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে ক...।

এই গবেষণা পত্রের এক একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছি 'তরঙ্গ'। কৃষ্ণতত্ত্ব তো সীমাহীন মহাপারাবার। মহাসমুদ্রের সমগ্র সত্ত্বাটিকে তো কারও পক্ষে এক সঙ্গে জানা সম্ভব নয়। মহাসমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তিকে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা ঢেউ তাকে স্পর্শ ক'রে সেই মহাসমুদ্রের সমগ্র সত্ত্বা সম্পর্কে তাকে আভাস প্রদান করে। তদ্রূপ আমার এই গবেষণা পত্রের প্রতিটি অধ্যায় সেই কৃষ্ণতত্ত্ব মহাপারাবারের এক একটি তরঙ্গ হয়ে শনৈঃ শনৈঃ পাঠকবর্গকে সেই মহাপারাবারের কিছুটা গভীরে প্রবেশের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা নিবারণের পথ প্রদর্শন করবে এই আশা নিয়ে প্রতিটি অধ্যায়ের এই নামকরণে প্রয়াসী হয়েছি।

এই গবেষণাপত্র গ্রথিত করতে গিয়ে যে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন হয়েছে তার বেশীরভাগটিই বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে বা নিজে ক্রয় করে পাঠ করতে হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু শতাব্দীপ্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থ যেগুলি থেকে বহুবিধ অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলির অতি দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ইন্টারনেটে লব্ধ ডিজিটাল লাইব্রেরী বা অন্যান্য উৎস থেকে পাঠ করতে হয়েছে যাদের অনেকের পরিপূর্ণ গ্রন্থ পরিচয় পাওয়া যায় নি। ফলে গ্রন্থপঞ্জীতে সেগুলির অনেকের উপযুক্ত গ্রন্থ পরিচয় রাখতে অপারগ হয়েছি। তাছাড়া ইনটারনেটলব্ধ সেই সমস্ত গ্রন্থ কখনও কখনও এত অস্পষ্ট বা গ্রন্থচিত্রগুলি এতই জীর্ণ গ্রন্থ থেকে নেওয়া যে অনেক সময় তাদের পাঠোদ্ধার করা খুবই দুষ্কর হয়েছে। ফলে এই পত্রের স্থানে স্থানে সেখান থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে গিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সামান্য কিছু ভ্রান্তি থেকে যায় সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে সমগ্র পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে আমার নিবেদন তাঁরা যেন কেউ আমার এই গবেষণা-পত্রটিকে 'ধর্মপুস্তক' ব'লে ভ্রান্তি ক'রে না ফেলেন। এটি কোনমতেই কোন ধর্ম পুস্তক নয়। বিভিন্ন প্রাচীন-অর্বাচীন গ্রন্থসমূহে এক পৌরাণিক বহু আলোচিত বিরাট পুরুষ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার থেকে অতি সামান্য অংশ চয়ন ক'রে স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ নিজস্ব মতামতসহ এই পত্রে গ্রথিত করেছি মাত্র। কোন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য এই গবেষণা পত্রের নয়।

প্রথম তরঙ্গ

অনাদি, অনন্ত, দুর্জ্ঞেয়, অনতিক্রম্য পারাবার সদৃশ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যুগ হতে যুগান্তরে অগণিত দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, মানব, দানব নির্বিশেষে সকলের পরমাশ্রয় রূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত। তার না আছে আদি, না আছে অন্ত। কৃষ্ণতত্ত্ব পারাবারের অমৃততুল্য মধুময় ভাবতরঙ্গে একবার সর্বপ্রকার ধর্ম অর্থাৎ দৈহিক, বৌদ্ধিক, আত্মিক, মানসিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ ক'রে অঙ্গ ভাসিয়ে দিতে পারলে না থাকবে কোন অভাব, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যুভয়, বিচ্ছেদভয় না থাকবে লোভ-লালসাদি ষড়রিপুর প্রভাব বা চাওয়া-পাওয়ার হিসাবের মানসিকতা। কৃষ্ণতত্ত্বের এই মূল বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ সুললিত ও সুসংবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করেছেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাঁর গানের ডালিতে—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।।

কৃষ্ণানুরাগের সুফল, কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে যুগ হতে যুগান্তরে কৃষ্ণপ্রেমে সুস্নাত ভক্তহৃদয় তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন অগণিত শাস্ত্র, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতিতে। বস্তুত কৃষ্ণতত্ত্বের গভীরতা, ব্যাপকতা, প্রসারতা এতই বেশী যে তা ব'লে বা লিখে শেষ করা যাবে না। তথাপি এ বিষয়ে এই গ্রন্থের যথাযোগ্য স্থানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার বাসনা রইল।

সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর, পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। সমস্ত শাস্ত্রেই সর্বসম্মত

ভাবে কথিত হয়েছে যে তাঁর প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা কোন শাস্ত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। মহর্ষি বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়সূত্রে তাঁকে এই জগৎসৃষ্টির আদিকারণ হিসাবে বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ এই জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রচেতনার মধ্যেও এই তত্ত্ব ও অনুভূতির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় তাঁর লেখনীর মধ্যে—

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল—
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে।।
তিনি নিজ অনুপম মহিমামাঝে নিলীন—
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ বেদান্ত।
পরব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, অতি মহান—
তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত।।[১]

মৎস্যপুরাণের একশত উনিশ অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম ছত্রের প্রথম পদে জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—"অজ্ঞাতবস্তুচরিতং" অর্থাৎ তাঁর চরিততত্ত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই অজ্ঞাত। অসীম মহাশূন্য ভেদ ক'রে যেমন তার শেষ সীমায় পৌঁছানো যায় না, জাগতিক ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা বিচার ক'রে তাঁর চরিততত্ত্বরূপ অতল মহাসমুদ্রের তল পাওয়া তেমনই অসম্ভব।

বাহ্যিকভাবে অন্ধ ভক্তকবি সুরদাস তাঁর অমর রচনার মধ্যে অতি সংক্ষেপে কৃষ্ণতত্ত্বের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের যে আলোচনা করেছেন তা এককথায় অতুলনীয় ও অনবদ্য—

আদি সনাতন, হরি অবিনাসী। সদা নিরন্তর ঘঠ ঘট বাসী।।
পূরন ব্রহ্ম, পুরান বখানৈ। চতুরানন, সিব অন্ত ন জানৈঁ।।
গুন-গন অগম, নিগম নাহি পায়ৈ। তাহি জশোদা গোদ খিলায়ৈ।।
এক নিরন্তর ধ্যায়ৈ জ্ঞানী। পুরুষ পুরাতন সো নির্বানী।।
জপ-তপ-সংজম ধ্যান ন আয়ৈ। সোঈ নন্দ কৈঁ আঁগন ধায়ৈ।।
লোচন-স্রবন ন রসনা-নাসা। বিনু পদ-পানি করৈ পরগাসা।।

১। গীতবিতান—পূজা ও প্রার্থনা

বিস্বম্ভর নিজ নাম কহায়ৈ। ঘর-ঘর গোরস সোই চুরায়ৈ।।
সুক-সারদ সে করত বিচারা। নারদ-সে পাবহিঁ নহিঁ পারা।।
অবরন-বরন সুরনি নহিঁ ধারৈ। গোপিন কে সো বদন নিহারৈ।।
জরা-মরন তেঁ রহিত, অমায়া। মাতু-পিতা, সুত, বন্ধু ন জায়া।।
জ্ঞান-রূপ হিরদৈ মৈঁ বোলৈ। সো বছরনি কে পাছেঁ ডোলৈ।।
জলধর, অনিল, অনল, নভ, ছায়া। পঞ্চতত্ত্ব তৈঁ জগ উপজায়া।।
মায়া প্রগটি সকল জগ মোহৈ। কারন-করন করৈ সো সোহৈ।
সিব-সমাধি জিহি অন্ত ন পায়ৈ। সোই গোপ কী গাই চরায়ৈ।।
অচ্যুত রহৈ সদা জল-সাঈ। পরমানন্দ পরম সুখদাঈ।।
লোক রচে রাখৈঁ অরু মারে। সো গ্বালনি সঙ্গ লীলা ধারৈ।।
কাল ডরৈ জাকেঁ ডর ভারী। সো উখল বাঁধ্যৌ মহতারী।।
গুন অতীত, অবিগত, ন জনায়ৈ। উস অপার, স্রুতি পার ন পায়ৈ।।
জাকী মহিমা কহত ন আয়ৈ। সো গোপিন সঙ্গ রাস রচায়ৈ।।
জাকী মায়া লখৈ ন কোঈ। নির্গুন-সগুন ধরৈ বপু সোঈ।।
চৌদহ ভুবন পলক মৈঁ টারৈ। সো বন-বীথিন কুটী সঁয়ারৈ।।
চরন-কমল নিত রমা পলৌয়ৈ। চাহতি নৈঁকু নৈন ভরি জোয়ৈ।।
অগম, অগোচর, লীলা-ধারী। সো রাধা-বস কুঞ্জ-বিহারী।।
বড়ভাগী য়ৈ সব ব্রজবাসী। জিন কৈ সঙ্গ খেলৈঁ অবিনাশী।।
জো রস ব্রহ্মাদিক নহিঁ পায়েঁ। সো রস গোকুল-গলিনি বহায়েঁ।।
সূর সুজস ব্রহ্মাদিক নহিঁ পায়েঁ। সো রস গোকুল-গলিনি বহায়েঁ।।
সূর সুজস কহি কহা বখানৈ। গোবিন্দ কী গতি গোবিন্দ জানৈ।।

—যে শ্রীহরি সমস্ত কিছুর আদি কারণ, যিনি সনাতন, অবিনাশী, সদা সর্বদা সকলের হৃদিমন্দিরে যাঁর অবস্থান, পুরাণ যাঁকে পূর্ণব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন, স্বয়ং ব্রহ্মা, মহাদেব যাঁর তল পান না, বেদ পর্যন্ত যাঁর সম্যক গুণগান করতে অসমর্থ, জ্ঞানীগণ সতত যাঁর ধ্যানে মগ্ন, যে নির্বাণস্বরূপ পুরাণ-পুরুষ জপ, তপ, সংযম সহ ধ্যানের দ্বারাও লভ্য নন, সেই নন্দনন্দন

ব্রজগোপাল নন্দবাবার অঙ্গনে ছুটে বেড়ান। যিনি চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় বিহীন, যিনি হস্ত-পদ ব্যতিরেকেই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করেন, যিনি বিশ্বম্ভর নামে খ্যাত, তিনি গোকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে ননী-চুরি করে বেড়ান। শুকদেব, সারদাদি দেব-দেবীগণ অনুক্ষণ যাঁর ধ্যান করেন, দেবর্ষি নারদ পর্যন্ত যাঁর অন্ত পান না, যে অরূপ রূপকে বেদ পর্যন্ত ধারণ করতে অক্ষম, সেই তিনিই গোপিনীদের কাছে ধরা দেন। যিনি বার্ধক্য ও জড়া রহিত এবং মায়ার বশ নহেন, যাঁর মাতা-পিতা-পুত্র-কলত্র-ভ্রাতা কেউ নেই, যিনি জ্ঞানস্বরূপ হৃদয়ে বাণীর আধার, তিনিই ব্রজের গোঠে গোবৎসের পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করেন। জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ বিস্তৃত হয়ে পঞ্চতত্ত্বময় এই সারা ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকটিত করেছে, স্বীয় মায়াপ্রভাবে যিনি সমস্ত সংসারকে মোহিত করে রেখেছেন, যিনি জগতের কারণ তথা জগৎ সৃষ্টির স্থপতি ও জগতের প্রভু এই তিন রূপে দীপ্তিশীল, দেবাদিদেব মহাদেব ধ্যানযোগেও যাঁর অন্ত পান না, তিনি গোয়ালাদের গোরু চড়ান। যিনি অচ্যুত, সদা ক্ষীরসমুদ্রশায়ী, পরমসুখদাতা পরমানন্দস্বরূপ, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা তিনিই গোপবালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন। যাঁর ভয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ভীত, তাঁকে মা যশোদা উদুখলে বন্ধন করেন। যিনি গুণাতীত, অবাঙ্মনসগোচর, যাঁর অপার বৈভবের অন্ত বেদেরও আয়ত্তাধীন নয়, যাঁর মহিমা বর্ণনাতীত, তিনি গোপীদের সাথে রাসলীলা করেন। তাঁর মায়া কারও কাছে বোধগম্য নয়, তিনি নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই। যাঁর ইচ্ছাতে পলকের মধ্যে চৌদ্দভুবন লয়প্রাপ্ত হতে পারে সেই তিনিই বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ সজ্জিত করেন। লক্ষ্মীদেবী যাঁর শ্রীচরণকমল পরিচর্যায় সতত ব্যস্ত এবং তিনি একবারের জন্যও তাঁর অধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এই আশায় আকুল, সেই অগম্য, অগোচর লীলাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বশীভূত হয়ে যে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে বাস্ করেন সেখানকার সকল ব্রজবাসীগণ বড়ই সৌভাগ্যবান যাদের সঙ্গে অবিনাশী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। যে রসের আস্বাদ-লাভে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্যন্ত অপারগ, সেই প্রেমরস গোকুলের পথে পথে অবিরল ধারায় বর্ষিত হয়। সেই অপার মহিমার বর্ণনা সুরদাস কিভাবে করবে! গোবিন্দের গতি-প্রকৃতি তো কেবলমাত্র গোবিন্দই জানেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

কৃষ্ণনাম বড়ই মিষ্ট। এই নাম একবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে সমস্ত মনঃপ্রাণ আকুল করে। শরীরের চেতনা, সমস্ত ইন্দ্রিয় পরম পুলকে আবিষ্ট হয়। মনে হয় যেন সমস্ত জগত আনন্দময়। এক মহা জ্যোতির্ময় আলোকের ঝর্ণাধারা হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার, সংকীর্ণতা, কলুষতা, পাপাচার, গ্লানি, অসূয়াবোধ সমস্ত কিছুকে ধৌত ক'রে মানুষকে করে নির্মল, পবিত্র যা তাকে তাঁর ভবনে প্রবেশের উপযুক্ত ক'রে তোলে। নন্দনন্দন ব্রজরাখাল বনমালী মুরলীধারী গোপগোপীশ্বর তমালশ্যামল যমলার্জুনভঞ্জন নন্দগোপ-প্রিয়াত্মজ নবনীতনটন মুচুকুন্দপ্রসাদক সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কোটিসূর্যসমপ্রভ ইলাপতি বেনুনাদবিশারদ সর্ব্বভূতাত্মক বেদবেদ্য দয়ানিধি পূণ্যশ্লোক জগদগুরু জগন্নাথ শ্রীপদাম্বুজ পরমব্রহ্ম গোবিন্দ দামোদর নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের পরমপবিত্র শ্রীনামের মাধুর্য-লহরী বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রভাসখণ্ডে বলা হয়েছে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।

—ভগবান কৃষ্ণের নাম সকল মধুময় দ্রব্যের মধ্যে মধুরতম, সকল শুভঙ্করের মধ্যে শুভঙ্করতম, বৈদিক সাহিত্যরূপ সুমিষ্ট দ্রাক্ষাকুঞ্জের সচ্চিদানন্দময় মধুরতম দ্রাক্ষাফল। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ভৃগুগণ। তাঁর নাম বিশ্বাসের সঙ্গে বা হেলায় কীর্তন করলেও তা কীর্তনকারীকে মুক্তিপ্রদান করে।

কৃষ্ণতত্ত্বের এই অপার মাধুর্য-রহস্য মূর্তরূপে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের চেতনায়। এ ব্যাপারে তাঁর গানের অতুল স্বর্ণভাণ্ডার থেকে দুটি পঙক্তি চয়ন করা হল—"মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ", এবং "মধুর, তোমার শেষ যে না পাই।" বস্তুত তিনি যাঁর উদ্দেশ্যেই তাঁর এই নৈবেদ্য অর্পণ ক'রে থাকুন না কেন, এই দুটি পঙক্তির মর্মার্থ পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সর্বৈব ভাবে প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণ মধুময়। তাঁর সমস্ত সত্তা থেকে নিরন্তর প্রবাহিত হয় অনন্ত মধু। তাঁর সমস্ত সত্ত্বা নিয়ত অনন্ত মাধুর্য-রসে নিষিক্ত। পরম শ্রদ্ধেয়

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছেন— "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চারিটি মাধুর্যের বার্তা দিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত। বিশ্বসাহিত্যে এই বার্তা আর কোথাও নাই। রূপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য ও লীলামাধুর্য। এই চারি মাধুর্যে নন্দনন্দন অনন্যসাধারণ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যেমন জন্মহীনের জন্ম, দিব্যজন্ম। তাঁহার রূপও যেমন অরূপের রূপ, শাশ্বত নিত্যরূপ, নবকিশোর নটবর। সে রূপে শুধু জগৎ ভুলে না আপনার রূপে আপনিও বিমুগ্ধ। আত্ম পর্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর!" শ্রীবল্লভাচার্য পূর্ণপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সার্বিক মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।১।।
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।২।।
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৩।।
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৪।।
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৫।।
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৬।।
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরম্ মুক্তং মধুরম্।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৭।।
গোপা মদুরা গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।৮।।

হে কৃষ্ণ! তোমার অধর মধুর, তোমার মুখমণ্ডল মধুর, তোমার নয়নযুগল মধুর, তোমার হাস্য মধুর, তোমার হৃদয় মধুর, তোমার গমন মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি।।১।।

হে কৃষ্ণ! তোমার বাক্য মধুর, তোমার চরিত্র মধুর, তোমার বসন মধুর, তোমার বঙ্কিম-ভঙ্গী মধুর, তোমার চলন মধুর, তোমার মায়া মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি।।২।।

হে কৃষ্ণ! তোমার বাঁশরী মধুর, তোমার শ্রীপাদপদ্মরেণু মধুর, তোমার হস্তদ্বয় মধুর, তোমার শ্রীচরণকমলদ্বয় মধুর, তোমার নৃত্য মধুর, তোমার সখ্য মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি।।৩।।

হে কৃষ্ণ! তোমার গীত মধুর, তোমার পান মধুর, তোমার ভোজন মধুর, তোমার শয়ন মধুর, তোমার রূপ মধুর, তোমার অলকা-তিলকা মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি।।৪।।

হে কৃষ্ণ! তোমার ক্রিয়া মধুর, তোমার ত্রাণ মধুর, তোমার হরণ মধুর, তোমার প্রেম মধুর, তোমার ঐশ্বর্য মধুর, তোমার শান্তি মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি। তোমার সকল কিছুই মধুময়।।৫।।

হে কৃষ্ণ! তোমার গুঞ্জা মধুর, তোমার মালা মধুর, তোমার যমুনা মধুর, তোমার যমুনার তরঙ্গ মধুর, তোমার যমুনা-বারি মধুর, তোমার পঙ্কজ মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি। তোমার সকল কিছুই মধুময়।।৬।।

হে কৃষ্ণ! তোমার গোপীগণ মধুর, তোমার লীলা মধুর, তোমার সংযোগ মধুর, তোমার বিয়োগ মধুর, তোমার নিরীক্ষণ মধুর, তোমার শিষ্টাচার মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি। তোমার সকল কিছুই মধুময়।।৭।।

হে কৃষ্ণ! তোমার গোপগণ মধুর, তোমার গাভীসকল মধুর, তোমার লয় মধুর, তোমার সৃষ্টি মধুর, তোমার পীড়ন মধুর, তার ফলও মধুর, তুমি মাধুর্যের অধিপতি। তোমার সকল কিছুই মধুময়।।৮।।

শ্রীযুক্ত প্রভু বিপিনবিহারীদের গোস্বামী তাঁর শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী গ্রন্থের ছয়শত ছয় সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন ভগবান শ্রীহরির নাম এতই মধুর যে বেদে রামায়ণে পুরাণে ভারতে আদি অন্তে মধ্যে সর্বত্র তার নাম গীত হয়—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মাধুর্য প্রকাশের বিভিন্ন দিকগুলি আমরা বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করব।

তৃতীয় তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে উপলব্ধ তা জানতে প্রয়াসী হব।

আমরা কৃষ্ণের বৃত্তান্ত যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ থেকে পাই সেগুলি হল— মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণ। পুরাণ আবার আঠারটি যার মধ্যে কয়েকটিতে আমরা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ পাই। সেগুলি হল—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ ও কূর্মপুরাণ। এছাড়াও ব্যাসদেব বর্ণিত 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে'ও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে।

আমরা একদিকে মহাভারত ও অন্যদিকে হরিবংশ ও উপরোক্ত পুরাণসমুহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তান্তের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখতে পাই যে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণজীবনের যে দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে, হরিবংশ ও উপরোক্ত পুরাণসমূহে সেই দিকগুলির আলোচনা খুব একটা নেই। অন্যদিকে হরিবংশ ও উপরোক্ত পুরাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণজীবনের যে দিকগুলির প্রসঙ্গ ঠাঁই লাভ করেছে মহাভারত সেই দিক সম্পর্কে নীরব। এর কারণ সুস্পষ্ট। সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা। কাহিনীর যুক্তিগ্রাহ্য অগ্রগতির স্বার্থে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখা অবশ্য প্রয়োজন। অন্যথায় কাহিনীর গুণমান ব্যাহত হয়। মহাভারতে যা বিবৃত হয়েছে তা কুরু-পাণ্ডবদের ইতিহাস। ফলতঃ কুরু-পাণ্ডবদের ইতিহাসেব সঙ্গে যে যে দিকগুলি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেগুলিই মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়েছে। মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করি পাণ্ডবদের সখা ও সহায় হিসাবে। ফলে সখা ও সহায় হিসাবে পাণ্ডবদের ইতিহাসের রাজনীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতি যে যে বিষয়ে যেখানে যেভাবে তাঁর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী ছিল সেখানেই ব্যাসদেব তাঁকে উপস্থাপিত করেছেন যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু অন্য প্রসঙ্গেরও সামান্য পরিমাণে অবতারণা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণজীবনের অন্য দিক যথা তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-

বার্ধক্য প্রভৃতি সময়ের লীলা মহাভারতে সন্নিবেশিত করার সুযোগ ব্যাসদেবের ছিল না। ফলে শ্রীকৃষ্ণজীবনের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি মহাভারতে অনুপস্থিত থেকে যায়। একারণেই মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইত্যাদির মত অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেও ব্যাসদেবের অন্তর নিবিড় অতৃপ্তি ও কি যেন এক অজানা যন্ত্রণায় পরিপ্লাবিত হয়ে ছিল। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণজীবনের উপরোক্ত অন্যান্য দিকগুলি বর্ণনের জন্য তিনি রচনা করেন অমূল্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

যাই হোক অন্য যেসমস্ত গ্রন্থ থেকে আমরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ পাই তাদের মধ্যে হরিবংশ অন্যতম। বস্তুত হরিবংশ লেখাই হয়েছিলো শ্রীকৃষ্ণজীবনের অবশিষ্ট দিকগুলি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে।

এছাড়া ছান্দোগ্যোপনিষদেও শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আছে। সেখানে ৩/১৭/৬ মন্ত্রে দেখি ঘোর নামক আঙ্গিরসবংশীয় এক ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—"তুমি অক্ষত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত"—

"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তোবাচাপিপাস এব স বভুব, সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি"।

বায়ুপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে কৃষ্ণপ্রসঙ্গের উল্লেখ আছে—

কংসস্য চাপি দৌরাত্ম্যমেকান্তেন সমুদ্ভবঃ।
বাসুদেবস্য দেবক্যাং বিষ্ণোর্জন্ম প্রজাপতেঃ।।

বায়ুপুরাণ ১।১৪৮

বায়ুপুরাণের ছিয়ানব্বইতম অধ্যায়ে স্যমন্তক মনি উদ্ধারার্থে ঋক্ষরাজের সঙ্গে যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাসুদেব কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—

যুযুধে বাসুদেবস্ত বিলে জাম্ববতা সহ।
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্।।
প্রবিষ্টে চ বিলং কৃষ্ণে বাসুদেবপুরঃসরাঃ।
পুনদ্বারবতীমে্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন।

বায়ূপুরাণ ৯৬।৪৫-৪৬

বামনপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা কৃষ্ণপ্রসঙ্গ পাই। এখানে দেখি দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় পাপমুক্তি কামনায় পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবাসুদেব সকাশে প্রার্থনা করছেন—

নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গরুড়ধ্বজ।
শঙ্খচক্রগদাপাণে বাসুদেব নমোঽস্তুতে।।১৪
নমস্তে নির্গুণানন্ত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে।
জ্ঞানাজ্ঞান নিরালম্ব সর্বালম্ব নমোঽস্তুতে।।১৫
রজোযুক্ত নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মমূর্তে সনাতন।
ত্বয়া সর্বমিদং নাথ জগৎসৃষ্টং চরাচরম্।।১৬
সত্ত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্তে অধোক্ষজ।
প্রজাপাল মহাবাহো জনার্দন নমোঽস্তুতে।।১৭
তমোমূর্তে অহং দোষ ত্বদংশক্রোধসম্ভবঃ।
গুণাধিযুক্ত দেবেশ সর্বব্যাপিন্ নমোঽস্তুতে।।১৮
ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলাম্বরহুতাশনঃ।
বায়ুর্বুদ্ধির্মনশ্চাপি শর্বরী ত্বং নমোঽস্তুতে।।১৯
ধর্মো যজ্ঞস্তপঃ সত্যমহিংসা শৌচমার্জবম্।
ক্ষমা দানং দয়া লক্ষ্মীর্ব্রহ্মচর্যং ত্বমীশ্বর।।২০
ত্বং সাঙ্গাশ্চতুরো বেদাস্ত্বং বেদ্যো বেদপারগঃ।
উপবেদা ভবানীশ সর্বোঽসি ত্বং নমোঽস্তুতে।।২১
নমো নমস্তেঽচ্যুত চক্রপাণে
নমোঽস্তু তে মাধব মীনমূর্তে
লোকে ভবান্ কারুণিকো মতো মে
ত্রায়স্ব মাং কেশব পাপবন্ধনাৎ।।২২
মমাশুভং নাশায় বিগ্রহস্থং
যদ্ ব্রহ্মহত্যাঽভিভবং বভুব।
দগ্ধোঽস্মি নষ্টোঽস্ম্যসমীক্ষ্যকারী
পুনীহি তীর্থোঽসি নমো নমস্তে।।২৩

গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বাসুদেব নামের উল্লেখ আছে—"জগতো রক্ষণার্থায় বাসুদেবোঽজরোঽমরঃ।"

ঋগ্বেদসংহিতায় বেশ কয়েকবার 'কৃষ্ণ' নামের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে সকলেই বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ নন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোন নামটি মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণের সে বিষয়ে সংশয় আছে। এ বিষয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সুক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সুক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, ঋগ্বেদসংহিতার অনেকগুলি সুক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ" এবং "অথর্ব্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই।"

পাণিনি সূত্রেও বাসুদেব নামের উল্লেখ অছে—"বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্।" (৪.৩.৯৮)

বৌদ্ধশাস্ত্রেও কৃষ্ণ নামের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হল সূত্রপিটক। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নামের উল্লেখ আছে কিন্তু আমরা যে কৃষ্ণকে ভগবানরূপে দেখি, সূত্রপিটকে তাঁকে সেভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। এখানে তাঁর পরিচয় অসুর হিসাবে। অবশ্য বৌদ্ধদের তাঁকে এভাবে চিত্রিত করার পিছনে তাঁদের ধর্মীয় কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সেই কারণটি কি তা তাঁর মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক। তিনি তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন—"ঐ গ্রন্থে (সূত্রপিটক) কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধেরা যে কৃষ্ণকে অসুর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি ইত্যাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর 'মার' বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্ম্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 'মার'। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় 'মার' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

চতুর্থ তরঙ্গ

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে দেখি অত্যাচারী কংসের কারাগারে পূর্ণপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হল। পিতা বসুদেব সকলই অবগত আছেন পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত তাঁর এই সদ্যোজাত পুত্রসন্তান আসলে কে। কিন্তু পাষণ্ড কংসের ভয়ে ভীত পিতা বসুদেব যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত ও বিচলিত। তাই এই অংশের দশম শ্লোকে সন্তানের জীবন রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল অনন্যোপায় পিতা বসুদেবের হৃদয়ের করুণ আর্তি সকলের হৃদয় আর্দ্র করে। সদ্য তিনি এক ত্রিভুবন-মনোহর সন্তানের পিতা হয়েছেন। কোথায় তিনি পরমানন্দে উদ্বেলিত হবেন! সেসব বিস্মৃত হয়ে তিনি অন্তহীন বেদনায় দীর্ণ হৃদয় নিয়ে পুত্রকে চলে যেতে বলছেন! হোক না তাঁর পুত্র ত্রিভুবনের অধিকারী, হোক না তাঁর পুত্র এই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অজেয়, অদ্বিতীয়। তিনি তো পিতা, হোক না তিনি পরমেশ্বরের পিতা। সন্তান তো পিতার কাছে সর্বদাই শিশু। তাই সন্তানের জীবনাশঙ্কায় ব্যাকুল পিতা সদ্যোজাত সন্তানের উদ্দেশ্যে বলেন—

"জাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধরম্।
দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর।।" (শ্লোক-১০)

"হে দেবদেবেশ্বর! যদ্যপি আপনি (সাক্ষাৎ পরমেশ্বর) প্রকট হয়েছেন, তথাপি হে দেব! আমার প্রতি করুণা পূর্বক আপনি আপনার এই শঙ্খ-চক্র-গদাধারী দিব্য স্বরূপ উপসংহার করুন। হে দেব! আপনি আমার এই গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হলে কংস এখনই আমার সর্বনাশ করবে।"

মাতা দেবকীও সন্তানের জীবন রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল। তাই তিনিও জননী হওয়ার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখানুভূতিকে সুপ্ত রেখে অসহায় জননীর বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে স্বীয় সন্তানকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করার নিমিত্ত করুণ মিনতি জানান—

"উপসংহর সর্বাত্মরূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজন্মজঃ।।"
(বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক-১৩)

"হে সর্বাত্মন্! আপনি আপনার এই চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার করুন। ভগবান্! রাক্ষসের অংশে উৎপন্ন কংস যেন আপনার রূপের বৃত্তান্ত অবগত না হতে পারে।"

উত্তরে ভগবান বললেন—

"স্তুতোঽহং যত্ত্বয়া পূর্বং পুত্রার্থিনা তদদ্য তে।
সফলং দেবি সঞ্জাতং জাতোঽহং যত্তবোদরাৎ।।"
(বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক-১৪)

"হে দেবি। পূর্বজন্মে আপনি আমাকে পুত্ররূপে লাভ করতে অভিলাষ করেছিলেন। আমি আপনার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছি। এতে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হল।"

পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেব শ্রীহরি তো সর্ববাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্তের সকল বাঞ্ছা তা যদি আন্তরিক ও নিষ্কলুষ হয় তাহলে পরম করুণাময় শ্রীমধুসূদন তা পূরণ করেন। পরমপবিত্র ভক্তিময়ী দেবী দেবকী অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা উজাড় ক'রে দিয়ে নিষ্কলুষ অভিলাষ করেছিলেন জগৎপালক জগতের ত্রাতা শ্রীগোবিন্দ-গোপাল-মুকুন্দ-মুরারি-পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় সন্তানরূপে লাভ করার জন্য। তাই পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী শ্রীজনার্দন দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে ভক্তের সেই আন্তরিক বাসনা পূরণ করলেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় স্বমুখে স্পষ্ট করে বলছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

খিলহরিবংশান্তর্গত বিষ্ণুপর্বের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোক থেকে একবিংশ শ্লোকে প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মুহূর্তের রমণীয় বর্ণনা করা হয়েছে—

দেবক্যজনয়দ্ বিষ্ণুং যশোদা তাং তু দারিকাম্
মুহূর্তেঽভিজিতি প্রাপ্তে সার্ধরাত্রে বিভূপিতে।।১৪

—(অষ্টম মাসে) এক মধ্যরাত্রে পুণ্য অভিজিৎ মুহূর্ত উদয় হলে ভগবান বিষ্ণু মাতা দেবকীর গর্ভ হতে পুত্ররূপে মর্ত্যভূমে প্রকট হলেন।

সাগরাঃ সমকম্পন্ত চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দনে।।১৫।।

—ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রকট হওয়ার মুহূর্তে সমুদ্র (আনন্দের আতিশয্যে) প্রবল জোয়ারের বেগে আন্দোলিত হতে শুরু করল। পর্বতসমূহ আন্দোলিত হতে শুরু করল। যিনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন সেই শেষনাগ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নির্বাপিতপ্রায় অগ্নি (যেন প্রভুর আবির্ভাবে নবযৌবন প্রাপ্ত হয়ে) নিবিড় পুলকে ভগবানকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে তার সহস্র সহস্র জ্যোতির্ময় শিখা পুনঃ বিস্তার করল।

শিবাশ্চ প্রববুর্বাতাঃ প্রশান্তমভবদ্ রজঃ।
জ্যোতীর্প্যতিব্যকাশন্ত জায়মানে জনার্দনে।।১৬।।

—ভগবানের আবির্ভাব মুহূর্তে পবিত্র পরম সুখপ্রদ মৃদুমন্দ সলিল প্রবাহিত হতে শুরু করল, আকাশে উড্ডীয়মান ধূলিকণা শান্ত হয়ে ধরণী তলে শয্যা গ্রহণ করল এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলি নব উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে উঠল।

অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্বরী।
মুহূর্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দনঃ।।১৭।।

—ভগবানের জন্মমুহূর্তে অভিজিৎ মুহূর্ত বিরাজ করছিল। রোহিণী নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে অষ্টমীর সেই রজনীকে জয়ন্তী বলা হয়। সেই সময় বিজয় নামক বিশেষ মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছিল।

অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
জায়মানো হি ভগবান্নয়নৈর্মোহয়ন্ প্রভুঃ।।১৮

—অব্যক্ত, সনাতন, সূক্ষ্মস্বরূপ পাপহারী তথা সর্বসমর্থ শ্রীভগবান নারায়ণ প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুবনমোহন স্বীয় নয়নকমলদ্বয়ের দৃষ্টিদ্বারা সকলের হৃদয় হরণ করলেন।

অনাহতা দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদন্ দিবি।
আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিং চ ববর্ষ ত্রিদশেশ্বরঃ।।১৯

—দেবলোকের দুন্দুভিসমূহ আপনা হতেই বেজে উঠে দশদিশ মুখরিত ক'রে তুলল। দেবরাজ ইন্দ্র আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণে অকুস্থল আচ্ছাদিত ক'রে তুললেন।

গীতির্মঙ্গলযুক্তাভিঃ স্তুবন্তো মধুসূদনম্।
মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্বা উপতস্থুঃ সহাপ্সরাঃ।।২০।।

—মহর্ষিগণ গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সহকারে আপন আপন মঙ্গলময় বাণীদ্বারা শ্রীমধুসূদনের স্তুতি ক'রতে ক'রতে তাঁর সেবায় নিমগ্ন হলেন।

জায়মানে হৃষিকেশে প্রহৃষ্টমভবজ্জগৎ।
ইন্দ্রশ্চ ত্রিদশৌঃ সার্ধং তুষ্টাব মধুসূদনম্।।২১।।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগত অনন্ত হাস্যোল্লাসে পরিপূরিত হল। অপরাপর দেবতাগণের সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রও মধুসূদনের স্তুতিতে হলেন মগ্ন। সর্ব জগতের পরিত্রাতা সর্ব জীব ও জড়ের চিত্তহরণকারী বর্ণনাতীত অপরূপ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত পুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎস চিহ্ন ও অন্যান্য শুভ লক্ষণ-সমন্বিত শ্রীঅঙ্গের রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ ক'রে বসুদেব হৃদয়ে নিবিড় সুখানুভূতি অনুভব করলেন। (পাপী কংসের পতন যে এবার আসন্ন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে) পুত্ররূপী স্বীয় প্রভু অধোক্ষজের স্তবগান করলেন।

তিনি এখন আর কংসভয়ে ভীত নন। তথাপি তিনি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয়টি পাপী অত্যাচারী কংসের গোচরীভূত করতে চান না। কারণ তিনি না চাইলেও পূর্বাপর ঘটনার অভিঘাতে এক গভীর মানসিক মর্মাঘাত (Trauma) তাঁর অন্তরে তো বিরাজ করছে। তাই তিনি প্রভুর কাছে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করার আবেদন জানালেন—

বসুদেবশ্চ তং রাত্রৌ জাতং পুত্রমধোক্ষজম্।
শ্রীবৎসলক্ষণং দৃষ্ট্বা যুতং দিব্যৈশ্চ লক্ষণৈঃ।
উবাচ বসুদেবস্তু রূপং সংহর বৈ প্রভো।।২২।।

দুরাচারী কংসের অসহনীয় অত্যাচারের অন্ত দর্শন করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই যদিও শ্রীকৃষ্ণ সবই অবগত আছেন, তথাপি কংসের অত্যাচারের কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের সকাশে বিবৃত করা সমীচীন মনে ক'রে সংক্ষেপে প্রভুকে বললেন—

ভীতোহহং দেব কংসস্য তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্।
মম পুত্রা হতাস্তেন তব জেষ্ঠাম্বুজেক্ষণ।।২৩।।

—হে প্রভু! আমি কংস ভয়ে ভীত। সেইজন্য আমি আপনাকে এই কথা বলছি। হে কমলনয়ন! কংস আমার অনেক পুত্রকে নিধন করেছে যারা আপনার অগ্রজ ছিল।

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বসুদেব কিন্তু ত্রিজগতে অজেয় সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে অন্যত্র রেখে আসার কথা ভাবেন নি। তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের সকাশে সভয়ে দুরাচারী কংসের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে খিলহরিবংশের তফাৎ এখানে।

কিন্তু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তো অন্তর্যামী! তিনি পিতার চিত্তবৈকল্য অনুধাবন করতে পারেন। তাই পিতার মুখে কংসের অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ ক'রে তিনি পিতাকে কিছুটা স্বস্তি দেবার জন্য বলেন—

বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং চাহরদচ্যুতঃ।
অনুজ্ঞাপ্য পিতৃব্যেন নন্দগোপগৃহং নয়।।২৪।।

বসুদেবের বাক্য শ্রবণ ক'রে ভগবান অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ (পিতার মানসিক অবস্থাকে মর্যাদা দিয়ে) পিতাকে বলেন—হে পিতঃ! আপনি আমাকে নন্দগৃহে রেখে আসুন। এই কথা ব'লে শ্রীভগবান তাঁর চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ করলেন।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে খিলহরিবংশের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের শ্রীকৃষ্ণচরিতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে কৃষ্ণজন্মমুহূর্ত বর্ণনা করা হয়েছে—

ততস্তু দশমে মাসি নভসি পার্ব্বতি।
অষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে চ তস্যাঞ্জাতো জনার্দনঃ।।
ইন্দীবরদলশ্যামঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
চতুর্ভুজঃ সুন্দরাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ।।
বসুদেবস্য জাতাসৌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।।

—তখন দশম মাসে ঘনকৃষ্ণমেঘাবৃত পুণ্য অষ্টমীর মধ্যরাত্রে নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামাঙ্গবিশিষ্ট পদ্মপত্রসদৃশ আয়তচক্ষু সমন্বিত, চতুর্ভুজ, সুন্দরাঙ্গ দিব্যাভরণে বিভূষিত বসুদেবতনয় ভগবান বাসুদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন।

কূর্মপুরাণের পূর্বভাগের চব্বিশতম অধ্যায়ের ঊনসত্তর সংখ্যক শ্লোকে কৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বসুদেবান্মহাবাহুর্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।
বভূব দেবকীপুত্রো দৈবৈরভ্যার্থিতো হরিঃ।

—দেবতাদের প্রার্থনা পূরণ ক'রে মহাবাহু জগদ্গুরু বাসুদেব বিষ্ণু বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন।

এতদতিরিক্ত কৃষ্ণজন্মবিষয়ক আর কোন বর্ণনা কূর্মপুরাণে পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে অতীব সুললিত ভাষা ও বাচনভঙ্গীর যাদুদণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মুহূর্তের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা সর্বকালে, সর্বযুগে অতুলনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় এই অতীব শুভ মুহূর্ত এক পরম লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সময়কালের প্রাকৃতিক সুষমা এতই রমণীয় যে ভক্ত যেন তার সুরভিত নির্যাস গণ্ডূষ ভ'রে পান ক'রে এক সুদুর্লভ স্বর্গীয় আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

সাধুগণের পরিত্রাণার্থে, পাপী দুষ্কৃতীদের বিনাশার্থে এবং এই ধরাধামে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে সর্ব ভক্ত হৃদয়ের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ মানব দেহ ধারণ ক'রে আসছেন এই ধরাধামে। হোক না সে কারাগার! থাকুক না উদ্ধত কংসের শানিত অসি নিষ্কোষিত! তিনি তো অক্ষত, অচ্যুত! কোন কারাগার তাঁকে বন্দী ক'রে রাখতে পারে না, কোন শৃঙ্খল তাঁকে বদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না, কোন অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করতে পারে না। তাই আজ দশদিক উৎফুল্ল, পরমানন্দে উদ্বেলিত। গ্রহনক্ষত্ররাজি প্রশান্ত, রোহিণী নক্ষত্র দীপ্যমান, নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের স্বর্গীয় আলোকের প্লাবন, ধরাধামে গ্রাম, নগর, গোবাট, খনি আদি আকরস্থানসমূহ মঙ্গলমণ্ডিত, নদীসমূহ পবিত্র নির্মল বারিরাশি পূর্ণ, হ্রদসমূহ প্রস্ফুটিত কমলদলে উচ্ছলিত, হরিৎবর্ণ বনরাজির নয়নমোহন পুষ্পস্তবকসমূহ বিহগকুল-কলতানে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, সুখস্পর্শ ও পুণ্যগন্ধবহ সুবাসিত শুচি বায়ু সঞ্চরণশীল, দ্বিজগণের প্রশান্ত হোমাগ্নি সম্যক প্রজ্বলিত। যেন ঠিক এই মুহূর্তে আকাশ-বাতাস-গ্রহরাজি-সমগ্র জীবকুল, সমগ্র চেতন-অচেতন তাঁর শুভাগমনের নিমিত্ত অধীর অপেক্ষারত। যেন সকলে মিলিত ঐকতানে উর্ধ্বমুখ-উর্ধ্ববাহু হয়ে হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিক পবিত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা উজাড় ক'রে তাঁকে আহ্বান ক'রে বলছে-হে প্রভু! হে

জগৎপালক! হে অক্ষত! হে অনন্ত! হে অচ্যুত! হে কেশব! হে মাধব! হে জনার্দন! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! তুমি এসো! তোমার ঐ দিব্যকান্তি নীলকলেবর, তোমার ঐ মনোহর পদ্মপলাশ নয়নযুগল, তোমার ঐ শ্রীমুখনিঃসৃত ভুবনমোহন হাসি দর্শনের জন্য আমাদের নয়ন তৃষিত, তোমার ঐ শ্রীচরণকমলের সুখস্পর্শ লাভের জন্য আমাদের হৃদয় তৃষ্ণাতুর, ব্যাকুল। আর তোমার ঐ বরাভয় শ্রবণের জন্য আমাদের কর্ণকুহর অধীর। তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসো!

সেইক্ষণে সাধু ও দেবগণের মন নিবিড় প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হল। স্বর্গে নিনাদিত হতে লাগল দুন্দুভি। গন্ধর্বগণ ও কিন্নরগণ তাঁর গুণগানে এবং সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁর স্তবস্তুতিতে নিরত হলেন এবং বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাগণের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য শুরু করলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে জনার্দন শ্রীহরির শুভ আবির্ভাবকালে হর্ষোৎফুল্ল মুনিগণ ও দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি শুরু করলেন। নভোমণ্ডলে ভাসমান জলধরগণ সাগরগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। আর ঠিক এই পুণ্যমুহূর্তে পূর্বগগনে যেমন পূর্ণ ইন্দু প্রকাশমান হয় তেমনই সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণু দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হতে চতুর্ভুজে শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রধারীরূপে আবির্ভূত হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্নের বর্ণনা শ্রীশুকের মুখে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—

"অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।।১।।
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোডুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা।।২।।
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকা বনরাজয়ঃ।।৩।।
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পূণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।।৪।।
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহ্ন্ম্।
জায়মানেহজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দভয়ো দিবি।।৫।।

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা।।৬।।
মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্।।
নিশীথে তম উদ্ভুতে জায়মানে জনার্দনে।।৭।।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।৮।।

এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের মধ্যে একটি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরাণে দেখি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কারণে বসুদেব যৎপরোনাস্তি ভীত, সন্ত্রস্ত। এই বুঝি কংস এসে পরে, এই বুঝি কংস জেনে যায় যাঁর হাতে তার বিনাশ তিনি প্রকট হয়েছেন, এই বুঝি সেই পাষণ্ড তাঁদের সর্বনাশ ক'রে বসে। সন্তানের জন্মে তাঁর যেন কোন আনন্দ নেই। শুধু ভয় আর শঙ্কা তাঁর অন্তরকে গ্রাস করেছে। কাজেই পুত্ররূপী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীহরিকে দেখেও প্রকারান্তরে তাঁকে বলেছেন যে তিনি না এলেই ভালো করতেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের বসুদেবের মানসিক অবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি সম্যক জানেন তাঁর পুত্র প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই তিনিই আপন মায়াশক্তির প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক এই বিশ্ব সৃষ্টি করেও তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়েও তিনি প্রবিষ্টের ন্যায়ই প্রতিভাত হন। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অবস্থিত হয়েও ইন্দ্রিয়াতীত, পরমতত্ত্ব, সকলের আত্মাস্বরূপ এবং নিজেই নিজের আশ্রয়। তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং বিকাররহিত। জগৎ রক্ষার প্রয়োজনেই তিনি তাঁর আলয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি রাজা নামধারী অসংখ্য অসুরপতিগণ পরিচালিত সৈন্যগণকে সংহার করবেন। সুতরাং এত বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও পুত্রের জন্ম হেতু তিনি সন্ত্রস্ত বা বিচলিত নন। বরং পরম নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়ে নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করলেন—

"বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্।।" ভা ১০।৩।১৩

তিনি সম্যক জানেন যিনি এই জগতের পালনহার, দুষ্টমতি কংসের

উচ্ছ্রিত তরবারি তাঁর কাছে অতিশয় তুচ্ছ। তাঁর কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা কংসের নেই। তাই এহেন পুত্রের জন্মে তিনি সাতিশয় আনন্দিত, উৎফুল্ল ও আবেগপূর্ণ। আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁর দেহ আপ্লুত হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের আনন্দে এতই উৎফুল্ল হলেন যে মনে মনে তিনি ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দশসহস্র গাভীদান ক'রে বসলেন।

বস্তুত এখানেই কৃষ্ণতত্ত্বের মূল সত্য নিহিত। পরমপুরুষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনও ভক্তের হৃদয়ের গভীরে নিবিড় ভাবে অবস্থান করেন, তখন সেই ভক্ত বীতরাগভয়ক্রোধ হয়ে যায়। জগতের কোনও ভয় তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে পারে না। প্রহ্লাদ চরিত্রের মধ্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করি। এক অটুট কৃষ্ণ-বিশ্বাস হেতু পিতা হিরণ্যকশিপুসৃষ্ট শত বিপদেও তিনি নির্ভয়, অটল, অবিচল।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে—বসুদেব শ্রীমদ্ভাগবতে কেন পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ সম্বরণ করতে বললেন এবং কেনই বা তাঁকে সঙ্গোপনে নন্দগৃহে গচ্ছিত রেখে এলেন?

এর কারণ হল প্রথমত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গোপনে নন্দগৃহে গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন ভগবানের আদেশে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের সাতষট্টিতম শ্লোকে উল্লেখ আছে তিনি "শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ"। অর্থাৎ ভগবানই বসুদেবকে আদেশ করেছিলেন দেবকীর গর্ভে জন্মের পর তাঁকে যশোদার কাছে রেখে তাঁর কন্যাকে দেবকীর কাছে আনয়ন করার জন্য। তাছাড়া বসুদেব ভালোই জানতেন যে কংস অতীব দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সে তাঁর সন্তানের ক্ষতি করতে না পারলেও এমন অসহনীয় অত্যাচার শুরু করবে যা চারিদিকে মহা পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে একদিকে যেমন তাঁর কাছে দৈবাদেশ অবশ্য পালনীয় অপরদিকে পরিবেশের শান্তি রক্ষায় সচেষ্ট হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সেই পরিস্থিতিতে বসুদেবের পক্ষে নবজাত শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে রেখে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

পঞ্চম তরঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত হল কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য, সার্বিকভাবে সমগ্র কৃষ্ণভক্ত সমাজের প্রাণের ধন এবং কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে শেষ কথা। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এ বিষয়ে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত মুখ্য স্থান অধিকার করে। তাই এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই এই আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিতভাবে আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে এ কথা অনস্বীকার্য। যাই হোক, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনার পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত জেনে নেওয়া যাক।

সর্বপ্রাচীন মন্ত্র হল প্রণব বা 'ওম্'। এই 'ওম্' মন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয় গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয় বেদ, বেদ থেকে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হতে জন্মলাভ করে শ্রীমদ্ভাগবত। সর্ব গ্রন্থের অধিপতি এই শ্রীগ্রন্থ রচনা করেন মহর্ষি পরাশরপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস। একটি দ্বীপের মধ্যে তাঁর জন্ম। তাই তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। তাঁর গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। তাই তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আবার ইনি বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করেন তাই তাঁর অপর নাম বেদব্যাস। তিনি রচনা করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত এবং সেই গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন তাঁর অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। আবার বেদ-উপনিষদের নির্যাস দিয়ে রচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ। জগজ্জীবের কল্যাণে এত গ্রন্থ রচনা করা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় যেন অতৃপ্ত। কি যেন এক অজানা অস্থিরতা তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করে—

বেদান্তবেদসুস্নাতে গীতায়া অপি কর্তরি।
পরিতাপবতি ব্যাসে মুহ্যত্যজ্ঞানসাগরে।।

(সনৎকুমারগণের উক্তি)

এক দুর্বোধ্য অস্থিরতায় তিনি ইতস্তত বিচরণ করতে থাকেন। এমনি

ভাবে একদা তিনি উপনীত হন সরস্বতীর তীরে এবং নিবিড় চিন্তামগ্ন চিত্তে উপবেশন করেন কোনও এক তরুমূলে। ভাবতে থাকেন তাঁর চিত্তে অতৃপ্তির কারণ এবং সমাধানের উপায় কী। সামনে বয়ে চলে স্বচ্ছসলিলা সরস্বতীনদী। তার তীরে হরিৎবর্ণ বৃক্ষশ্রেণী। তার শাখায় শাখায় পক্ষীকুলের মধুর কূজন। কিন্তু এসব কোনও কিছুই তাঁর চিত্তকে প্রশান্ত করতে পারেনা। কিসের যেন একটা অভাব তাঁর হৃদয়কে অপরিসীম দগ্ধ করে। অস্থিরচিত্তে তিনি ভাবতে থাকেন—

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ।।
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং প্রোবাচ ধর্মবিৎ।।
ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্।।
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ দর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত।।
তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যসত্তমঃ।।
কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ।
(ভা ১/৪/২৬-৩১)

—(সূত মুনি বলছেন) "হে শৌনকাদি মুনিবৃন্দ। ব্যাসদেব যদিও এইভাবে পূর্ণশক্তিতে সদাসর্বদা জীবের কল্যাণেই লিপ্ত ছিলেন, তবুও তাঁর মনে শান্তি ছিল না।।২৬।। তাঁর মন বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছিল। সরস্বতী নদীর তীরে নির্জনে বসে ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেব চিন্তা করতে করতে এই বক্ষ্যমান বাক্য বললেন।।২৭।। 'আমি নিষ্কপটভাবে ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত পালন ক'রে বেদ, গুরুজন ও অগ্নিকে পূজা করেছি এবং তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছি।।২৮।। মহাভারত প্রণয়ন ছলে বেদের অর্থ সরল ভাবে প্রকাশ করেছি—যাতে স্ত্রী, শূদ্রাদিগণও

আপন আপন ধর্ম ও কর্মের জ্ঞান লাভ করতে পারে।।২৯।। যদিও আমি ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও সমর্থ, তবুও আমার মন যেন অপূর্ণকাম ব'লে মনে হচ্ছে।।৩০।। আজ পর্যন্ত হয়তো আমি ঈশ্বর প্রাপ্তিযোগ্য ধর্মের নিরূপণ করিনি। এই ধর্ম পরমহংসদের প্রিয় এবং এই ধর্মই ভগবানেরও প্রিয় হোক না হোক আমার মানসিক অপূর্ণতার কারণই হয়ত এই"।।৩১।।

এই ভাবে তিনি যখন সরস্বতী নদীতীরে সেই নির্জন স্থানে কোন এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হয়ে নিবিড় বেদনার্ত হৃদয়ে ছটফট করছেন তখন সহসা সেখানে আবির্ভূত হন দেবর্ষি নারদ। নিবিড় আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি মহর্ষির চিত্তবিক্ষেপ উপলব্ধি করতে পারেন। ব্যাসদেব তাঁর কাছে স্বীয় হৃদয়ের নিদারুণ অশান্তির কারণ জানতে চাইলে তিনি তাঁকে বলেন—

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ।। (ভা ১।৫।৯)

অর্থাৎ তিনি মহাভারত রচনা, বেদের বিভাগ ইত্যাদি সুসম্পন্ন করলেও বাসুদেবের গৌরব গাথা বিবৃত করেন নি। মুহূর্তের মধ্যে মহর্ষির অন্তরে যেন খেলে যায় এক অনির্বচনীয় বিদ্যুৎ তরঙ্গ। মহর্ষি খুঁজে পান তাঁর অন্তরে হারিয়ে যাওয়া স্বর্গীয় সুখের উৎস। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যদ্যপি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিসৃত অমর বাণী বর্ণন করেছেন তথাপি জগজ্জীবের মহাকল্যাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণনা না করা পর্যন্ত তাঁর চিত্তের স্থিরতা ও প্রশান্তি অধরা থেকে যাবে। দেবর্ষি নারদ মহর্ষিকে দান করলেন শ্রীব্রহ্মার নিকট হতে লব্ধ বাসুদেব মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সারকথা চতুঃশ্লোকী যা ব্রহ্মা লাভ করেছিলেন নারায়ণের নিকট থেকে। চতুঃশ্লোকী হল সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সারকথা। জ্ঞানপিপাসু পাঠকগণের পিপাসা নিবারণার্থে চতুঃশ্লোকী ভাগবত এখানে উদ্ধৃত করা হল—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েৎ ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাঽভাসো যথা তমঃ।।
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাঽত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।
ভা ২।৯।৩২-৩৫

—সৃষ্টির পূর্বে যখন স্থূল, সূক্ষ্ম এবং উভয়ের কারণস্বরূপ অজ্ঞানতা—কোনকিছুই ছিল না তখন আমিই ছিলাম। সৃষ্টির পর এই যে মায়া জগত পরিদৃশ্যমান—তাও আমিই। এই সৃষ্টির প্রলয়ের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তাও আমিই।।৩২।।

সত্যরূপে পরিজ্ঞাত যাবতীয় অসত্য বস্তু এবং অসত্যরূপে পরিজ্ঞাত যাবতীয় সত্যবস্তু আমার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর সমুদায়ই আমার মায়াস্বরূপ মাত্র যার মরীচিকাসম রূপ অজ্ঞানদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হয়।।৩৩।।

যথা পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ঘটপটাদি ভৌতিক বস্তুসমূহ এবং মনুষ্যাদি জীবদেহে বিদ্যমান থাকে আবার ভৌতিকবস্তুসমূহ ছাড়াও পঞ্চমহাভূত অন্যত্রও বিদ্যমান। সুতরাং তারা ভৌতিক বস্তুসমূহে অবিদ্যমানও থাকে। অনুরূপভাবে জীবদেহের দিক থেকে বিচার করলে আমি তাদের অন্তরে চৈতন্যরূপে বিরাজমান, আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করলে যেহেতু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি ব্যতীত সমস্ত কিছুই অস্তিত্বহীন, সেই কারণে এ সবের মধ্যে আমি অবিদ্যমান।।৩৪।।

পরমাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু পরমেশ্বরকে অন্বয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ব্যতিরেক অর্থাৎ পরোক্ষ পদ্ধতি যেভাবেই সিদ্ধ করার প্রয়াস করুক না কেন, তার এই পর্যন্তই জেনে রাখা প্রয়োজন যে সর্বাতীত ও সর্বস্বরূপ ভগবান সদা-সর্বদা-সর্বত্র বিরাজমান।।৩৫।।

এই চারটি শ্লোক থেকে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক রচনা করেন। এই চতুঃশ্লোকী শ্রবণের ফলস্বরূপ ব্যাসদেবের অন্তর হতে সমস্ত ভার নেমে গেল—

তদা ত্বয়া পুরা প্রোক্তং চতুঃশ্লোকসমন্বিতম্।
তদীয়শ্রবণাৎ সদ্যো নির্বাধো বাদরায়ণঃ।।
সনৎকুমারগণের উক্তি, পদ্মপুরাণ

অতঃপর মহর্ষি নিমগ্ন হলেন গভীর ধ্যানে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অন্তরের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় সমগ্র লীলামাধুর্য। সমগ্র হৃদয়ের প্রেমমাধুরী উজাড় করে দিয়ে গ্রথিত করলেন শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি,

শব্দব্রহ্ম শ্রীমদ্ভাগবত যা স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে কলিগ্রস্থ ধরিত্রীর বক্ষে বহন করে আনবে আলোকবর্তিকা। এতদিনে প্রশান্ত হল মহর্ষির অশান্ত হৃদয়। কিন্তু তাও হল ক্ষণস্থায়ী। এবার ভাবনা হল কিভাবে শ্রীমদ্ভাগবতকে জগজ্জনের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায়। তাঁর কোন শিষ্য তো এ কাজের যোগ্য নয়! একমাত্র একজন আজন্ম উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী এই ভার বহন করার যোগ্য। তিনি সংকল্প করলেন তিনি একাজের উপযুক্ত এক পুত্রের জন্ম দেবেন। ফলতঃ জন্ম হল আজন্ম তপস্বী শ্রীশুকদেবের যিনি সুদীর্ঘদিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করার পর জন্মগ্রহণ ক'রে উপবীত ধারণের পূর্বেই তপস্যার নিমিত্ত বনগমন করেন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। একদা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন শ্রীশুকদেব অর্ধবাহ্যদশায় শ্রবণ করলেন শ্রীমদ্ভাগবতের এক অপূর্ব অর্থবহ শ্লোক—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।" ভা ৩।২।২৩

—যে দুষ্টা রাক্ষসী পূতনা স্বীয় স্তনে প্রাণঘাতী হলাহল লেপন ক'রে তাঁকে হত্যা করার দুরভিসন্ধি সহকারে তাঁর নিকট উপনীত হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এমনই করুণাময় যে তিনি তাঁরও স্তন্যপান ক'রে তাঁকে মাতৃত্বের মর্যাদা প্রদান ক'রে পরমগতি প্রদান ক'রেছিলেন যা একজন ধাত্রীরই প্রাপ্য। কৃষ্ণ ব্যতীত আর অধিকতর করুণাময় এমন কে আছেন যাঁর শরণ গ্রহণ ক'রতে পারি?'

শ্রীশুকদেবের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল। কে এই অপূর্ব শ্লোকের স্রষ্টা? এর উত্তর তিনি সত্বর খুঁজে পেলেন। উপস্থিত হলেন পিতার নিকট। অন্তরের আগ্রহ-মূল্যে পিতার নিকট থেকে লাভ করলেন শ্রীমদ্ভাগবত। এই মহাধন লাভ করে তিনি আর একস্থানে স্থির থাকতে পারলেন না। পরিভ্রমণরত শ্রীশুকদেব উপস্থিত হলেন হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে। সেই সময় ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহকাল প্রায়োপবেশনের নিমিত্ত গঙ্গাতটে অবস্থান করছিলেন। এই সময়কাল ব্যাপী তিনি অহর্নিশ হরিকথা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একথা জেনে শ্রীশুকদেব কৃপা ক'রে তাঁকে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করান। এই ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত ও বিকশিত হয়।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত সকল পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সূতমুনির ভাষায়—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।
ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ।।"

ভা ১২।১৩।১৬-১৭

—যেমন সমস্ত নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, সকল দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীশংকর সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনই সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! যেমন ক্ষেত্ররূপে কাশীধাম সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনই সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ।।১৭।।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের সঙ্গে সমতুল্য। "ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্"। ভা ১।৩।৪০

শ্রীমদ্ভাগবত এমনই এক গ্রন্থ যা কেবলমাত্র শ্রবণ করলেই অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। "শ্রবণমঙ্গলম্"। শ্রীমদ্ভাগবতের এমনই মাহাত্ম্য যে এখানে বর্ণিত বাসুদেবকথা তার প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করে—

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা।।"

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণতত্ত্বের শেষ কথা। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবত সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে এ সম্পর্কে অধিক জানার জন্য আর কোন গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন হয় না। কোন ব্যক্তি যদি অহরহ অমৃতপানের সুযোগ লাভ করতে পারে তাহলে যেমন তার আর অন্য কোন পানীয়ের প্রয়োজন থাকেনা, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতের ক্ষীরসমুদ্রে অবগাহন করতে পারলে পার্থিব সকল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভক্তিদেবী তাই বলেন—

ব্রমোহদ্য তে কিমধিকং মহিমানমেবং
ব্রহ্মাত্মকস্য ভুবি ভাগবতাভিধস্য।
যৎসংশ্রয়ান্নিগদিতে লভতে সুবক্তা
শ্রোতাপি কৃষ্ণসমতামলমন্যধর্মৈঃ।।

—"মর্ত্যধামে এই ভাগবত পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, এর মহিমা আমি কতটুকুই বা বর্ণনা করতে পারি। এই ভাগবতের আশ্রয় নিয়ে এই কথা পাঠ ক'রে শোনালে তো শ্রোতা এবং পাঠক বা কথক উভয়েরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব একে ছেড়ে অন্য ধর্মের আশ্রয়ের আর কি প্রয়োজন?"

কবি জয়দেব তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রশংসায় বলেছিলেন—

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা না ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীরং নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি।।২৮।।

—"শ্রীজয়দেবের এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য যতদিন বর্তমান থাকিবে—হে মধু, তোমার চিন্তা আর কেহ করিবে না। অতঃপর শর্করে, তুমি কর্করত্ব প্রাপ্ত হইলে। ক্ষীর, তোমার আস্বাদ নীরের মত হইয়া গেল। আম্র, তুমি ক্রন্দন কর। তুমি রসাতলে যাও।।"

আপাত দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ কাব্যগ্রন্থের এই সমাপ্তি শ্লোকটি গীতগোবিন্দের প্রশংসায় রচিত ব'লে প্রতীয়মান হলেও এর একটি গভীর তাৎপর্য আছে। আপাদমস্তক কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত আত্মলীন ভক্ত যখন আত্মানন্দী অবস্থায় বিরাজ করেন প্রেমানন্দনিকেতনে, তখন তার আর পার্থিব জগতের কোন বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। কৃষ্ণপ্রেমোদগত সহস্র নবনীত ধারা আকণ্ঠ পানে তার হৃদয়-মন-প্রাণ পূর্ণ-পরিতৃপ্ত। তাই পার্থিব জগতের সমস্ত উপভোগ্য বস্তুকে সে বিস্বাদ-জ্ঞানে নিতান্ত অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কৃষ্ণমধুর মিষ্টত্বের সমতুল্য আর কোন মিষ্টবস্তু আছে? দীর্ঘ বন্ধ্যা জীবনের অপবাদ ভোগের পর যখন কোন নারীর ক্রোড়ে পুত্র আসে,

তখন সেই শিশু-পুত্রের অধরের প্রতি অনিমিষ নয়নে চেয়ে থেকে সেই নারী যে অনাবিল আনন্দ লাভ করে, তার কাছে যেমন পৃথিবীর আর সমস্ত আনন্দ তুচ্ছ, সঙ্কীর্ণ কূপে আবদ্ধ রোহিত বর্ষার বাঁধভাঙ্গা প্রবল বন্যায় মহানন্দে ভেসে যেতে যেতে যেমন ভাবে—এর চাইতে অধিক আনন্দ আর কিই বা হতে পারে, পিঞ্জরাবদ্ধ উদাসী বনবিহঙ্গের পিঞ্জরের অর্গল সহসা উন্মুক্ত হলে অসীম-অনন্ত নীলাকাশের বক্ষে আনন্দবিহ্বল চিত্তে ভেসে যেতে যেতে যেমন সে ভাবে—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তো তার এই মুক্তি, তেমনই কৃষ্ণপ্রেম-সর্বস্ব ভক্তের কাছে পৃথিবীর আর কোন প্রলোভনের হাতছানি নিষ্ফল হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীশুকদেব বলেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণতিলকং যদ্বৈষ্ণবানাং ধনং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেবমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন প্রপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবদের পরম ধন। এখানে বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ জ্ঞান যা পরমহংসদের প্রাপ্য এবং প্রকাশিত হয়েছে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সহযোগে নিবৃত্তিমার্গ। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন, শ্রবণ, মননে ব্যাপৃত থাকেন তিনি মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সত্যই এক অপূর্ব গ্রন্থ। আরও অন্যান্য বহু গ্রন্থে ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তারা যেন উজ্জ্বল বিজলীর চমক। তাতে আলো আছে ঠিকই, কিন্তু সে আলোর তেজ যেন বড়ো বেশী প্রখর, চোখ ঝলসানো। বেশীক্ষণ তাকিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত যেন তুলসীতলার গব্যঘৃতের সন্ধ্যাপ্রদীপ। তার আলো বড়ই স্নিগ্ধ, নয়নসুখকর, মসৃণ, মোলায়েম, এক অতীব স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবৎ প্রেমরসের অতুলনীয় সুস্বাদু পরমান্ন আকণ্ঠ ভোজন ক'রে ভক্তের জন্ম-জন্মান্তরের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হয়। কিন্তু এ পরমান্ন কোন রাজসিক পরমান্ন নয়, এতে

কোন অহংকার নেই, ঔদ্ধত্য নেই, অসূয়া নেই, নেই কোন আত্মম্ভরিতা। ইনি যেন মাধুকরীলব্ধ বিদুরের খুদ। এতে আছে শুধু বাৎসল্য-দাস্য-মাধুর্য রসে জারিত স্বর্গীয় প্রেম আর ভালবাসা। এই গ্রন্থরাজ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল। এতে খোসা নেই, বীচি নেই; শুকদেবরূপী শুক-মুখের সংযোগ হেতু কেবল পরিপূর্ণ অমৃতমধুরসে—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুক্তম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।

এ রস অন্যত্র লভ্য নয়। এ রস এমনই এক দুর্লভ রস যে স্বর্গলোক, সত্যলোক, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠেও নেই। এ শুধু বিদ্যমান 'পুরাণতিলক' শ্রীমদ্ভাগবতের পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে, অক্ষরে-অক্ষরে—

"স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্ত্যয়ং রসঃ।"
(পদ্মপুরান, উত্তরখণ্ড)

শ্রীমদ্ভাগবত এমনই গ্রন্থ যা সর্ব জগজ্জীবের কল্যাণার্থে নিয়োজিত। তাঁর কাছে কোন ধর্ম, কোন সম্প্রদায়, কোন জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর ভেদাভেদ নেই। তিনি সকলের তরে, সকলের জন্য। তাই মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণে বলেছেন, 'সত্যং পরং ধীমহি' অর্থাৎ সেই পরম সত্যের ধ্যান করি। তিনি বলেন নি 'কৃষ্ণং পরং ধীমহি' বা 'নারায়ণং ধীমহি' বা 'মহেশ্বরং ধীমহি'। কারণ তিনি জানেন পরম সত্যই হল মানবের একমাত্র ধ্যাতব্য। কোন লৌকিক ধর্ম ভাগবতের বা পরমপুরুষ শ্রীভগবানের লক্ষ্য নয়। সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায় তাঁর কাছে সমান আদৃত। শ্রীকৃষ্ণের এ ধরণের মনোভাব আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত বহন করে।

মহামতি শ্রীসূতগোস্বামী সেই সুদূর আদিকালে ব'সে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের মনোবৃত্তির দুর্জ্ঞেয় গতিপ্রকৃতি। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র প্রাণসত্ত্বার একমাত্র লক্ষ্য হল আনন্দপ্রাপ্তি। এই

আনন্দপ্রাপ্তিই হল সকল জীবের সকল কাজের মূল প্রেরণা। কিন্তু সেই আনন্দের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে মানুষ যদি ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয় তাহলে সে নিদারুণ দুঃখকে আহ্বান ক'রে আনে। পৃথিবীতে কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষ নিরন্তর বিপুল পার্থিব ধনরাশি আহরণের চেষ্টায় সারাজীবন ব্যয় ক'রে ফেলে। একবার নিশ্চিন্তে ব'সে সেই অর্জিত সম্পদের সুখ ভোগের অবসর তার হয় না। কিন্তু একদিন সবার অলক্ষ্যে সহসা মৃত্যু এসে তার সকল কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে পার্থিব বস্তু আহরণের শেষ কোথায় খুঁজে পায় না; আবার অর্জিত সম্পদের সুখভোগও অধরা থেকে যায়। মানুষের তো এর থেকে উত্তরণ চাই! কিন্তু কিভাবে হবে সেই উত্তরণ? অগ্নির দ্বারা তো অগ্নি নির্বাপণ করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন শীতল বারি। কিন্তু কোথায় আছে সেই শীতল বারি যা দিয়ে অত্যুগ্র কামনা-বাসনাদগ্ধ জীবকুল নির্বাপিত করতে পারবে তার অসহ্য হৃদয়ানলের সুতীব্র দহন? মহামতি শ্রীসূতগোস্বামী সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশ্যে বলেছেন—আছে! ঐ দেখ শ্রীমদ্ভাগবতরূপী অন্তহীন শীতল বারিধি। ঐ শীতল বারিধি-সলিলে অবগাহন করো। তোমার অন্তরের সুতীব্র দহন জ্বালা চিরতরে নির্বাপিত হবে। এই অসার সংসারের বিষয়-গরলের আসক্তিতে তোমরা সব ব্যাকুলবুদ্ধি হয়ে আছো। ক্ষণেকের জন্য হলেও শুককথারূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুপম সুধারস পান করো। কেন কুৎসিত কথায় পূর্ণ কুপথে ঘুরে জীবন ব্যর্থ করছো? এই অমৃতকথা কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র মুক্তি ঘটে যার প্রমাণ রাজা পরীক্ষিৎ। শ্রীসূতগোস্বামীর ভাষায়—

অসারে সংসারে বিষয়বিষসঙ্গাকুলধিয়ঃ
ক্ষণার্থং ক্ষেমার্থং পিবত শুকগাথাতুলসুধাম্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিতকথে
পরীক্ষিৎসাক্ষী যচ্ছ্রবণগতমুক্ত্যুক্তিকথনে।।

সপ্তম তরঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণরসের গঙ্গোত্রী। এখান থেকে উৎসারিত অনন্ত কৃষ্ণরসের স্বচ্ছসলিলা প্রস্রবিণী দুকূল প্লাবিত ক'রে সতত প্রবাহিত দিক হতে দিগন্তরে। তার পবিত্র সলিলে অবগাহন ক'রে ভক্তহৃদয় লাভ করে স্বর্গীয় পরমানন্দ আর ফলতঃ ভেসে যায় এক অনির্বচনীয় আনন্দ-জোয়ারে। সেই পরমানন্দের অনুভূতি প্রকাশ লাভ করে কতশত বিচিত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমে। কৃষ্ণপ্রেমরসের মহাসমুদ্র শ্রীমদ্ভাগবত হতে শত ধারায় উৎকলিত-প্রেমবারি সিক্ত বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের এরকম কত অনুভূতির প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁদের পদাবলির মধ্যে।

কবি গুণরাজ খানের অনুভবে কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুরের এমনই জাদু যে সেই বাঁশীর সুর শুনলে বৃক্ষ অকালেই প্রস্ফুটিত হয়—

বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে।।

একবার প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ এমনই যে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। পরিচয় ব্যতিরেকেই কেবল একবার তাঁর চকিত-দর্শনেই ভক্তহৃদয়ের সমস্ত কিছু নিঃশেষে উজাড় হয়ে অর্পিত হয়ে যায় তাঁর চরণকমলে। সুধাময় তনুখানি তাঁর। পৃথিবীতে এমন কোনও প্রাণী নেই যে তাঁর অপরূপ রূপ দর্শন করলে মোহিত না হয়।

পদকার অনন্তদাস তাই বলেন—

কি হেরিলুঁ কদম্বতলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে।
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে।

....

যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর
শুধুই সুধার তনুখানি।

দাস অনন্ত বলে রূপ হেরি কে না ভুলে
জগতে নাহিক হেন প্রাণী।

কবি গোবিন্দ আচার্য্যের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসের আধার। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবনে তিনি অতুলনীয়—

কি রূপ দেখিলুঁ মধুর মুরতি
পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার।।

এখানে স্মর্তব্য যে ভাগবত-কথিত কৃষ্ণপ্রেম কোন মানবীয় প্রেম নয়। এ প্রেম স্বর্গীয়। এ প্রেম 'অহৈতুকী'—নিষ্কাম। ইংরেজি সাহিত্যে যাকে Platonic Love নামে অভিহিত করা হয়। ইংরাজ কবি পি. বি. শেলী এই প্রেমের যে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি সম্যক বোধগম্য হবে—

The desire of the moth for the star
of the night for the morrow
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

নারদ ভক্তিসূত্রের ৫৪ সূত্রে নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের যে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন তারই প্রতিধ্বনি হল কবি শেলীর এই Platonic Love-এর ধারণা—

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানম্
অবিচ্ছিন্নং সুক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।

—এই প্রেম নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণবর্জিত, কামনারহিত, স্বতঃবর্ধনশীল, নিরবচ্ছিন্ন এবং এক অতীব সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়, কোন ভোগের বিষয় নয়।

এই প্রেমে নেই কোন গ্লানি, নেই কোন কালিমা। এ প্রেম বড় পবিত্র। আকাশের মত নির্মল, গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, অমলিন, অমৃতভাণ্ড। সেই পরম পবিত্র প্রেমে অণুমাত্র কলুষতার স্পর্শ শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দুসম প্রকটরূপে দৃশ্যমান

হয়, ছলনার দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখা যায় না। তাহ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মনের পুলকে গেয়ে ওঠেন—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।।

তাঁর রূপ অতীব নয়নমোহন। সে রূপ একবার প্রত্যক্ষ করলে ভক্তহৃদয়ের সমস্ত মান-অভিমান-দম্ভ-অহমিকা-সুখদুঃখের বোধ সব দূরীভূত হয়ে যায়। তাই পদকর্তা বসন্ত রায় বলেন—

সইলো কি মোহন রূপ সুঠান।
হেরইতে মানিনি তেজই মান।।

তাঁর রূপ তো শুধু কোন রক্ত-মাংসের অবয়ব নয়; তা যেন নয়ন-লোভন তরল নবনীতের প্রস্রবণ। সদা প্রবহমান সেই নবনীতধারা নিষ্পলক নয়নযুগল দ্বারা অনিমিখে সমস্ত হৃদয় পূর্ণ ক'রে পান ক'রে নশ্বর এই দেহ, অন্তর এবং সমগ্র জীবন যেন ধন্য হয়ে ওঠে—

কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন।।[২]

এই Platonic Love-এর তত্ত্বের উপস্থিতি আমরা চণ্ডীদাসের কাব্যেও লক্ষ্য করি। এখানে দেখি চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে রামীর প্রতি বলছেন—

তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।
তুমি বাগ্বাদিনী হরের ঘরণী,
তুমি গো গলার হারা

২। চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্বত
তুমি গো নয়নের তারা।

সুতরাং নিঃসন্দেহে দাবী করা যায় যে কবি শেলী এই Platonic Love-এর তত্ত্বের স্রষ্টা নন, তাঁর বহু পূর্বের কৃষ্ণতত্ত্ব তথা বৈষ্ণব সাহিত্য এই তত্ত্বের জনক।

কৃষ্ণরসে ডুবুডুবু বাহ্যজ্ঞানহী প্রেমোন্মাদ ভক্ত তার পরাণ-বঁধুয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ ক'রে বেড়ায় সর্বত্র—জলে-স্থলে-অরণ্যে-লতায়-পাতায়-প্রান্তরে দেবালয়ে। কিন্তু কৈ, তাঁর দেখা তো মেলে না—কিন্তু অন্তরের নিভৃতে অনুভূত হয় তিনি আছেন এখানেই কোথাও। সহসা সমস্ত অন্তর আনন্দের অনুভূতিতে, পুলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—ওই তো তিনি! আমার সমস্ত হৃদিমন্দির আলো করে বঙ্কিম-ঠামে হাতে মোহন-বেণু ধারণ করে বিরাজ করছেন আমার হৃদবিহারী! আমার চর্ম-চক্ষু নাই বা পেল তাঁকে দেখতে! আমার হৃদয়-পদ্ম তো তাঁর পদ-রজে স্নান করে চিরধন্য হয়েছে! এ এক বিচিত্র অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে লালন ফকিরের অন্তরের একটি এমনই দুর্লভ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটি অমর গানের মধ্য দিয়ে—

এক দিনও না দেখিলাম তারে,
আমার মনের মাঝে আরশি-নগর,
তাতে এক পড়শি বসত করে।

প্রেমিক ভক্ত চায় তার প্রভুকে সদা-সর্বদা, সারা জীবন আপনার সান্নিধ্যে স্বীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে। তার একান্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রভু যেন মুহূর্তের জন্যও তাকে ছেড়ে না যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ভক্ত-প্রাণের এই আকুতির প্রকাশ ঘটেছে—

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু।।
যে প্রেমরতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে।।
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়হ কখন মোরে।।

বিদ্যাপতির পদাবলীতেও ভক্তমনের এই একান্ত আকুতি সুললিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী-তিল এদেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু না ছোড়বি মোয়।[৩]

কৃষ্ণপ্রেমে জর্জর আকুলিত ভক্তহৃদয় একবার তাঁর দর্শন তরে বড়ই ব্যাকুল। একবার যদি তাই তাঁর দর্শন পায় মনের একান্ত বাসনা তার আপনার বক্ষমাঝে জড়িয়ে ধরে প্রভুর রাঙা চরণকমলদ্বয়। তাঁর অদর্শনে ভক্তের হৃদয় বেদনায় দগ্ধ হয়। সে বুঝে উঠতে পারে না তার এই অসহনীয় দহন-জ্বালা কি প্রকারে প্রশমিত হবে। কবি নরোত্তম দাসের পদাবলীতে ভক্তহৃদয়ের এই অকৃত্রিম আকুতি পরম ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে—

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি।।
তোমা না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ।।

মানুষের অন্তরে বাসা বেঁধে আছে কত আনন্দ-দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশা-হতাশা, মান-অভিমান, ব্যর্থতা-গ্লানি, কামনা-বাসনা-প্রার্থনা। কিন্তু সে কার কাছে সেসব প্রকাশ করবে। সকলের কাছে অকপটে যে সবকিছু বলা যায় না। বলা যায় একমাত্র তার পরাণের বান্ধবের কাছে। আর কৃষ্ণভক্তের কাছে পরাণ বঁধুয়া তো নন্দনন্দন রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ! তাঁর কাছে লজ্জা কি! সংকোচ কি! নিভৃত মনের গোপন কথা তো একমাত্রই তাঁকে বলা যায়! ভক্তমনের এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীরাধিকার বিলাপের মাধ্যমে—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।

৩। সুদীর্ঘদিন ধরে একটা ফুল পাঠ চলে আসছে—'দয়া জনু ছোড়বি মোয়।'

তোমার চরণে	আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।	
সব সমর্পিয়া	একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।।	
ভাবিয়াছিলাম	এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।	
রাধাবলি কেহ	শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।।	
একূলে ওকূলে	গোকুলে দুকূলে
আপন বলিব কায়।	
শীতল বলিয়া	শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।।	
না ঠেলহ ছলে	অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।	
ভাবিয়া দেখিনু	প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর।।	
আঁখির নিমেষে	যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।	
চণ্ডীদাস কহে	পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি।।	

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রাণের বান্ধব। তাঁর অধরের হাসি বড়ই মধুর। কৃষ্ণপ্রেমে ভক্ত-হৃদয় এতই বিভোর যে ক্ষণেকের অদর্শন তার কাছে অসহনীয়। কবি নরোত্তম দাস ভক্ত মনের এই অবস্থাটি সুন্দরভাবে তাঁর পদাবলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন—

নবঘনশ্যাম ওহে পরাণ বন্ধুয়া তুমি
আমি তোমা পাসরিতে নারি।

তোমার বদনশশী অমিয়ামধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি।

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তের দু'নয়ন তার প্রাণসখার দর্শন অভিলাষে কেঁদে কেঁদে ফেরে। শ্রীকৃষ্ণকে একবার স্পর্শের জন্য সে ব্যাকুলিত। তাঁর অধরসুধা পান করার প্রবল বাসনা তার অন্তরে। কিন্তু হায়! তার অন্তরের এই প্রগাঢ় বাসনা কিভাবে পূরণ হবে? তার 'পরাণ বন্ধুয়া' যে তার কাছে নেই। ভক্তের অন্তরের এই আক্ষেপ বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ তাঁর পদাবলীতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

দরশন লাগি নয়ন ঘন কান্দই
পরশন লাগি তনু ঝুর।
রসনা পিবইতে চাহে অধররস
কি করবো সো অতি দূর।।

নারদ ভক্তিসূত্রের ৬৮ সূত্রে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ভক্ত যখন পরস্পরের সঙ্গে আলাপনে রত হয় তখন কৃষ্ণের প্রতি গদগদ ভক্তিতে তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, নয়নদ্বয় হতে দরদর ধারায় প্রবাহিত হয় উষ্ণ প্রেমাশ্রুধারা এবং এই ভক্তগণই তাঁদের অনুরাগীসহ সমগ্র বিশ্বচরাচরকে পবিত্র করে তোলেন—

কণ্ঠাবরোধরোমাশ্রুভিঃ পরস্পরং
লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ।

এক এক সময় এমন হয় যে কৃষ্ণপ্রেমে ডুবুডুবু ভক্ত বাহ্যত উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়। তখন তার কাছে আর দিন-রাত্রির ভেদ থাকে না। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সে শুধু কৃষ্ণমুরতি দর্শন করে, নিজের নাম-ধাম সব বিস্মৃত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে এই বাহ্যোন্মাদ দশা পরিলক্ষিত হয়েছিল। কবি বলরাম দাশ তাই বলেছেন—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালা রূপখানি।।
আপনার নাম মোর নাহি পরে মনে।
পরাণ হরিলে রাঙ্গা নয়ননাচনে।।

কৃষ্ণ অনুরাগে মাতোয়ারা প্রেমিক ভক্ত জাগতিক কাজকর্ম বিস্মৃত হয়ে এক গভীর আবেশের মধ্য দিয়ে চলে। কখনো সে ক্রন্দন করে, কখনও সে উচ্চরবে হাস্য করে, কখনও বা বালকের ন্যায় করতালি দিয়ে নৃত্যরত হয়। কখনও বা সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেন—

হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িঞা মূৰ্চ্ছিত।।

ভক্তহৃদয়ের এই অদ্ভুত বিচলিত মানসিক অবস্থাকে কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীরাধিকার মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন—

সা রোমাঞ্চতি শ্রীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্-ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্-যাতি মূৰ্চ্ছত্যাপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রস্যাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ।।

—“তোমার বিরহ জ্বরে তাঁহার রোমাঞ্চ, শ্রীৎকার, বিলাপ, কম্প, স্পন্দনহীনতা, বিহ্বলতা, অক্ষি-সঙ্কোচ, ভূমিতে পতন এবং কখনো কখনো মূর্চ্ছা পর্যন্ত হইতেছে। হে স্বর্গবৈদ্য-প্রতিম কৃষ্ণ, এখন তুমি যদি রসদানে (এক পক্ষে প্রেম, অন্য পক্ষে পারদ) কৃপা বিতরণ কর, তবেই তাঁহাকে রক্ষা করা যায়। মুষ্টিযোগে (টোটকা ঔষধ, অর্থাৎ নলীনিদলাদি আচ্ছাদনে) কোনও ফল হইতেছে না।।”

গদগদ কৃষ্ণভক্তিতে ভক্ত এমন বাহ্যোন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয় যে তার আর বাস্তব বোধ থাকে না। সর্বত্র সে কৃষ্ণের স্পর্শ অনুভব করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর এই অবস্থাটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গ্রন্থে—

বনে দেখি ভ্রম এই হয় বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবর্দ্ধন।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দি।
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পরে কান্দি।।

আবার কখনও কখনও কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের অন্তরে এক বিরাট ভাবান্তর উপস্থিত হয়, এক নিবিড় চিত্তবৈকল্য তার সমগ্র অন্তরকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ ব্যতিরেকে পৃথিবীর আর কোন বস্তু বা বিষয় তার ভালো লাগে না। অমৃতের স্বাদও যেন তার কাছে মনে হয় গরলসদৃশ, চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণেও যেন গাত্রজ্বালা অনুভব হয়, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকর্ষণহীন মনে হয়। কারণ কৃষ্ণের বিরহ তার অন্তর থেকে নিঃশেষ করে নিয়ে গিয়েছে তার অন্তরের অমূল্য সম্পদ—আনন্দ এবং আনন্দ ব্যতিরেকে সমস্ত পৃথিবীটাই হয়ে ওঠে বিষাদময়, কুরূপা।

কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে কান্ত-কোমল পদে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে মনোরম ভাষা ও ভাবের মাধ্যমে শ্রীরাথিকার মনোবেদনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভক্তমনের এই বিশেষ ও অনুভূতির অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়েছেন—

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্।।

—“তোমার বিরহে শ্রীরাধা আবাসকে অরণ্যসমান, প্রিয়সখীযুথকে জাল স্বরূপ, নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানলতুল্য, এবং কন্দর্পকে বধোদ্যত ক্রীড়াশীল ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করিতেছেন। হায়! তাঁহার দশা এখন বনস্থিতা ব্যাধজালবেষ্টিতা দাবানলমধ্যবৰ্ত্তিনী ব্যাঘ্র-তাড়িতা হরিণীর ন্যায় হইয়াছে।”

কৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ ভক্তের অন্তরের একটাই অভিলাষ। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সে যেন তার পরমারাধ্য দেবতার আরাধনায় ব্রতী থাকতে পারে। আর কিছু সে কামনা করে না। ভক্ত বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস ভক্তমনের এই গোপন কথাটিই ব্যক্ত করেছেন পেলব ভাষায়—

জনমে জনমে হাম তুয়া আরাধন বিনু
আর নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ হাম তুয়া কিঙ্কর
তবহুঁ না মুঞ্চহে রোষে।।

জ্ঞানদাসের পদাবলীতে কৃষ্ণভক্তের অন্তরের এক অপূর্ব বাসনার পরিচয় পাই যা আমাদের সকলের অন্তর প্রগাঢ় ভাবে স্পর্শ করে। ভক্তের বাসনা সে যেন তার সমগ্র সত্ত্বাসহ শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ সত্ত্বার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এ মিশে যাওয়া সাধারণ মিশে যাওয়া নয়। এ যেন দুধে-জলে মিশে যাওয়া। একের প্রতিটি অণুতে অপরের প্রতিটি অণু লীন হয়ে যাওয়া। কৃষ্ণ ভক্তের তার আরাধ্যের সঙ্গে এভাবে সমসত্ত্ব মিলনের মধ্যেই তার জীবনের পরম আকাঙিক্ষত পরমানন্দ প্রাপ্তি। কবি জ্ঞানদাসের কথায়—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য অনন্ত। তার সীমা নেই, শেষ নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই। এক অসীম অফুরান মাধুর্য ভাণ্ডার নিয়ে তিনি বিরাজ করছেন এই বিশ্ব চরাচরে, নন্দালয়ে, বৃন্দাবনের গোঠে, যমুনাপুলিনে, কদম্ববৃক্ষে, মথুরায়, দ্বারকায়। এখানে ঈশোপনিষদের একটি মন্ত্র মনে পড়ে—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণ পূর্ণই থেকে যায়। তার পরিমাণ বিন্দুমাত্র কমে না। তিনি যে পূর্ণ পুরুষোত্তম। তিনি যে তাঁর মাধুর্যের পূর্ণপাত্র নিয়ে ব'সে আছেন। কত নেবে নিয়ে যাও হাঁড়ি হাঁড়ি মধু। ফুরাবে না, কমবে না। আর এ মধু যতই পান কর না কেন তিয়াসা মিটবে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যতই পান কর, অন্তর থেকে যাবে অতৃপ্ত। মনে হবে আরও, আরও, আরও পান করি। কৃষ্ণমধু যতই পান করবে ততই আরও বেশী পান করার জন্য প্রাণ রবে সততই উন্মুখ। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন—

পাঁচে মিলে লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পীয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অণুক্ষণ।।
লুটিয়ে খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডারে প্রেম শতগুণ বাড়ে।।

কবি জগমোহন দাস ভক্তহৃদয়ের এই উপলব্ধিটি তাঁর পদাবলীতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়ে জুড়ন না গেল।।

কৃষ্ণলীলা যেন অমৃত সমান। দশদিক হতে সেই অমৃতধারা নিরন্তর অঝোরে বর্ষিত হয়। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও যেন কৃষ্ণলীলা মাধুর্যের এই দিকটিই ফুটে উঠেছে—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোক
তোমার অমল অমৃত পরিছে ঝরিয়া।।

বৈষ্ণব কবি সদানন্দের লেখনীতে কৃষ্ণতত্ত্বের এই দিকটির অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে—

অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখরে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত পিও পিও অবিরত
অনুক্ষণ প্রেম ধন মাগে।।

আহা কি অপূর্ব! শুনে প্রাণ গেল জুড়িয়ে গেল। ভক্তের চৈতন্যের আকাশে কৃষ্ণরসের ঘন মেঘ উঠেছে। আর সেখান থেকে অবিরল ঝ'ড়ে পরছে অফুরান প্রেমবারিধারা। আর ভক্তগণ তৃষিত চাতকের ন্যায় সেই প্রেমবারিধারা আকণ্ঠ পান ক'রে জন্মজন্মান্তরের ঈপ্সিত বাসনা পূরণ করছে।

অষ্টম তরঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে দশটি বিভাগের বর্ণনা করা হয়েছে—'ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্'।[৪] সেই দশটি বিভাগ হল—

'অত্র সর্গো, বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।

মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।।[৫]

অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, মন্বন্তর, ঊতি, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ হতে উৎপন্ন পঞ্চভূত যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; পঞ্চতন্মাত্র যথা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ; পঞ্চেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এবং মন প্রভৃতি মৌলিক সৃষ্টি সমূহকে বলা হয় 'সর্গ'। 'সর্গ' শব্দের অর্থ 'সৃষ্টি'। ভগবান বিষ্ণু যাঁকে বিরাট পুরুষ বলা হয় তিনি প্রথমে এই 'সর্গ' এবং তৎসহ তাঁর অধীনস্থ স্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা কর্তৃক এই প্রপঞ্চময় সৃষ্টিকে বলা হয় 'বিসর্গ'। দুষ্টের দমন ও সতত বৃদ্ধিশীল এই সৃষ্টিকে এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখার নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণুর যে শ্রেষ্ঠত্ব তাকে বলা হয় 'স্থান', স্বীয় সুরক্ষিত সৃষ্টির মধ্যে অবস্থানরত তাঁর প্রিয় ভক্তদের প্রতি তাঁর যে কৃপা বর্ষিত হয় তাকে বলা হয় 'পোষণ', জীবনকে সঠিক পথে প্রবাহিত করানোর জন্য মনুগণ যে সমস্ত বিধিসমূহ প্রণয়ন করেন তাদেরকে 'মন্বন্তর' বলা হয়; কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নিমিত্ত জীবের যে বাসনা তাকে বলা হয় 'ঊতি'। শ্রীহরির অবতার-চরিত্র ও তাঁর অনুগত ভক্তগণের বিবিধ আখ্যান সমন্বিত গাথা সমূহকে বলা হয় 'ঈশকথা'। 'নিরোধ' শব্দের অর্থ 'লয়' বা 'বিনাশ'। প্রলয়কালে সর্বসংহারেচ্ছায় পরমেশ্বরের যোগনিদ্রায় অবস্থান কালে জীবের উপাধি সহ তাঁর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হওয়াকে বলা হয় 'নিরোধ'। এই প্রপঞ্চময় জাগতিক যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুর প্রতি

৪। ভা ২/৯/৪৩

৫। ভা ২/১০/১

অজ্ঞানতা-প্রসূত ভ্রান্তকর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরের সদনে চিরাশ্রয় লাভ করার নাম 'মুক্তি'। এই বিশ্ব চরাচরের উৎপত্তি ও লয় যে তত্ত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই পরমব্রহ্মকে 'আশ্রয়' বলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে 'আশ্রয় তত্ত্ব' বিষয়টিকে সম্যক অনুধাবন করতে হ'লে 'আধ্যাত্মিক' 'আধিদৈবিক' ও 'আধিভৌতিক' এই তিনটি বিষয়ের অর্থ জানা প্রয়োজন। এই বিশ্ব চরাচরের সমগ্র জীবকুল চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। এই ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে জীব বিশ্ব চরাচরের সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে। এই ইন্দ্রিয় সম্পন্ন জীবকুলকে বলা হয় 'আধ্যাত্মিক'। কিন্তু ইন্দিত্রয়সমূহের কার্যকারিতা স্বাধীন নয়। তাকে অপর এক শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। যেমন চক্ষু থাকলেও আলো না থাকলে জগৎ দৃশ্যমান হবে না। ফলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্যদেবের উপর নির্ভরশীল। সূর্যদেব চক্ষুর দর্শন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণকারী এই সমস্ত দেবতাগণকে বলা হয় আধিদৈবিক। আর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে বলা হয় 'আধিভৌতিক'। বস্তুত এই তিন প্রকার সত্ত্বার মধ্যে কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; প্রত্যেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একের অনুপস্থিতি ঘটলে অপর দুইয়ের উপলব্ধি ঘটে না। কিন্তু যিনি এই তিনকেই পরিপূর্ণরূপে জানেন তিনিই পরমাত্মা; সকল আশ্রয়ের 'আশ্রয়' তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই পরমাত্মা; সকল জীবের পরমাশ্রয়।

নবম তরঙ্গ

এক্ষণে আমরা পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতলব্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক তত্ত্ব ও স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, হরিবংশ আদি বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে কোথাও আংশিক, কোথাও বা পরিপূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে কৃষ্ণবৃত্তান্ত বিষয়ক সমুদায় গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্ত সর্বোৎকৃষ্ট, হৃদয়গ্রাহী, সর্বজনগনমন অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত তো আর পাঁচটা গ্রন্থের ন্যায় নিছক কোন গ্রন্থ নয়। ইনিই তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের তো বহু রূপ। কখনও তিনি নটখট নন্দলালা, কখনও বা সর্বাঙ্গে গোময়-ভস্মাচ্ছাদিত বংশীধারী ব্রজ-রাখাল, কখনও বা যমুনাপুলিনে গোপনারীগণের সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে কেলিরত প্রেমিক কানু, কখনও তিনি শ্রীক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে দৃপ্ত অর্জুনসারথী। সেই তিনিই আখরের রূপ ধারণ ক'রে সামগ্রিক ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত রূপ পরিগ্রহ করেছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ শব্দদুটি সমার্থক। শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামীর অভিমতের মধ্যে আমরা এই মতের সমর্থন পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত হল "শ্রীকৃষ্ণঃ পরিবর্তিতঃ"। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত রূপে শব্দব্রহ্ম রূপ পরিগ্রহ করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে আমরা রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা অর্থাৎ সূতগোস্বামীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ সম্পর্কে শুনি, "ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্"।. অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণের অপর রূপ। শব্দের অপর নাম ব্রহ্ম। তাই বলা যায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শব্দব্রহ্মরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রূপ পরিগ্রহ ক'রে এই বিশ্ব চরাচরে বিরাজ করছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থে 'ব্রহ্মসম্মিতম্' পদের অর্থ করেছেন—'litereay incarnation of God'। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের আখরাবতার। বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মের স্বরূপ

দুইটি—পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম—"দ্বে ব্রহ্ম ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ তৎ।" শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, ভাগবত শব্দব্রহ্ম—শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি একথা শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য-কথনে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেছেন—

যত্র যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ।।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ।
যজ্ঞাঃ সপ্তপুরী নিত্যং পুণ্যাঃ সর্বে শিলোচ্চয়াঃ।।
শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশোধর্মজয়ার্থিনা।
পাপক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং ধর্মবুদ্ধিনা।।
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যমায়ুরারোগ্যপুষ্টিদম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্ বাপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।

—কলিযুগে পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত যেখানে যেখানে উপস্থিত থাকবে সেখানে সেখানে আমি দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে সর্বদা উপস্থিত থাকি। আর সেখানে গঙ্গাদি নদী, ব্রহ্মপুত্রাদি নদ এবং মানসাদি সরোবররূপ মহান তীর্থসমূহ অবস্থান করে। অতএব হে লোকেশ! যশ, ধর্ম, বিজয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি এবং পাপক্ষয়ের নিমিত্ত ধার্মিক ব্যক্তিগণের আমার ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করা উচিৎ। এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ আয়ু, আরোগ্য ও পুষ্টিপ্রদানকারী; এই শাস্ত্র পঠন অথবা শ্রবণ করলে সর্বপ্রকার পাপমুক্তি ঘটে।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত সনাতনের নিকট ভাগবতের অমূল্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা ক'রে যা বলছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তা আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে পাই—

প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ।।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়।।

শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের

দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোকে রাজা পরিক্ষিৎ বলেছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি।।৪
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেন স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।।৫
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত সর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা।।৬

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি নিয়মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়কে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে হৃদয়ে গ্রহণ করেন তাঁদের হৃদয়ে অচিরে ভগবান শ্রীহরি প্রকাশমান হন। শ্রীমদ্ভাগবতের পূতমন্ত্র পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দাবতাররূপে ক্রমাগত কর্ণকুহরের মধ্যদিয়ে আত্মজ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে শ্রীভগবানের সঙ্গে তার হৃদয়ের সুগভীর মেলবন্ধন রচনা করে এবং ভক্তের অন্তরের কাম-ক্রোধ-লোভ আদি পার্থিব স্পৃহাসকল দূরীভূত ক'রে অন্তরকে নির্মল করে যেমন শরৎকালের মেঘরাশি হ'তে পতিত নির্মল বারিরাশি জলাশয় সমূহের পঙ্কিল জলরাশির মালিন্য দূর ক'রে তোলে। পথিক যেমন দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর আপন গৃহে ফিরে এলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে; তেমনই যে পবিত্র ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণে পবিত্র হয়ে সর্বপ্রকার রাগদ্বেষাদি দোষমুক্ত হয়ে যায় সে আর কদাপি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের আশ্রয় পরিত্যাগের বাসনা পোষণ করতে পারে না।

এ পরিক্ষীতের একান্ত অনুভূতির কথা। তিনি জীবন-মরণের সূক্ষ্ম সীমারেখার অতীব সমীপে দণ্ডায়মান। আর মাত্র সপ্ত দিবস তাঁর পরমায়ু অবশিষ্ট। এই কদিন মহর্ষি শ্রীশুকদেবের মুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত শ্রীহরির অপরূপ লীলাবৃত্তান্ত অহর্নিশ শ্রবণ ক'রে তিনি তাঁর অন্তরের গভীরে দর্শনলাভ করেছেন সুদুর্লভ কৃষ্ণোপলব্ধির এক জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা। আর এই প্রগাঢ় কৃষ্ণোপলব্ধির দ্বারা প্রচোদিত হয়ে স্বীয় জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে জগজ্জীবের কল্যাণার্থে এই অমূল্য অব্যক্ত সুপারিশ করেছেন যে সমগ্র জীবাত্মা

যেন সর্বদা স্বীয় কল্যাণার্থে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের অভয়াশ্রয় লাভে সচেষ্ট হয়।

কৃষ্ণকথামৃত কর্ণরন্ধ্রে বারেক প্রবিষ্ট হলে জীবের সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপ গৃহাদিতে আসক্তি ছেদন করে—

যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি।। (ভা ৩।৫।১১)

শ্রদ্ধাশীল পুরুষের হৃদয়ে যেমন যেমন কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয় তেমনি তেমনি তাঁর অন্তর হতে অন্যান্য বিষয়াসক্তি ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে—

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাত্যয়মাশু ধত্তে।
(ভা ৩।৫।১৩)

দশম তরঙ্গ

দ্বাদশ স্কন্ধে প্রায় অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সম্বলিত এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত যেন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবয়বমূর্তি। এবিষয়ে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল—"(শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রথম-দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ, তৃতীয়-চতুর্থ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দুই উরু, পঞ্চম-ষষ্ঠ স্কন্ধ দুই পার্শ্বদেশ, সপ্তম-অষ্টম স্কন্ধ দুই বাহু, নবম স্কন্ধ তাঁহার হৃদয়, একাদশ স্কন্ধ কপাল ও দ্বাদশ তাঁহার মস্তক, আর দশম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অধরের মধুর হাসি"। একারণেই যুগে যুগে শ্রীমদ্ভাগবত সমগ্র নর-নারীদের এত প্রাণপ্রিয়। বস্তুত এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমেই কৃষ্ণতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে নরনারীর হৃদয় উদ্বেলিত, আত্মহারা। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণকথা শ্রবণ ক'রে কখনও তারা আনন্দে-আবেশে-আবেগে উন্মত্তপ্রায় হয়ে নগ্নপদে আলুথালু বসনে ঊর্ধ্ববাহু-ঊর্ধ্বনেত্রে নৃত্যরত অবস্থায় অঝোরে অবিরাম আঁখিলোর বর্ষণ করে, কেউ বা অর্ধবাহ্যদশায় "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" রবে চেতন-অচেতন সকলকে কৃষ্ণভ্রমে বক্ষে জড়িয়ে ধরে, কেউ বা শ্রীমদ্ভাগবত-লব্ধ কৃষ্ণ-মদিরা আকণ্ঠ পান ক'রে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে জড়বৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করে আর ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণনাম তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হলে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে নীরবে নয়নযুগল হতে অঝোরে আঁখিলোর বর্ষণ করে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণভক্তের ঠিক এই মানসিক অবস্থাটি অতি অপরূপ ব্যঞ্জনাময় দরদী ভাষায় নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করেছেন—

"আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কোথা বল?
কেন কেউ বলে না কথা, হরি সবার চোখে জল।"

এই ভাবের হুবহু প্রতিফলন দেখা যায় উদ্ধবের মধ্যে। যখন মহামতি বিদুর ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ কালে প্রভাসতীর্থ হয়ে সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য এবং কুরুজাঙ্গালাদি দেশ পরিভ্রমণান্তে একদা যমুনাতীরে পৌঁছে বাসুদেবের একান্ত অনুচর শান্ত স্বভাব উদ্ধবের দর্শন পেয়ে পরম আগ্রহে তাঁর কাছে বাসুদেবের সন্দেশ জানতে চাইলেন, তখন তাঁর সুদীর্ঘ সময়ের কৃষ্ণবিরহের কারণে কেশবের চরণারবিন্দের স্মৃতিসুধায় আপ্লুত হয়ে উদ্ধব বাক-রুদ্ধ হয়ে

গেলেন। সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রেমাবেগের আতিশয্যে দু'নয়ন হতে প্রবাহিত হল উষ্ণ প্রেমবারিধারা। তিনি তখন লীলাময়ের লীলাস্মরণে এক পরম স্বর্গীয় আবিষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব উদ্ধবের এই ভাবনিমগ্ন অবস্থার এক অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন—

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্।
প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ।।১
যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্যাং বাললীলয়া।।২
স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং[৬] গতঃ।
পৃষ্টো বার্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্তুঃ পাদাবনুস্মরন্।।৩
স মুহূর্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ।।৪
পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গো মুঞ্চন্মীলদ্দৃশা শুচঃ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ।।৫

—"শ্রীশুকদেব বললেন—বিদুর যখন পরম ভক্ত উদ্ধবকে এইভাবে তাঁর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন উদ্ধবের মনে ভগবানের স্মৃতি জেগে উঠল এবং ভাবের আতিশয্যে হৃদয় ভ'রে যাওয়াতে তিনি কোন কথা বলতে সমর্থ হলেন না।।১।। পাঁচ বছর বয়সেই বালক উদ্ধব বাল্যক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি গঠন করে তাঁর সেবা-পূজাতে এমন তন্ময় যে তাঁর মা তাঁকে প্রাতরাশের জন্য ডাকাডাকি করলেও তিনি তা ছেড়ে যেতে চাইতেন না।।২।। এখন তো তিনি দীর্ঘকাল তাঁর সেবা-পূজায় ব্যাপৃত থেকে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন, সুতরাং বিদুরের প্রশ্নে প্রভুর চরণ-স্মরণে মুগ্ধ হয়ে—তাঁর মন বিরহবেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। কাজেই তিনি উত্তর দেবেন কিভাবে?।।৩।। শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের স্মৃতিসুধায় আপ্লুত হয়ে অনেকক্ষণ তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না, তীব্র ভক্তিযোগে সেই সুধায় মগ্ন হয়ে আনন্দসাগরে ডুবে গেলেন।"[৭]

৬। প্রাচীন বইয়ে—রজসং।
৭। গীতা প্রেসকৃত অনুবাদ।

একাদশ তরঙ্গ

পরমপুরুষ শ্রীভগবান যুগে যুগে অবতার রূপ পরিগ্রহ ক'রে আবির্ভূত হন। তিনি সর্বপ্রথম কৌমারসর্গে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারজন ব্রাহ্মণের রূপে পুরুষ অবতার রূপ পরিগ্রহ করেন—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।" ভা ১।৩।১

ক্রমে পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবান দ্বিতীয় অবতারে বরাহ রূপে, তৃতীয় অবতারে দেবর্ষি নারদ রূপে, চতুর্থ অবতারে ধর্মরাজের দুই যমজ পুত্র নর ও নারায়ণ রূপে, পঞ্চম অবতারে ভগবান কপিল রূপে, ষষ্ঠ অবতারে অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়ার গর্ভজাত সন্তান দত্তাত্রেয় রূপে, সপ্তম অবতারে প্রজাপতি রুচি ও তাঁর পত্নী আকুতির পুত্র যজ্ঞ রূপে, অষ্টম অবতারে রাজা নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবীর পুত্র রাজা ঋষভ রূপে, নবম অবতারে রাজা পৃথু রূপে, দশম অবতারে মৎস্য রূপে, একাদশ অবতারে কূর্ম রূপে এবং দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরি রূপে অবতীর্ণ হন। ত্রয়োদশ অবতারে তিনি মোহিনীরূপ পরিগ্রহ ক'রে অধার্মিক অসুরদের প্রলুব্ধ ক'রে তাদের নিকট হতে অমৃতভাণ্ড হরণ ক'রে দেবতাদের সেই অমৃত পান করান। চতুর্দশ অবতারে তিনি নৃসিংহ রূপ পরিগ্রহ করেন। পুনঃ তিনি পঞ্চদশ অবতারে বামন রূপে, ষোড়শ অবতারে পরশুরাম রূপে, সপ্তদশ অবতারে পরাশর মুনিপত্নী সত্যবতীর গর্ভজাত ব্যাসদেব রূপে, অষ্টাদশ অবতারে শ্রীরাম, ঊনবিংশ অবতারে বলরাম এবং বিংশতি অবতারে স্বয়ং তিনি পূর্ণপুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যদিও উপরোক্ত সকলেই পরমপুরুষ শ্রীভগবান বিষ্ণুর অবতার তথাপি অন্যান্য সকল অবতার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ বিদ্যমান। অন্যান্য অবতারগণ হয় সেই পূর্ণ পুরুষের অংশ অথবা সেই পূর্ণ পুরুষের পূর্ণ অংশের অংশ। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবান বিষ্ণু—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।" ভা ১।৩।২৮

অন্যান্য অবতারগণ কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন। যেমন পরশুরাম অবতীর্ণ হন দুর্বিনীত ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করবার জন্য এবং তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। তেমনই নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব হয়েছিল মহাপাতকী উদ্ধত হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করার জন্য। ফলে অন্যান্য সকল অবতারের উদ্দেশ্য একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি তাঁর অংশ নন। তিনি স্বয়ং সেই পরমপুরুষ, তিনি পরমার্থ, তিনি পূর্ণ। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে কেন অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও একই নাম 'অবতার' এ ভূষিত করা হবে। এর উত্তর পেতে হলে 'অবতার' শব্দের অর্থ স্মরণ করতে হবে। অবতার শব্দের অর্থ হল যিনি অবতীর্ণ হন। অব-তৃ(উত্তীর্ণ হওয়া) + ঘঞ্ = অবতারঃ। সুতরাং বুৎপত্তিগত দিক থেকে 'অবতার' শব্দটি কোন ধর্মীয় শব্দ নয়। শ্রীকৃষ্ণও অন্যান্য অবতারদের মতই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই অবতরণ করার কারণে তাঁকেও অন্যান্যদের সঙ্গে অবতার বলা হয়। আবার অন্যান্য অবতারদের থেকে শ্রীকৃষ্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হল অন্যান্য অবতারগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন অধার্মিক অত্যাচারীদের দমন করার জন্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন মূলতঃ ধার্মিক সদাচারীদের রক্ষাকর্তা হিসাবে যদিও আমরা তাঁকে কিছু কিছু অধার্মিক অত্যাচারীদের দমনকারী রূপে প্রত্যক্ষ করি। অন্যান্য সকল অবতারদের সৃষ্টির উৎস হলেন শ্রীভগবান বিষ্ণু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও উৎস নেই। তিনি নিজেই নিজের উৎস। তিনিই স্বয়ং সেই ভগবান বিষ্ণু। এই জন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে সকল অবতারের উৎস হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর মধ্যে সেই পরম সত্যের সকল বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ছত্রে মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁকে 'স্বরাট্' নামে স্তুতি করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তিনি স্বয়ং দৃপ্ত ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীতে তাঁর চাইতে বেশী বা তাঁর সমান অন্য কোনও সত্য নেই। একই সূত্রে গাঁথা মণিমালার ন্যায় সমস্ত জগৎ তাঁর মধ্যেই গাঁথা হয়ে আছে—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব।"

দ্বাদশ তরঙ্গ

কিন্তু ভগবানের অবতাররূপ পরিগ্রহ করার প্রয়োজন কেন হয়? শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে সূতমুনি সুস্পষ্টভাবে কারণটি ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীভগবান দেবতা-মানব-ইতরপ্রাণী পরিপূরিত এই বিশ্বচরাচর সত্ত্বময়তার সঙ্গে পরিচালিত করেন। কিন্তু কখনও কখনও এই বিশ্বচরাচরে সেই সত্ত্বভাব বিপন্ন হয় আর ঠিক তখনই ভগবান শ্রীহরি এই বিশ্বচরাচরে সেই সত্ত্বভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবতার রূপ পরিগ্রহ ক'রে অবতীর্ণ হন—

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্যঙনরাদিষু।।

একারণেই স্বয়ং তিনি দ্বাপরে দেবকীগর্ভসম্ভূত হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তখন কংস, জরাসন্ধ আদি দুরাত্মা-পাপাত্মাদের উদ্ধত দৃপ্ত পদভরে ধরিত্রীর সত্ত্বময় রূপ তমোগুণের দ্বারা নিরতিশয় আক্রান্ত। এই তো তাঁর আসার উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণ! তিনি যে সত্যসন্ধ! তিনি যে নিপীড়িত জর্জরিত মানবের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছেন তাঁর অভয়বাণী—প্রয়োজনে তিনি আসবেন! শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তাই তিনি অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে সমগ্র মানবসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর এই ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার কথা—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অনুরূপভাবে যুগে যুগে তাঁর ধরাধামে আগমনের কারণ সম্পর্কে খিলহরিবংশের হরিবংশপর্বের একচল্লিশতম অধ্যায়ের চতুর্দশ সংখ্যক শ্লোকে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলেছেন—

হিতার্থং সুরমর্ত্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ।
বহুশঃ সর্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি কার্যতঃ।।

—সমস্ত ভূতলোকের আত্মাস্বরূপ ভগবান শ্রীহরি সমগ্র দেবতা তথা মনুষ্যলোকের কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের নিমিত্ত আবশ্যকতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হন।

আবার খিলহরিবংশের ঐ একই অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের যুগে যুগে মর্ত্যভূমে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রায় সমসুরে বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় তদা সম্ভবতি প্রভুঃ।।

কিন্তু ভগবানের অবতার রূপ গ্রহণের তত্ত্বটি আবার অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে ভগবান যদি নিরাকার হন তাহলে তাঁর পক্ষে অবতার রূপ গ্রহণ ক'রে সাকার হওয়া কিভাবে সম্ভব? তাঁরা প্রশ্ন তোলেন যে এই বিশ্ব জগতের সৃজন-পালন-সংহার যাঁর কেবলমাত্র ইচ্ছাধীন, যাঁর কেবলমাত্র অঙ্গুলিহেলনেই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিমেষে লয়প্রাপ্ত হ'য়ে আবার নূতন সৃষ্টি হতে পারে, সেই অনন্ত শক্তিধর ভগবানকে মানব শরীর ধারণ ক'রে তুচ্ছ কিছু দুরাচারীকে সংহার করার তাগিদে একটা গোটা মানব জীবনের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী জন্ম-জড়া-মৃত্যু আদি বিবিধ দুঃসহ ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করতে হবে কেন। কিন্তু তাঁদের বোঝার মধ্যে এক মস্ত বড় ভ্রান্তি আছে। একথা সত্য যে শাস্ত্রে ভগবানের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সমস্ত মানুষ একচক্ষু হরিণের মত। শাস্ত্রের একটি দিকই তারা দেখতে পায়; অপর একটি দিক দেখতে পায় না। তাই এই ভ্রম। এই শ্রেণীর মানুষের অবগতির জন্য একথাটি ব'লে রাখা প্রয়োজন যে শাস্ত্রে এটাও উক্ত আছে যে ভগবান অনন্ত লীলাময়। এই বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রকাশ তাঁর অনন্ত লীলার অঙ্গীভূত। কাজেই জন্ম-জড়া-মৃত্যু সকলই তাঁর লীলা ব্যতীত কিছু নয়। তিনি এই ধরাধামে আত্মীয়-পরিজন-বন্ধু ইত্যাদি বিবিধ রূপ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হন ঠিকই। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর আসল রূপ পরিত্যাগ করেন না। এ সমুদায় তাঁর মায়ায় খেলা মাত্র। সেকারণেই আমরা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অন্তিম শরশয্যায় শায়িত সত্যদ্রষ্টা মহামতি ভীষ্মকে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলতে শুনি—তোমরা যাঁকে অজ্ঞানতা বশতঃ মাতুলেয়, প্রিয়সখা, শুভাকাঙ্ক্ষী,

পরামর্শদাতা, দূত, হিতকারী ব'লে ভাবছ, আসলে তিনি সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবান। তোমরা তাঁকে যে রূপেই ভাব না কেন, এ তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। আপাতদৃষ্টিতে তিনি বিভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হলেও তিনি কিন্তু কখনও তাঁর আসল রূপ পরিত্যাগ করেন না—

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্।।

(ভা ১।৯।২০)

ভগবানের অবতার রূপ গ্রহণের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন—"কর্ম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ, যাহা দুরূহ তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। কেননা, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতিক্ষুদ্র, অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?"

তিনি যে অনাদি, অনন্ত, অসীম। পার্থিব জগতের বন্ধনের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করার প্রয়াস তাঁর সেই অসীমত্বকে অস্বীকার ক'রে তাঁকে সসীমত্ব প্রদানের অপচেষ্টা যা ঐ সমস্ত মানুষদের অজ্ঞানতার ফসল ছাড়া কিছু নয়। তিনি পৃথিবীর প্রয়োজনে মানব কলেবর ধারণ ক'রে পৃথিবীবক্ষে নেমে আসেন ঠিকই, কিন্তু এই পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে ফেলেন না। সবকিছুই তো তাঁর ইচ্ছাধীন। তাই "সীমার মাঝে অসীম" তিনি পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত ক'রে ফেলেন না। তিনি যে মধুসূদন! 'মধু' শব্দের একটি অর্থ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। তাকে যিনি 'সূদি'

অর্থাৎ দমন করেন তিনি মধুসূদন। সুতরাং পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে তিনি সংশ্রববিহীন। তিনি পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মত এই পৃথিবীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন না। তাঁর বংশীতে ধ্বনিত হয় তাঁর 'আপন সুর'।

তিনি তো পদ্মপত্রে নীর। তিনি এই পার্থিব জগতের মধ্যে অবস্থান করলেও পার্থিব কোন বিষয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি তাঁর চরণপদ্মে সমর্পিতপ্রাণ ভক্তও একই গুণ প্রাপ্ত হন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদগুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।

(ভা ১।১১।৩৮)

পার্থিব জগতের সুখ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, কালিমা, ক্রোধ, হিংসা তাঁকে আশ্রয় করতে পারে না। তাঁর না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু। সর্বেশ্বর হয়েও তিনি মায়াবলে দেহ ধারণ ক'রে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে একথা শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হল—"হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে। আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুখঃ, পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি তাঁহার মায়া।"

সেই পরমমাত্মার প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কঠোপনিষদের ১।৩।১৫ মন্ত্রে যা বলা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।

—'তিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধহীন, বিকাররহিত, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্যষ্টি ও সমষ্টি—বুদ্ধি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং ধ্রুব...'।

তিনি তো পরব্রহ্ম, সর্ব আত্মার অধীশ্বর, পরমাত্মা। সেই পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আদি শঙ্করাচার্য তাঁর 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থে বলেছেন—

"আত্মা সদানন্দো নাস্যং দুঃখং কদাচন।"

অর্থাৎ তিনি সদানন্দময়, তিনি দুঃখের অতীত।

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যুভয়াত্মিকা নো
মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা।।

—তিনি সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানও নন, অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমানও নন আবার তিনি সদসৎ অর্থাৎ বিদ্যমান-অবিদ্যমান উভয়রূপ এমনও নন। তিনি ভিন্নও নন, আবার অভিন্নও নন আবার তিনি ভিন্নাভিন্ন উভয়রূপও নন। তিনি অঙ্গযুক্তও নন, অঙ্গহীনও নন, আবার তিনি সাঙ্গানঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন ও অঙ্গযুক্ত উভয়রূপও নন। অথচ তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়রূপ সম্পন্ন।

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব্ ব্যচীক্লৃপৎ।।২৩৫।।

—তিনি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ। তিনি না এই জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যে অধিষ্ঠিত, না এই জগৎ প্রপঞ্চ তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত।

অতঃ পরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং
নিরন্তরানন্দসস্বরূপম্।।২৩৯।।

—এই কারণে ভগবান পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সৎ, অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, নির্মল, শান্ত, আদি-অন্তরহিত, অক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত এবং সদানন্দরসস্বরূপ।

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং
নামরূপগুণদোষবর্জিতম্।
দেশকালবিষয়াতিবর্তি........ইতি।।২৫৫।।

—(তিনি) জাতি, নীতি, কুল, গোত্র ইত্যাদি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি নাম, রূপ, গুণ ও দোষ রহিত। তিনি দেশ, কাল এবং বস্তুসমূহের সঙ্গেও সম্পর্কশূন্য।

যৎপরং সকলবাগগোচরং
গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।
শুদ্ধচিদঘনমনাদিবস্তু........ইতি।।২৫৬।।

—(তিনি) বাণীর অগোচর অর্থাৎ বাক্যদ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না, তাঁকে একমাত্র নির্মল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। তিনি শুদ্ধ চিদঘন অনাদি বস্তু।

ষড়ভিরূর্মিভিরযোগি যোগিহৃদ্
ভাবিতং ন করণৈর্বিভাবিতম্।
বুদ্ধ্যবেদ্যমনবদ্যভূতি........ইতি।।২৫৭।।

—ক্ষুৎপিপাসাদি ছয় প্রকার তরঙ্গ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, যোগীগণ নিত্য তাঁকে তাঁদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, বুদ্ধি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম, তিনি সদ্য অনিন্দনীয় পরম ঐশ্বর্যশালী সত্ত্বা।

ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং
স্বাশ্রয়ং চ সদসদ্বিলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিরুপমানমৃদ্ধিমদ্........ইতি।।২৫৮।।

—(তিনি) এই মিথ্যা-কল্পিত জগৎ প্রপঞ্চের আধার, স্বয়ং নিজের আশ্রয়, সদসৎ উভয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, নিরবয়ব, উপমারহিত এবং পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন।

জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়—
ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।
বিশ্বসৃষ্ট্যবনঘাতকারণং.....ইতি।।২৫৯।।

—জন্ম, মৃত্যু, পরিণতি, ক্ষয়, রোগ-ব্যাধি এবং বিনাশ—শরীরের এই ছয় প্রকার বিকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি অবিনাশী, তিনি এই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ।

একমেব সদনেককারণং
কারণান্তরনিরাসকারণম্।
কার্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং.....ইতি।।২৬১।।

—(তিনি) এক হয়েও বহুর কারণ অথচ অপর কোন কারণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। তিনি মায়া এবং তার প্রভাবে সৃষ্ট এই জগৎ প্রপঞ্চের প্রভাব থেকে মুক্ত, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

নির্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং
যত্ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং......ইতি।।২৬২।।

—তিনি নির্বিকল্প অর্থাৎ তাঁর বিকল্প অর্থাৎ দ্বিতীয় বলে কিছু নেই; তিনি ক্ষর অর্থাৎ নশ্বর শরীর এবং অনশ্বর জীবাত্মা—উভয় থেকেই ভিন্ন, তিনি মহান এবং অবিনাশী, নিত্য, অব্যয়, আনন্দস্বরূপ এবং নিষ্কলঙ্ক।

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং......ইতি।।৪০৯।।

—তিনি নিত্যবোধ-স্বরূপ, কেবলানন্দ-স্বরূপ, উপমারহিত, কালাতীত, নিত্যমুক্ত, নিশ্চেষ্ট, আকাশের ন্যায় অসীম-অনন্ত, কলারহিত, নির্বিকল্প পূর্ণ ব্রহ্ম।

অজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং.......ইতি।।৪১১।।

—তিনি অজর, অমর, আভাসশূণ্য অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বা দ্বিতীয়-রূপ বিহীন বস্তুস্বরূপ, তিনি নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রসদৃশ সত্ত্বা, নাম রূপ বিহীন, ত্রিগুণাতীত, নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর, শান্তস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম।

সৎসমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।।৪৭১।।

—তিনি সত্য, বৈভবপূর্ণ, স্বতঃসিদ্ধ, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ, উপমাবিহীন, অদ্বিতীয়। তাঁর মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই।

আকাশবন্নির্মলনির্বিকল্পং
নিঃসীমনিস্পন্দননির্বিকারম্।
অন্তর্বহিঃশূণ্যমনন্যমদ্বয়ং
স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্।।৩৯৪।।

—যে পরব্রহ্ম স্বয়ং আকাশের তুল্য নির্মল, নির্বিকল্প, নিঃসীম, নিশ্চল, নির্বিকার, অন্তর-বাহির সর্বদিক থেকেই শূন্য, অনন্য এবং অদ্বিতীয় তিনি কিভাবে জ্ঞানের দ্বারা বোধগম্য হবেন?

সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং.......ইতি।।৫১৪।।

—তিনি সকলের আধার, সর্ব বস্তুর প্রকাশক, সর্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্বশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল এবং বিকল্পরহিত।

এই যাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য, তোমার অস্বচ্ছ, স্থূল, ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তার নাগাল তুমি পাবে কি ক'রে? সংকীর্ণ সরসীর ক্ষুদ্রকায় সফরী যদি মহাসাগরের গভীরতা পরিমাপে প্রয়াসী হয় তা কি অতীব হাস্যকর হবে না? আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে তুমি তার মধ্যে রক্ত-মাংস-স্নেহ পদার্থই দেখতে পাবে। তার মধ্যে অন্তর্লীন রহস্যের সন্ধান তুমি কদাপি পাবে না। কারণ তা যে অতীব গূঢ়। যুক্তিতর্কের অতীত।

কাজেই তাঁকে পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে সংপৃক্ত ক'রে তাঁর অবতারত্ব অস্বীকার করার প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়। যাঁরা এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে ভগবানের অবতারত্ব অস্বীকার করার পক্ষপাতী, তাঁদের প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বলেছেন—"যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এসকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থুল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনি তাঁহার লীলা মাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?"

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

ইতিপূর্বে আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছি। অতি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ ক'রে তিনি নন্দগৃহে অধিষ্ঠিত হয়ে অতি শৈশবেই পূতনাবধ, তৃণাবর্ত বধ প্রভৃতি বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করতে লাগলেন। একদা পিতা বসুদেবের অনুরোধে মহামতি গর্গাচার্য নন্দালয়ে গমন ক'রে অতি সঙ্গোপনে তাঁর দ্বিজোচিত সংস্কারক্রিয়াদি সুসম্পন্ন ক'রে তাঁর নামকরণ করেন 'কৃষ্ণ'। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অষ্টম এবং নবম শ্লোকে কথিত হয়েছে—

"গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেবপ্রচোদিতঃ।
প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারানকরোত্তয়োঃ।।৮।।
জ্যেষ্ঠন চ রামমিত্যাহ কৃষ্ণং চৈব তথাঽবরম্।
গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ব্বন্মহামতিঃ।।৯।।

শ্রীকৃষ্ণের তো কত নাম। গর্গমুনি তাঁর নামকরণ সংস্কার করার পর নন্দরাজকে বলেছিলেন—

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ।।
ভা ১০।৮।১৫

—তোমার এই পুত্রের অনেক নাম ও এর ভিন্ন গুন ও কর্ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ সেগুলি অজ্ঞাত, কিন্তু আমি সেগুলি জানি।

তাঁর অপর একটি নাম বাসুদেব। এই নামের অনেক অর্থ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গাচার্য কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে নন্দরাজকে বলেছিলেন যে তাঁর এই পুত্রটি পূর্বে কোন এক সময় বসুদেবের পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে যাঁরা এই রহস্য জানেন তাঁরা তাকে 'শ্রীমান বাসুদেব' বলে অভিহিত করেন—

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে।।
ভা ১০।৮।১৪

কিন্তু বসুদেবের পুত্র বলেই যে বাসুদেব নাম হবে একথা শিরোধার্য মনে করার কারণ নেই। মহাভারতের পুণ্ড্রাধিপতির পিতার নাম বসুদেব ছিল না; কিন্তু তার নাম ছিল বাসুদেব। ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ের একবিংশতম শ্লোকে 'বাসুদেব' শব্দের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্।।

—যে চিত্ত সত্ত্বপ্রধান, নির্মল, শান্ত অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি রিপু বিহীন এবং ভগবৎ উপলব্ধির স্থান তাই হল মহত্তত্ত্ব এবং তাকেই 'বাসুদেব' নামে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং ভাগবতকার 'বাসুদেব' নামটি এই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন এবং গর্গাচার্য যে 'বাসুদেব' নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'বসুদেব' এর উল্লেখ করেছিলেন, সেটা তিনি সাধারণ মানুষ যাঁরা তাঁকে বসুদেবের পুত্র বলে জানেন কিন্তু এই বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব জানেন না তাঁদের উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন মাত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ের ছাপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোকে 'বাসুদেব' নামের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে—

বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ।।

—যাঁর প্রতি লোমকূপে বিশ্ব সকল বিরাজমান, সেই বিশ্বনিবাসের নাম 'বাসু', পরমব্রহ্মের নাম 'দেব', এই কারণে তাঁর নাম হয়েছে 'বাসুদেব'।

অর্থাৎ তিনিই হলেন পরমব্রহ্ম যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চেতন-অচেতন সকলের আশ্রয়স্থল। এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ-চরিত্রের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'আশ্রয়তত্ত্ব' তা প্রকাশ পায়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর 'বাসুদেব' নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"বাসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করি এবং সমুদয় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম 'বাসুদেব'।[৪]

সুতরাং মহাভারতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখ নিঃসৃত ব্যাখ্যা থেকে একথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় তিনি বসুদেব-পুত্র হওয়ার কারণেই তাঁর নাম বাসুদেব হয়নি।

তাঁর আর এক নাম হরি। অনন্তশক্তি ভগবান এককল্পে সুযজ্ঞ নাম গ্রহণ ক'রে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকুতির গর্ভে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই অবতারে তিনি ত্রিলোকের ঘোরতর দুঃখ হরণ করেছিলেন। সেই কারণে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'হরি'। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুয়মান্ সুযজ্ঞ
আকৃতিসূনুরমরানাথ দক্ষিণায়াম্।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ।। ভা ২।৭।২

'হরি' শব্দের এক অতি সহজ, সরল, হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে—

হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন।।

অন্যদেহে উপস্থিত ভগবান শ্রীহরিই 'কৃষ্ণ' নামে খ্যাত হন। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল—

"মেঘকৃষ্ণস্তু কৃষ্ণোঽভূদ্দেহান্তরগতো হরি।"
(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব)

তাঁর এক নাম 'মুকুন্দ'। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে 'মুকুন্দ' নামের বুৎপত্তি হিসাবে বলা হয়েছে—

৪। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কৃত অনুবাদ

মুকুমব্যয়মান্তঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকম্।
তদ্দদাতি চ যে দেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।

—"মুকুম্ এই শব্দটি মকারান্ত অব্যয় এবং নির্বাণ ও মোক্ষ অর্থে অভিহিত। তাঁহাকে যিনি দান করেন, তিনিই মুকুন্দ-শব্দের অভিধেয়। 'মুকুম' শব্দ বেদে ভক্তি এবং প্রেমরসে নির্দিষ্ট; অতএব যিনি ভক্তগণকে ভক্তি এবং প্রেমরস প্রদান করেন তিনিও মুকুন্দ-শব্দের বাচ্য।"

তিনি 'গোবিন্দ' নামেও খ্যাত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ের সাতান্ন সংখ্যক শ্লোকে 'গোবিন্দ' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দন্তে যোঽবলীলয়া।
জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।

—যিনি অবলীলাক্রমে 'গো' অর্থাৎ পৃথিবী ও বিশ্বসমূহ ধারণ করেন এবং যিনি অনন্তজ্ঞানসমুদ্র তিনিই 'গোবিন্দ'।

শ্রীকৃষ্ণ 'নারায়ণ' নামেও প্রসিদ্ধ। বিরাটপুরুষ 'নর' থেকে উৎপন্ন হয় জল। সেইজন্য জলের অপর নাম 'নার', আর সেই জলে যিনি 'অয়ন' অর্থাৎ অধিষ্ঠান করেন তাঁর নাম 'নারায়ণ'। স্বীয় দেহ হতে জাত এই জলের মধ্যে তিনি এক সহস্র বৎসর আশ্রয় নিয়েছিলেন ব'লে তিনি 'নারায়ণ' নামে খ্যাত হন—

তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ।।
ভা ২।১০।১১

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে অনুরূপ ভাবে বলা হয়েছে—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারয়ণঃ স্মৃতঃ।।

অর্থাৎ, "নর নামক পরমাত্মা হ'তে সর্বাগ্রে প্রসূত ব'লে অপত্যপ্রত্যয়ে জলকে নারা বলে এবং নারা ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় ব'লে তাকে নারায়ণ বলা হয়।"

কুর্মপুরাণের পূর্বভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে 'নারায়ণ' নামের অর্থ প্রায় অনুরূপ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনব।।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণ স্মৃতঃ।।

বেদে 'অপ' অর্থাৎ 'জল' কে 'নার' এই নামে অভিহিত করা হয়। এই 'নার' অর্থাৎ জল 'নর' অর্থাৎ মানুষের 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয়। এইজন্য (জলে অবস্থান হেতু ভগবান বিষ্ণু) নারায়ণ নামে কথিত হন।

তাঁর আর একটি পরমাদরণীয় নাম হল 'মধুসূদন'। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ে 'মধুসূদন' নামের অর্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে—

সূদনং মধুদৈত্যশ্চ যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদভিন্নার্থমীপ্সিতম্।।৩২
মধু ক্লীবে চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনঃ।।৩৩
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ।।৩৪

—যিনি মধু নামক দৈত্যকে সংহার করেছেন তিনিই মধুসূদন, সাধুগণ বেদভিন্ন এই অর্থ দ্বারাও মধুসূদন নাম সমর্থন করেন। 'মধু' এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দের অর্থ পুষ্পরস এবং কৃতশুভাশুভ কর্ম। যিনি ভক্তগণের শুভাশুভ কর্মের নাশকারী তিনি মধুসূদন নামে খ্যাত। পরিণামে পরিতাপ প্রদানকারী কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের পক্ষে আপাতত সুখকর কর্মসমূহকেও মধু বলা হয়। যিনি এই প্রকার কর্মের বিনাশ সাধন করেন তিনিও মধুসূদন নামে অভিহিত হন।

তিনি অনন্ত নামেও খ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের একত্রিংশ শ্লোকে দেখি যে প্রচেতগণ ভগবানকে বলছেন—'ন হ্যন্তস্ত্বদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে'। অর্থাৎ তিনি অনন্ত বিভূতির অধিকারী। তাই তাঁকে 'অনন্ত' বলা হয়।

কৃষ্ণের একটি বহু উচ্চারিত নাম—কেশব। এই 'কেশব' নামটি কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। তাঁর প্রতি কি যেন এক অব্যক্ত সুগভীর আন্তরিকতায় সমগ্র অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু 'কেশব'

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা নিয়ে বিদগ্ধ মহলে মতভেদ আছে। 'কেশব' শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ হল—প্রশস্ত কেশযুক্ত। এখন আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখা প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণের 'কেশব' নামের সঙ্গে কেশ বা চুল কতখানি সম্পর্কযুক্ত।

এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ের ষাট ও একষট্টি সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করা হল—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।।৬০।।
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ।।৬১।।

অর্থাৎ (ব্রহ্মাকর্তৃক) এইরূপে স্তুত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান স্বীয় মস্তক হতে একটি শুভ্র ও একটি কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপাটন ক'রে দেবতাদের বললেন যে তাঁর এই দুইটি কেশ পৃথিবীতে অবতার রূপ পরিগ্রহ ক'রে পৃথিবীর ভাররূপ কষ্ট দূর করবে।

আবার মহাভারতে আছে—

"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চজর্হে শুক্লমেকম্ পরঞ্চ কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদুনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিহীং দেবকীঞ্চ।।
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব সোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ।।"

অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণু দুটি কেশ—একটি শ্বেত অপরটি কৃষ্ণ স্বীয় মস্তক হতে উৎপাটিত করলেন। কেশদুটির মধ্যে শ্বেতকেশটি যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও কৃষ্ণকেশটি দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হল। রোহিণীর গর্ভ হতে বলরাম ও দেবকীর গর্ভ হতে কৃষ্ণ জন্ম নিলেন। এভাবে শ্বেতকেশ হতে বলরাম এবং কৃষ্ণকেশ হতে কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন।

কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' গ্রন্থে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ খণ্ডন ক'রে বলেছেন—"তস্মান্ ন কেশবতারত্বেঽপি তাৎপর্যম্, কেশ-শব্দস্য বালত্ববাচনঞ্চ।" অর্থাৎ তাঁর মতে বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ যে বিষ্ণুর

কেশাবতার এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে 'কেশ' শব্দটি 'অংশু' অর্থাৎ 'জ্যোতি' অর্থে প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়। বোপদেব গোস্বামী তাঁর 'মুক্তাফলটীকা' ভাষ্যে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে 'কেশৌ' পদটি দু'টি শব্দের সমষ্টি—'ক' এবং 'ঈশৌ'। 'ক' শব্দের অর্থ 'পরমানন্দময়' এবং 'ঈশৌ' শব্দের অর্থ 'পরমপুরুষ'। এ প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"অথ উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ কেশাবিত্যসৈব শব্দার্থোঽপি মুক্তাফলটীকায়াং ন কেশৌ সুখস্বামিনৌ সিতো রামঃ আত্মনঃ সকাশাদুজ্জহার উদ্ধৃতবান্।"

শ্রী প্রাণগোপাল গোস্বামী তাঁর সম্পাদিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' গ্রন্থে 'কৃষ্ণকেশ' সংক্রান্ত বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন—"কেশ শব্দের চুল এবং জ্যোতিঃ এই উভয় অর্থই আছে। শ্রীকৃষ্ণবতার প্রসঙ্গে যে যে স্থানে কেশ-শব্দের প্রয়োগ আছে সে সব স্থলে তাহার জ্যোতিঃ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শুক্ল-কৃষ্ণ-অঙ্গদ্যুতি-বিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, ইহা সূচনা করিবার জন্য ক্ষীরোদশায়ী শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—প্রভার্সখণ্ড-বচনের এই অর্থই সঙ্গত হইতেছে।"

নৃসিংহপুরাণে কিন্তু 'কেশ' শব্দ ব্যবহার করা হয় নি, কৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে 'শক্তি' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে—

বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে।
সিতকৃষ্ণে চ কংস্যাদ্যান্ ঘাতয়িশ্যতঃ।

অর্থাৎ যদুবংশীয় বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতীর্ণ হয়ে আমার শুক্ল-কৃষ্ণ-শক্তি কংসাদিকে হত্যা করবে।

এ প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"অতএব নৃসিংহপুরাণে কৃষ্ণাবতারপ্রসঙ্গে শক্তিশব্দ এব প্রযুজ্যতে ন তু কেশশব্দঃ। তথাহি, বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে। সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান ঘাতয়িষ্যত ইত্যাদিনা।"

শ্রীধরগোস্বামীর মতে—"সিতকৃষ্ণকেশ ইত্যত্র সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব ন তু বয়ঃপরিণামকৃতম্ অবিকারিত্বাৎ।"

সুতরাং সমস্ত প্রামাণ্য সূত্র বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায় যে ভগবানের 'কেশব' নামের প্রকৃত অর্থ হল—জ্যোতিষ্মান্ পরমপুরুষ।

অবশ্য গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ হওয়ায় তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'কৃষ্ণ'—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

ভা ১০।৮।১৩

—"এই যে শ্যামলবর্ণের বালক, এ প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করে থাকে। পূর্ব পূর্ব যুগে এ শুক্ল, রক্ত এবং পীত—এই তিনটি বর্ণ গ্রহণ করেছিল, বর্তমানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। সুতরাং এর নাম 'কৃষ্ণ'।" (গীতাপ্রেসকৃত অনুবাদ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ে 'কৃষ্ণ' নামের অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অন্যভাবে—

কৃষিরুৎকৃষ্টবচনো ণশ্চ সদ্ভক্তিবাচকঃ।
অশ্চাপি দাতৃবচনঃ কৃষ্ণং তেন বিদুর্বুধাঃ।।৩৫
কৃষিশ্চ পরমানন্দে ণশ্চ তদ্দাস্যকর্ম্মণি।
তয়োর্দাতা তয়োর্দেবস্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।৩৬

—"কৃষি-শব্দ উৎকৃষ্ট বোধক, ণ-কার সদ্ভক্তিবাচী এবং অ-কার দাতৃপর; অতএব যিনি উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তি সম্প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণনামে উল্লিখিত হন। এবং কৃষি-শব্দ পরমানন্দবোধক, ণ-শব্দ তাহার দাস্যবাচক, অ-কার দানার্থক; অতএব যিনি ভক্তগণকে পরমানন্দ ও দাস্য দান করেন তিনিও কৃষ্ণনামে অভিহিত হন।"

কৃষ্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত তাঁর 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যেই নিহিত আছে। তাপনীয় শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে সনকাদি ঋষিগণ যখন ব্রহ্মার নিকট জানতে চাইলেন-কঃ কৃষ্ণঃ? অর্থাৎ কৃষ্ণ কে তখন ব্রহ্মা তাঁদেরকে বললেন—'পাপকর্ষণো ইতি' কৃষ্ণ। অর্থাৎ পাপ কর্ষণ অর্থাৎ হরণ করেন বলেই তিনি কৃষ্ণ। শ্রী বিশ্বেশ্বর তাঁর টীকায় এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—পাপকর্ষকসচ্চিদানন্দ এব কৃষ্ণঃ ইতি। অর্থাৎ তিনি পাপকর্ষণকারী সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ। শ্রীবিশ্বনাথ তাঁর টীকায় বলেছেন—'কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্ ইতি।' অর্থাৎ তিনি ভক্তের সর্ব অপরাধ কর্ষণ করেন।

ভক্তের জীবনে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মায়ার ফাঁদ পাতা এই ভুবনে বিভিন্ন প্রহেলিকার প্রভাবে মানুষ কখন যে জ্ঞাতসারে বা অজান্তে নিবিড় পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয় তা বোঝা বড়ই কঠিন। কিন্তু মানুষ তো একসময় কামনা করে মায়ার আবেশ মুক্ত হয়ে তার আরাধ্য দেবতার শ্রীচরণে দেহ-মন-প্রাণ-পার্থিব জগতের সমস্তকিছু নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিয়ে আত্মসমর্পণের পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী-সলিলে অবগাহন ক'রে অন্তরে সঞ্চিত পাপরাশির গভীর অনপনীয় কালিমা ধৌত ক'রে তাঁর শ্রীচরণের যোগ্য হয়ে উঠতে। আর তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে সেই ভক্তের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত পাপ কর্ষণ করে তাকে মানুষ করে তোলেন।

তাঁর অপর দুটি বহু উচ্চারিত ও ভক্তজনেদের কাছে অন্যতম পরমপ্রিয় নাম হল—'মুরারি' ও 'মাধব'। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ের আটান্ন, ঊনষাট এবং ষাট সংখ্যক শ্লোকত্রয়ে এই দুটি নামের অর্থের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপ-কর্ম্মভোগে চ কর্ম্মণাম্।
দৈত্যভেদে হ্যরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।৫৮
মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।।৫৯
মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ।।৬০

—'মুর' শব্দটি হল ক্লেশ, সন্তাপ, কর্মভোগ এবং দৈত্যবিশেষের নাম। তিনি এই সমুদায়ের 'অরি'। তাই তিনি 'মুরারি' নামে কীর্তিত হন। তিনি 'মা' শব্দে বিখ্যাতা, ব্রহ্মস্বরূপা মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী সনাতনী বিষ্ণুমায়া, মহালক্ষ্মী বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা ও গঙ্গা এই সকলের 'ধব' অর্থাৎ স্বামী। এই কারণে তিনি মা'র ধব অর্থে 'মাধব' নামে পরিচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় ও সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এবং চতুর্থ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের 'অধোক্ষজ' এই নাম পাওয়া যায়। 'অধোক্ষজ' কথার অর্থ হল 'অধঃ (নিম্ন) স্থিত যে অক্ষ

(ইন্দ্রিয়), মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসে অধোক্ষ (পাদ), তদুত্তরে জন (জন্মা) + ড কর্তৃ"[৯]। কথিত আছে কোন কল্পে ভগবান বিষ্ণু মহেশ্বরের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এইজন্য তাঁর এক নাম হয় 'অধোক্ষজ'। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থে 'অধোক্ষজ' পদের অর্থ করেছেন 'অতীন্দ্রিয়'।

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' টীকা গ্রন্থে 'অধোক্ষজ' নামের অন্যরকম অর্থ করেছেন। এই নামের সঠিক অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য তিনি হরিবংশের বাসুদেব-মাহাত্ম্যের অন্তর্গত বিষ্ণুপর্বের একশত এক অধ্যায়ের বালকৃষ্ণ কর্তৃক পুতনাবধ সংক্রান্ত কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন—

প্রত্যক্ষং শূরসেনানাং শ্রূয়তে মহদ্ভুতম্।
অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা।।৩০।।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী।
পুতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা।।৩১।।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দনে।
দদৃশুর্নিহতাং তাং তে রাক্ষসীং বনগোচরাঃ।।৩২।।
পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ।
অত্যদ্ভুতমিদং চাসীদ যচ্ছিশুঃ পুরুষোত্তমঃ।।৩৩।।

—একদিন শিশুকৃষ্ণ যখন একটি শকটের নীচে শয়ন করছিলেন তখন পুতনা রাক্ষসী তাঁকে হত্যা করার বাসনায় স্তনে বিষলিপ্ত ক'রে বালক কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাতে এলে শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপান ক'রেই তাকে হত্যা করেন। তখন গোপ বালকগণ তাঁকে ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর হাত থেকে বেঁচে যেতে দেখে বলেছিল—এই বালক অক্ষের (শকটের) অধঃ (নীচে) পুনরায় 'জ' (জন্ম প্রাপ্ত) হয়েছে। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে হরিবংশ অনুযায়ী গোপবালকগণ বালক কৃষ্ণ সম্পর্কে এইরূপ কথা বলার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই অর্থে 'অধোক্ষজ' নামে প্রসিদ্ধ হন। উৎসুক পাঠকের স্বার্থে শ্রীজীব গোস্বামির টীকা ভাষ্যের সংশ্লিষ্ট মূল অংশটি উদ্ধৃত হল—"ইতি হরিবংশে বাসুদেব-মাহাত্ম্যে তন্নামঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়তয়া প্রসিদ্ধেঃ।"

৯। সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র

তিনি দামোদর নামেও খ্যাত। দামোদর নামের উৎপত্তির কারণ হিসাবে হরিবংশ পুরাণের বিষ্ণুপর্বের উপরোক্ত অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে—

দাম্না চোলূখলে বদ্ধো বিপ্রকুর্বন্ কুমারকম্
বভঞ্জার্জুনবৃক্ষৌ দ্বৌ খ্যাতো দামোদরস্তদা।

—শৈশবে মধুর-দুরন্ত শ্রীকৃষ্ণকে কৃত্রিম প্রতিহত করার নিমিত্ত মাতা যশোদা তাঁকে কটিদেশে একটি 'দাম' অর্থাৎ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে শিশুর পক্ষে অতীব ভারী একটি উদূখলের (ধান্যাদি ভানিবার পাত্র) সঙ্গে বদ্ধ করে স্বীয় কর্মে গমন করেছিলেন। শিশু কৃষ্ণ সেই অতীব ভারী উদূখলকে অক্লেশে টেনে স্থানচ্যুত ক'রে দুইটি যমজ অর্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়ে গিয়ে সেই যমজ অর্জুন বৃক্ষকে উৎপাটিত করে ফেলেছিলেন। সেই সময় থেকে উদরে 'দাম' অর্থাৎ রজ্জুদ্বারা বন্ধনের কারণে তিনি দামোদর নামে খ্যাত হন।

চতুর্দশ তরঙ্গ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে মানব-রূপ ধারণ ক'রে মানুষের মতই কর্মে রত থাকলেও সেই মানবরূপের অন্তরালে তিনি বহুবিধ অতিমানবিক কর্ম সাধন করেছিলেন—

"কৃতবান্ কিল বীর্যাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ।।
(ভাঃ ১।১।২০)

শ্রীকৃষ্ণের অতি শৈশবেই মানবলীলার অন্তরালে অতিমানবিক লীলার বিস্তারিত বর্ণনা দশমস্কন্ধে অতি সুললিত ভাষায় করা হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম থেকে একান্ন সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে পুরাণকার যে জীবন্ত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেছেন তা পাঠ করলে যে কোনও পাঠকের মনে হবে এই বুঝি অতি আধুনিক বর্তমানযুগের কোনও গ্রাম্য বালক আজকে এই মুহূর্তে অন্যান্য গ্রাম্য রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠে ক্রীড়ারত।

স্বল্পেনৈব হি কালেন রিঙ্গিণৌ তৌ তদা ব্রজে।
ঘৃষ্টজানুকরৌ তৌ হি বভূবতরুভাবপি।।১০
করীষভস্মাদিগ্ধাঙ্গৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ।
ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী।।১১
গোবাটমধ্যে ক্রীড়ন্তৌ বৎসবাটগতৌ পুনঃ।
তদহর্জাতগোবৎসপুচ্ছাকর্ষণ-তৎপরৌ।।১২
যদা যশোদা তৌ বালাবেকস্তানচরাবুভৌ।
শশাক নো বারয়িতুং ক্রীড়ন্তাবতিচঞ্চলৌ।।১৩ ইতি

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও অতি জীবন্ত, মধুবর্ষী—

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ।।২১

তাবঙিঘ্রযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ।।২২
তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্।।২৩
যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ।।২৪
শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যাসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ শোকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্।।২৫

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা।।২৬

অর্থাৎ নামকরণ অনুষ্ঠানের অল্প কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুই জানু ও হাতের সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়ে গোকুলে বিহার করতে শুরু করেন। গোকুলে ধূলি-কর্দম অনুলিপ্ত কটি-কর ও চরণযুগলের সাহায্যে সরীসৃপের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়ে গমনাগমনের সময় তাঁদের চরণভূষণের কিঙ্কিণীধ্বনিতে পুণ্য গোকুলভূমি মুখরিত হয়ে থাকত। এই অপূর্ব নয়নলোভন দৃশ্য উপভোগের উদ্দেশ্যে সমবেত উল্লসিত গোকুলবাসীদের কাউকে পরিচিত জন ভ্রমে অনুসরণকারী রাম-কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে কিয়দ্দুর অগ্রসর হয়ে সহসা ভুল বুঝতে পেরে মুগ্ধ ও ভীত চিত্তে দ্রুত মাতা রোহিণী ও যশোদার নিকট ফিরে এসে মাতৃস্তন্য পান করেন এবং কখনও পুলকিত হৃদয়ে শ্বেতশুভ্র নবোদ্গত দন্ত-মুকুল বিকশিত ক'রে জননীসহ উপস্থিত সকলের হৃদয় অনন্ত আনন্দসুধায় পরিপূরিত করেন। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি ঘটলে তাঁরা ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠানে রত হতেন। কখনও নবীন গোবৎসের পুচ্ছাকর্ষণ করতেন এবং সহসা আকর্ষণে ভীত-চকিত গোবৎসগণ পলায়নের নিমিত্ত ধাবমান হলে তাঁরাও ধৃত-পুচ্ছ অবস্থায় গোবৎসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে চলতেন। কখনও মৃগ, গাভী প্রভৃতি শৃঙ্গী জীবদের সন্নিকটে ছুটে যেতেন, কখনও জ্বলন্ত অগ্নিসহ ক্রীড়া করতেন, কখনও তীক্ষ্ণদন্তী সারমেয়, মার্জারদের সঙ্গে ক্রীড়ারত হতেন, কখনও তরবারি প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট

হতেন, কখনও জল, ময়ূরপক্ষী, কণ্টক প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই সেই স্থানে উপস্থিত হতেন। এইভাবে অতি অপরূপ বাল্যলীলার মাধ্যমে সকলকে সীমাহীন আনন্দসাগরে অবগাহন করাতে করাতে ধীরে ধীরে একদা তাঁরা হামাগুড়ি পরিত্যাগ ক'রে নিজ পদদ্বয়ের উপর উঠে দাঁড়াতে শিখলেন এবং করতল ও জানুদ্বয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই পদদ্বয়ের দ্বারাই ইতস্তত বিহার করতে শুরু করলেন।

কি অপূর্ব জীবন্ত এই বর্ণনা। এই বর্ণনা পাঠ ক'রে কখনও কি কারও কদাচিৎ মনে হতে পারে যে এর মধ্যে কোন কল্পনা, কোন অবাস্তব কিছু, কোন অতিশয়োক্তি, কোন ধর্মীয় গন্ধ আছে? বস্তুত তা কখনই নয়। এ এক অতি বাস্তব চিত্র। যে কেউ যেকোন মুহূর্তে কোন গ্রামীণ পরিবেশে গিয়ে দৃকপাত করলে হয়তো অবিকল এই চিত্রটিই প্রত্যক্ষ করবেন। সুতরাং কৃষ্ণপ্রসঙ্গ কখনই কোন কাল্পনিক বিষয় নয়।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

কৃষ্ণকথা তো কৃষ্ণেরই বাঙ্ময়ী মূর্তি। ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভক্তের হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রে মধুমক্ষিকা যেমন মধুজালকের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে মধু সঞ্চয় ক'রে দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেয় তদ্রূপ কৃষ্ণের এই বাঙ্ময়ী মূর্তি ভক্তের হৃদয়াভ্যন্তর ক্রমশ পূর্ণ ক'রে অন্যান্য পার্থিব আসক্তির প্রবেশের পথ বন্ধ ক'রে দেয় এবং ভক্ত ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সান্নিধ্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং একদা পরিপূর্ণ আত্মানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থিত পার্থিব কামনা-বাসনারূপ মল মানুষকে তার অভীষ্ট ভগবৎ আরাধনার দিকে এগিয়ে যাবার পথে নিরন্তর বাধা সৃষ্টি করে। এই পার্থিব বাসনামলকে অন্তর থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের গুণকীর্তনই একমাত্র উপায়। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই কথা আমরা শ্রীসনৎকুমারের মুখে মহারাজ পৃথুর উদ্দেশ্যে বলতে শুনি—

অস্তেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ
পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ।

ভা ৪।২২।২০

শ্রীশুকদেবের মুখে শুনি যে সর্বপাপঘ্ন পরম মঙ্গলময় সেই পরমপুরুষের অমৃতময় গুণ, কর্ম ও জন্ম বিষয়ক বৃত্তান্তসমূহ গীত ও উচ্চারিত হয়ে জগত সংসারকে সঞ্জীবিত, শোভিত ও পবিত্র করে তোলে। আর যে সকল কথা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সেগুলি যতই অলঙ্কৃত হোক না কেন তা কেবল সুসজ্জিত শবদেহের মত—

যস্যাখিলমীবহভিঃ সুমঙ্গলৈর্ব্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগদ্ যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ।।

ভা ১০।৩৮।১২

আবার দেবর্ষি নারদ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্ম। তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করলে চণ্ডালও পবিত্র হয়ে যায়— "শ্রবণাৎ কীর্তনাদ ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ"।

তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের মুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতময় বাণী মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে অতীব সুখপ্রদ, জীবের পাপনাশক এবং মহাফলদায়ক। তাঁর লীলাকথার পরম বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল এই যে কৃষ্ণরসের রসিক ভক্ত যতই এই রস পান করুক না কেন, এ রসের স্বাদ কখনও তার কাছে বিস্বাদ বলে বোধ হয় না; কখনও তার বোধ হয় না এই রস পান ক'রে সে পরিতৃপ্ত। পরন্তু এ রস যতই সে পান করে ততই সে এ রসের নূতন নূতন স্বাদ অনুভব করে, যতই পান করে ততই পুনঃ পুন আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা যায় বেড়ে—

ব্রহ্মান্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ।।
ভা ১০।৫২।২০

এ রস যে চির অমলিন, চিরনূতন।

ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই অর্থাৎ প্রথমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে কৃষ্ণনাম কীর্তনের এক বিশেষ গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যা বিশেষ ক'রে কৃষ্ণভক্তদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে যে জন্ম-মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ জীবকুল যদি অজ্ঞানে অবচেতন মনেও তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করে তাহলেও সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে। কৃষ্ণনামের এমনই প্রবল শক্তি যে স্বয়ং মূর্তিমান 'ভয়' তাঁর এই পরম পবিত্র নাম শুনে ভীত হয়ে পড়ে।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।।

এর গূঢ় অর্থ হল এই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নাম এই দুই এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। উভয়েই সমান শক্তিশালী। যে কৃষ্ণ ধরাধামে ধর্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতি ভয়ানক পাপীদের স্বহস্তে নিধন

করেছিলেন, তাঁর নামও অনুরূপ ভাবে একই কার্য সাধন করতে পারে। সুতরাং বিপন্ন মানুষের কল্যাণার্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু করতে পারেন, তাঁর চরণকমলে পরিপূর্ণ রূপে নিজেকে সমর্পণ ক'রে শুদ্ধ ভক্তিতে কেবলমাত্র তাঁর নাম কীর্তন ক'রলেই ভক্ত সেই একই ফল লাভ করতে পারে। কলিকালে কৃষ্ণনামের অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার।।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁর 'শিক্ষাষ্টকম্' উপদেশাবলিতে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি তাঁর নামের মধ্যে বিদ্যমান এবং এই জন্যই তাঁর অসংখ্য নাম এবং সেই সমস্ত নামের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি অর্পণ করেছেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" ইতি

শ্রীকৃষ্ণের নাম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়, ভয়ে, ভক্তিতে, ঘৃণায় যেভাবেই উচ্চারণ করা হোক না কেন তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এমনই তাঁর চারিত্রিক উদারতা ও সহিষ্ণুতা—

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।"
ভা ১১।২।৫৫

কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর টীকাভাষ্য শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলেছেন—

"পদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে শ্রীমহাদেবস্যৈব বাক্যে— তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পাবকাৎ ইতি। পূর্বম্ অত্র মোচকত্ব-প্রেমদত্বাভ্যাং তারকপারকসঙ্গে রামকৃষ্ণনাম্নোর্হি বিহিতে। তত্র চ রামনাম্নি মোচকত্বশক্তিরেবাধিকা। শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখতিরস্কারিপ্রেমানন্দ-দাতৃত্বশক্তিঃ সমধিকেতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের মথুরামাহাত্ম্য অধ্যায়ে রাম ও কৃষ্ণের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ক'রে মহাদেব বলেছেন যে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে মোক্ষলাভ হয়; আর শ্রীকৃষ্ণের মধুনাম কীর্তন

করলে উপলব্ধ হয় ভগবানের প্রতি পবিত্র প্রেম যার কাছে মোক্ষ অতীব অকিঞ্চিৎকর ব'লে প্রতীত হয়।

তাঁর নামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আদিপুরাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলেছেন—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।।
ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্।।
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ।।

—যারা শ্রদ্ধা বা হেলায় যে ভাবেই হোক আমার নাম জপ করে তারা সকলেই আমার হৃদয়েরে অভ্যন্তরে স্থান লাভ করে। (বাস্তবিকই আমার) নাম সদৃশ জ্ঞান, নাম সদৃশ ব্রত, নাম সদৃশ ধ্যান, নাম সদৃশ সুফল, নাম সদৃশ ত্যাগ, নাম সদৃশ শান্তি, নাম সদৃশ পুণ্য, নাম সদৃশ গতি আর নাই।

এছাড়াও তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর নামই পরম মুক্তি, নামই পরম গতি, নামই পরম শান্তি, নামই পরম স্থিতি, নামই পরম ভক্তি, নামই পরম মুক্তি, নামই পরম মতি, নামই পরম প্রীতি, নামই পরম স্মৃতি, নামই পরম জীবের কারণ, নামই প্রভু, নামই পরম আরাধ্য বিষয় এবং নামই পরম গুরু—

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ।।

বস্তুত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণের ভজনা করলেও যে ফলপ্রাপ্তি হয়, কৃষ্ণের নাম কীর্তন করলেও সেই একই

ফল হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এই দুইয়ের অভেদ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্বয়ং মহাপ্রভু স্বমুখে প্রচার করেছেন—

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ দুই ত সমান।।
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ।।
দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম স্বরূপ বিভেদ।।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ।।

এবিষয়ে ভারতবিভাগে বলা হয়েছে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।

—কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, চৈতন্যময় রসমূর্তি, পূর্ণ ও শুদ্ধ। এই নাম ও নামধারীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

কৃষ্ণনামের এমনই মাহাত্ম্য যে এই নাম যে কেবল কীর্তনকারীরই আত্মিক উন্নতি সাধন করে তাই নয়। সুবাসিত পুষ্পের সৌরভ যেমন কেবল তার আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেই পুষ্পকে বিধৌত ক'রে মলয়পবন যেদিকে যতদূর সঞ্চালিত হয় ততদূর পর্যন্ত সেই পুষ্পসৌরভ সকলকে আমোদিত করে, ঠিক তেমনই বক্তার মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনামের পবিত্র ধ্বনি সমগ্র পরিবেশকে পবিত্র করে। এবিষয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ের বিংশ অধ্যায়ের তেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে নারদ বলেছেন—

নচৈকমেব বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি।।

অর্থাৎ হরিনাম-কীর্তনে মগ্ন বিষ্ণুভক্ত মানুষগণের জিহ্বা যে কেবলমাত্র বক্তাকেই রক্ষা করে তাই নয়, সেই বৈষ্ণবী রসনা হরি গুণগান শুনিয়ে এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের পবিত্রতা বিধান করে—

আবার এই গ্রন্থের এই একই অধ্যায়ের আটষট্টি সংখ্যক শ্লোকে নারদ পুনরায় বলেছেন—

বহ্ধোৎসার্য্যতে হর্ষাদ্বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।।

অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করার সময় কেবলমাত্র যে তাঁরই মুক্তির পথ প্রশস্ত করেন তাই নয়, নৃত্যের সময় নানাপ্রকারে যথাক্রমে পদযুগল দ্বারা পৃথিবীর, নেত্রযুগল দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের এবং বাহুদ্বয় দ্বারা স্বর্গের অমঙ্গল বিনাশ করে থাকেন।।

শ্রীকৃষ্ণনামের যে কত মহিমা তা আমরা রাজা উত্তানপাদপুত্র ধ্রুবের সঙ্গে যক্ষগণের ঘোর সংগ্রামকালে মুনিগণের মুখে শুনতে পাই। ধ্রুবের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধকালে যক্ষগণ ধ্রুবকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে মায়াজাল বিস্তার করেছে জানতে পেরে মুনিগণ তার মঙ্গল কামনা করতে এসে ক্লেশনাশন ভগবান সার্ঙ্গধন্বা নারায়ণ তাঁর শত্রুদের সংহার করুন এই কামনা ক'রে তাঁকে বললেন—

ঔত্তানপাদে ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্তিহরো বিপক্ষান্
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য চাদ্ধা
লোকোঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুম্।।
(ভা ৪।১০।৩০)

অর্থাৎ কৃষ্ণনামের এমনই মহিমা যে কেবলমাত্র তা শ্রবণ বা কীর্তণ করলেই মানুষ অনায়াসে ভয়ানক মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

এখানে শ্রীহরি একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীহরির করুণা পেতে গেলে তাঁকে যে সশরীরে পেতে হবে তার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীতে তাঁর অগণিত ভক্তদের রক্ষাকর্তা হিসাবে বিরাজ করবে তাঁর নামসমূহ যাদের প্রত্যেকটিই তাঁর নিজের মতই সমক্ষমতা সম্পন্ন। একদিন তো কর্ম অবসানে তাঁকে ফিরে যেতে হবে তাঁর স্বধাম গোলোকধামে। তখন তো কেউ তাঁকে সরাসরি পাবে না পুত্ররূপে, সখারূপে, সহচররূপে, রক্ষকরূপে, পালকরূপে! তখন কি হবে তাঁর ভক্তদের? তারা কি সব অনাথ হয়ে যাবে? ভগবানের বারতা হল—না। ভক্তের এধরনের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তিনি কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হবেন ঠিকই, কিন্তু ভক্তদের পরিত্রাতা হিসাবে

মর্ত্যভূমে রেখে যাবেন তাঁর অগণিত নাম—গোপাল, কৃষ্ণ, শ্রীহরি, জনার্দন, মধুসূদন, মাধব ইত্যাদি। এই নামগুলি এই বিশ্ব চরাচরের আকাশে, বাতাসে, পর্বতে, অন্দরে, কন্দরে, জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, অনলে, অনিলে, গ্রামে, গঞ্জে, বিরাজ করবে একেকটি নামরূপী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হিসাবে আর প্রকৃত ভক্তের আন্তরিক নিঃস্বার্থ ভক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভক্তের উদ্ধারে কৃষ্ণমূর্তির প্রতীক হিসাবে ধেয়ে আসবে ভক্তের সান্নিধ্যে। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকে চর্মচক্ষে না দেখতে পেলেও ভক্তের আক্ষেপের কোন কারণ নেই। তিনি তো নামরূপে অণুক্ষণ বিরাজ করছেন ভক্তের জিহ্বা ও শ্রবণমূলে। কাজেই অহর্নিশ প্রকৃত ভক্তিভরে তাঁর নাম ভজন ও শ্রবণ করলেই ভক্ত নিয়ত পাবে তাঁর অভয়াশ্রয়।

এই সমস্ত কারণেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভূ শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্তনের উপর প্রগাঢ় গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন মানবের অন্তরে বহু বৎসরের পুঞ্জীভূত মালিন্যকে ধৌত ক'রে তাকে পবিত্র ক'রে তোলে এবং মানবকে যুগযুগান্তর প্রবাহী জন্ম-মৃত্যুর কালচক্র থেকে মুক্ত করে। তাঁর ভাষায়—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।

এই শ্লোকের মর্মার্থ ব্যাখ্যা ক'রে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর বঙ্গানুবাদ ক'রে বলেছেন—

সংকীর্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদগম।।
কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমূদ্রে মজ্জন।।

নামসঙ্কীর্তনের অপার মহিমা ও গুরুত্ব সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্যত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা বিবৃত করেছেন তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হল—

"এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।।
আর তিন যুগাদিকে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়।।"
"নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস।।"

এখানে উল্লেখ্য যে বিভিন্ন শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য ও সুফল বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণাদি অসংখ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণনাম মানুষকে পাপ হতে মুক্তি দেয়। কিন্তু কিভাবে? বিষয়টি এমন নয় যে, যে যতকিছু পাপ করে যাবে এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ক'রে সেই পাপের হাত থেকে পপ্রিত্রাণ পাবে। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে ক্রমাগত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে থাকলে মানুষের অন্তরে একটি মানসিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। ক্রমশ তার অন্তরে তমোগুণের অবসান ঘ'টে স্বত্ত্বগুণের উন্মেষ ঘটে। ফলে ধীরে ধীরে তার মন থেকে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার বাসনার অবলুপ্তি ঘটে। এই কারণে তার মনে অজান্তেও পাপবৃত্তি জাগরিত হলে কৃষ্ণনামের ফলে অর্জিত স্বত্ত্বগুণের প্রভাবে এই সুপ্ত পাপমতিকে সে পরাস্ত ক'রে তার থেকে দূরে থাকতে পারে। তাই বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ।।

অহর্নিশ কৃষ্ণনাম স্মরণ ও কীর্তনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর হতে উদ্বেগ, অস্থিরতা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়ে অন্তরে বিরাজ করে নিবিড় প্রশান্তি। ফলে কৃষ্ণনাম মানসিক ঔষধ স্বরূপ।

স্কন্দপুরাণে এই কথাই বলা হয়েছে—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্।।

মানুষের সমস্ত দুঃখের মূলে আছে তার অনন্ত ভোগলিপ্সা। মানুষ যতই ভোগ করতে থাকে, ততই তার ভোগের বাসনা বর্ধিত হয়। বায়ুপ্রয়োগে

যেমন অগ্নিতেজ প্রশমিত করা যায় না, তদ্রূপ ভোগের দ্বারা ভোগলালসার নিবৃত্তি করা যায় না। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে যদি কৃষ্ণনামের অধিষ্ঠান হয় তাহলে তা মানুষের অন্তরে উদিত সূর্যের ন্যায় অবস্থান ক'রে অন্তরের সর্বপ্রকার তমসা দূর ক'রে হৃদয়ে সত্য ও জ্ঞানের আলোক প্রজ্জলিত করে এবং দুর্নিবার ঝটিকা সম অজ্ঞানতা ও দুঃখরাশির মেঘপুঞ্জকে হৃদয়ের প্রকোষ্ঠ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে—

সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ।

—"যদি দেশ, কাল ও বস্তুর কথা না ভেবে অপরিচ্ছিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা, নাম ও গুণ আদির সংকীর্তন করা হয় অথবা তাঁর প্রভাব, মহিমা আদি শ্রবণ করা হয় তাহলে স্বয়ং শ্রীভগবান তখন তার হৃদিমন্দিরে বিরাজমান হন ও শ্রবণ-সঙ্কীর্তনকারী ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ হরণ করে নেন। এর তুলনা কেবল সূর্যের অন্ধকার বিনাশন অথবা ঝোড়ো হাওয়ার মেঘমালাকে বিপর্যস্ত করে তোলার সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।" (ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কৃত অনুবাদ)

লঘুভাগবতে কথিত হয়েছে যে যাঁরা আনন্দের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে সদা 'গোবিন্দ' এই নাম কীর্তন করেন সেই সমস্ত পবিত্র মহান আত্মাগণ সর্বজীবের পার্থিব আধার এই পথিবীর সমস্ত শুদ্ধ ও পবিত্র বৈশিষ্ট্যকে আপনার মধ্যে ধারণ করে থাকেন—

গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্ত্তয়েদ-যস্ত্বনন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা।।

কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে যে এই ভূমণ্ডলে যত কোটি কোটি পবিত্র বিষয় আছে, শ্রীকৃষ্ণনামানুকীর্তনের সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয় না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও কীর্তন এই পৃথিবীতে পবিত্রতম বিষয় যা সকলেরই পালন করা বিধেয়—

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুল্যাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে।।

মায়ার প্রভাবে মানুষ লোভ লালসা হিংসা প্রভৃতি আচরণ করে। মায়ার লেলিহান অগ্নিশিখা নিরন্তর মানুষের অন্তরের সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দগ্ধ ক'রে তাকে নিরন্তর চালিত করে সীমাহীন ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার পথে। কিন্তু কৃষ্ণনামে ডুবে গেলে সে এই সব রিপুকে অনায়াসে পরাভূত করতে পারে। তখন সে পাপ-কর্ম আচরণের প্রবৃত্তিকে পরাভূত ক'রে মায়ার কবল ছিন্ন করতে পারে। ফলে তার চিত্তবৃত্তির উন্নতি হয়। পদ্মপুরাণের দেবাহুতি স্তুতিতে বলা হয়েছে—

মোহানলোল্লসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্বদা।
যন্নামাম্ভোধরোচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে।।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পবিত্র কৃষ্ণনামের মেঘচ্ছায়াতলে অবস্থান করে, তাকে মায়ার সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখা দহন করতে পারে না।

বস্তুত মানুষ পুণ্যের আশায় বহু পরিশ্রম করে দূর-দূরান্তে তীর্থভ্রমণে গমন করে। এর দ্বারা তার চর্মচক্ষু পরিতৃপ্ত হয় ঠিকই, কিন্তু অন্তরে শুদ্ধভক্তি অনুপস্থিত থাকলে এই ভ্রমণ তার পুণ্যার্জনের সহায়ক হয় না। তাই পুণ্যার্জনই যদি তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অত দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন হয় না। হরিনাম উচ্চারণেই তার সমস্ত পূর্ণ্যার্জন হতে পারে। স্কন্দপুরাণে এই কথাই বিবৃত হয়েছে—

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতি যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।

অর্থাৎ কি প্রয়োজন কুরুক্ষেত্র ভ্রমণের, কি প্রয়োজন পুষ্কর ভ্রমণের, কি প্রয়োজন কাশী ভ্রমণের যদি জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করে দুই অক্ষরবিশিষ্ট 'হরি' এই নাম?

একটি প্রখ্যাত শ্যামা সঙ্গীতে এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

কাজ কি আমার তীর্থে গিয়ে
ঘুরবো কেন গয়া-কাশী

আমার হৃদ্পদ্মে আলো ক'রে
দাঁড়িয়ে আছেন এলোকেশী।

বিশ্বামিতক্রসংহিতয় এই কথা বলা হয়েছে—

বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ।।

অর্থাৎ বহু তীর্থ ভ্রমণের পুণ্যফল পবিত্র হরিনাম উচ্চারণের ফলে অর্জিত পুণ্যফলের কোটি অংশের সমতুল্য নয়।

এ প্রসঙ্গে লঘু ভাগবতে বলা হয়েছে—

কিং তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈস্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রত।।

—হে বৎস! কেন তুমি অত পরিশ্রম ক'রে বেদ, অগমাদি অগণিত শাস্ত্র পাঠ করছো? কেন তুমি প্রভূত শ্রমসাধ্য তীর্থসমূহ ভ্রমণ করছো? যদি তুমি মোক্ষলাভের প্রত্যাশী হও তাহলে তুমি কেবলমাত্র 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' এই পরম পবিত্র নাম কীর্তন করো।

বিষ্ণুধর্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রহ্লাদ বলেন—

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।।

—যে ব্যক্তি দুই অক্ষরবিশিষ্ট 'হরি' নাম কীর্তন করে সে ইতিমধ্যে ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব এই বেদ চতুষ্টয় পাঠ সমাপ্ত করেছেন।

অনেক পুণ্যকামী ব্যক্তি আছেন যাঁরা দান-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ, মন্দির নির্মাণাদি বিভিন্ন সৎ কর্ম করেন। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের নৈকট্য পাবার জন্য এইসব ক্রিয়াদি নিষ্প্রয়োজন। আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ ভক্তিসহকারে কৃষ্ণের নাম-কীর্তন করলেই এতদপেক্ষা বহুগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ।।

অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠ কর্ম সম্পাদন অপেক্ষা কৃষ্ণের পবিত্র নাম-কীর্তন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যগ্রহণ কালে এক কোটি গোদান, এক কল্পকাল ব্যাপী প্রয়াগের

পবিত্র গঙ্গাজলে অবগাহন, দশ সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন এবং মেরু পর্বতের সমান উচ্চ সুবর্ণ দান প্রভৃতি কর্ম সমূহের সুফল গোবিন্দের পবিত্র নামোচ্চারণের সুফলের শত শতাংশের এক অংশের সমতুল্য নয়।

বৌধায়নসংহিতাতে পাই—

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূণি কৃতান্যপি।
ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্।

অর্থাৎ অনেকভাবে ধর্মনিষ্ঠ কর্ম সম্পাদন করলেও তার ফল পুনর্জন্ম-চক্রের অবশ্যম্ভাবিতা রোধ করতে পারে না। কিন্তু শ্রীহরির পবিত্র নাম আনয়ন করে জন্মচক্রের হাত থেকে চিরমুক্তি।

গড়ুরপুরাণে দেখি শ্রীশৌনক মুনি রাজা অম্বরীষকে বলছেন—

বাজপেয় সহস্রাণাং নিত্যং ফলম্ অভিপ্সসি
প্রাতরুত্থায় ভুপাল কুরু গোবিন্দ কীর্তনম্।

—হে রাজন্! আপনি যদি এক সহস্র বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সুফল অর্জন করতে অভিলাষ করেন তাহলে আপনি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয়ন পরিত্যাগ করে উঠুন এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দের পবিত্র নাম-কীর্তন করুন।

অনুরূপভাবে আমরা দেখি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের তেত্রিশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে দেবাহুতি ভগবান কপিলদেবকে বলছেন—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সম্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।

—আহা! যার জিহ্বাগ্রে তোমার পবিত্র নাম অধিষ্ঠিত থাকে সে যদি চণ্ডালও হয় তথাপি সে পরম পূজ্য। যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তোমার নাম-কীর্তন করে সে তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থস্নান, সদাচার পালন এবং বেদপাঠ প্রভৃতি সকল কিছুরই অভীষ্ট ফললাভ করেছে।

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত হয়েছে—

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ।।

—যে সমস্ত স্ত্রীলোক, শুদ্র, বর্বর, পাপযোনিজাতরা শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করে আমি তাদের পুনঃপুন প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—

স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ।।

—হে হৃষীকেশ! আপনার নাম কীর্তনে সমস্ত জগত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। রাক্ষসগণ আপনার নাম শ্রবণে পরম ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধপুরুষগণ আপনাকে প্রণতি জানায়।

ইতিহাসোত্তমে বলা হয়েছে যে ঘোর পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে সকল মানুষ তাদের অতীব পাপাচরণের ফলে পাপের দণ্ডস্বরূপ ঘোর নরকে পচে মরে অর্থাৎ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে তাদের সেই পাপ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হল অহর্নিশ শ্রীহরির নামসঙ্কীর্তনে মগ্ন থাকা। এটা যথোপযুক্তভাবে করতে পারলেই সে সেই নরকযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবে—

নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্।
মুক্তিঃ সঞ্জায়তে তস্মান্নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ।।

কলিযুগে কৃষ্ণনামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৃহন্নারদীয়পুরাণের আটত্রিশ অধ্যায়ের একশত ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিনামপরায়ণাঃ।
সমস্তপাপ নির্মুক্তা যাস্যন্তি পরমা গতিম্।।

বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে বলা হয়েছে যে কলিযুগে কৃষ্ণনামই একমাত্র সম্বল। বিগত তিন যুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির মাধ্যমে যা যা ফললাভ হয়েছে তার সবই কলিযুগে কেবল কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে—

ধ্যায়ন কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্।।

—সত্য যুগে ধ্যানের মাধ্যমে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণকমলদ্বয়ের অর্চনার মাধ্যমে যা কিছু ফললাভ হয়েছে তার সবই কলিযুগে তাঁর নামকীর্তন ও তাঁর কাছে আন্তরিক আত্মনিবেদনের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের বাহান্ন সংখ্যক শ্লোকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় প্রায় একই কথা বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধহরিকীর্তনাৎ।।

—"যা সত্যযুগে শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় বিশাল যজ্ঞদ্বারা তাঁর আরাধনায় যুক্ত থেকে এবং দ্বাপরে বিধিপূর্বক তাঁর সেবা ও পূজা করে অর্জন করা যায় তা কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তনেই লাভ হয়ে যায়।" (গীতা প্রেস কৃত অনুবাদ)

তিনি অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের পরম শান্তির নির্ভয় আশ্রয়, সীমাহীন উত্তপ্ত মরুভূমি-বক্ষে তিনি ছায়াশীতল মরূদ্যান, দিগন্ত বিহীন মহাসমুদ্র বক্ষে ভাসমান ডুবন্ত মৃতপ্রায় মানুষের নিকট তিনি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড। আশ্রয়প্রার্থীর তাঁর নিকট নিরাশ হবার কারণ নেই। তিনি সর্বাশ্রয়, জগন্নিবাস। আশ্রয় প্রার্থনা করলে অধার্মিক, পাপী-তাপী সকলকেই তিনি আশ্রয়দান করে থাকেন। পদ্মপুরাণে 'বৃহৎসহস্রনামকথারম্ভে' বলা হয়েছে—

অনন্য গতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তাপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ববর্ধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ।

—যারা শ্রেয়োবাদী, যারা অপরের পক্ষে পীড়াদায়ক, জ্ঞানহীন, বৈরাগ্য, রহিত আত্মসুখী, ব্রহ্মচর্যহীন, ধর্মজ্ঞানহীন, এক কথায় সমস্ত রকম চারিত্রিক সত্ত্বগুণবিহীন তারা নিরাশ্রয় হলে যদি একবার মাত্র হৃদয় উজাড় ক'রে সমস্ত নিষ্ঠা, ভক্তি, কপটতা পরিত্যাগ ক'রে আন্তরিক সমর্পণের সঙ্গে তাঁর নাম-

কীর্তন করতে পারে তাহলে তারা তাঁর পরম আধ্যাত্মিক লোকে আশ্রয় লাভ করে যেখানে সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিরাও প্রবেশ করতে পারে না।

পার্থিব জগতের বৈষয়িক বিষয়গুলি বিষস্বরূপ। সেগুলি কেবলই মানুষকে অজ্ঞানতা ও অনন্ত দুঃখভোগের গহ্বরের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয়গুলি যদি হরিকে সমর্পণ করা যায় তাহলে সেই সমস্তই অমৃতরূপে পরিগণিত হয়। এমনই হরির করুণা। সেইজন্য মুমুক্ষু মানুষের কাছে হরি ব্যতীত আর কোন আরাধ্য দেবতা নেই। হরিভক্তিসুধোদয়ে দেবর্ষি নারদ জগজ্জীবের উদ্দেশ্যে এই কথাটিই প্রচারিত করেছেন—

বিষত্বেনৈব বিষয়াঃ খ্যাতা অপি যদর্পণাৎ।
ত এবামৃততাং যাতাঃ কোঽন্যঃ সেব্যো হরের্নৃণাং।।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছেচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে অজামিল প্রসঙ্গে কৃষ্ণনামকীর্তনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীশুকদেব বলেন—

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা।।

অর্থাৎ অসার এই সংসারের ঘোর বন্ধন থেকে যারা মুক্তিলাভ করতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে তীর্থপদ পরম পবিত্র শ্রীভগবানের নামকীর্তনের চাইতে অপর কোন উন্নততর সাধন নেই কারণ কৃষ্ণনামের শরণ গ্রহণ করলে তার অন্তর আর কর্মবন্ধনের প্রতি আসক্ত হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত আছে তাদের দ্বারা অন্তর হতে রজঃ ও তমগুণের প্রভাবে উৎপন্ন মালিন্য সমূলে উৎপাটিত হয় না। তাই অন্তর থেকে সমস্ত পাপরাশিকে চিরকালের জন্য সমূলে উচ্ছেদ করতে হলে নিরন্তর কৃষ্ণনামের ভজন-কীর্তন করে যেতে হবে যাতে অন্তরে কোথাও পাপের একটি বীজও অবশিষ্ট থেকে গেলে তা যেন কখনও অঙ্কুরিত হতে না পারে।

হরিভক্তিসুধোদয়ের একাদশ অধ্যায়ের বাহান্ন সংখ্যক শ্লোকে প্রহ্লাদের উক্তিতে শোনা যায়—"অসারসংসারতরোরপীদং কৃষ্ণার্চ্চনং সৎফলমেকমস্তি।"

অর্থাৎ এই সংসার তো একটি অসার বৃক্ষস্বরূপ। এখানকার সমস্তকিছুই ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখদায়ী। এই বৃক্ষে কোন সু-ভোগ্য ফল ধরে না। তবে এই বৃক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ফল ধরে এবং তা হল শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা। বস্তুত এই সংসারই হল কৃষ্ণপূজার একমাত্র উৎকৃষ্ট স্থান।

কৃষ্ণকে যেমন তাঁর নামকীর্তনের মধ্যদিয়ে লাভ করা যায়, তেমনি তাঁকে নিবিষ্টচিত্তে নির্জনে একাকী জগত সংসার বিস্মৃত হয়ে ধ্যানযোগের মাধ্যমেও পাওয়া যায়। কিন্তু ধ্যানযোগের পথ বিশেষ করে সংসারী মানুষদের পক্ষে অতীব কঠিন। সে পথ বড় কৃচ্ছ্রসাধনের। বিস্তর দুঃখ, বিস্তর বেদনা সহ্য ক'রে অনেক আত্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তবে এই পথে ঈপ্সিত ফললাভ হয়। তাই সকল ভক্তের পক্ষে এ পথ সুগম নয়। কিন্তু তাহলে উপায়? সাধারণ ভক্তের কি তাহলে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ অধরা থেকে যাবে? এখানে কৃষ্ণ সকলকে বলছেন—মাভৈঃ। ভীত হয়ো না। পথ আছে। কৃষ্ণের হৃদয় যে কুসুমের মত কোমল। নবনীতের ন্যায় মসৃণ। তাই তিনি ভক্তের অসুবিধার কথা সম্যকরূপে অবগত। তাই তিনি সমগ্র ভক্তবৃন্দের প্রতি মাভৈ দিয়ে বলেছেন যে ভক্তিভরে তাঁর নামকীর্তন করলেই তিনি ধরা দেন ভক্তদের কাছে। একারণে বৈষ্ণবচিন্তামণিতে দেবাদিদেব মহাদেবকে উমার প্রতি বলতে শুনি—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে
ঔষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।

—শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করে তাঁকে লাভ করতে হলে অনেক ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র অধরোষ্ঠ স্পন্দনের মাধ্যমে তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই তিনি প্রসন্ন হন। কারণ আয়াসসাধ্য ধ্যানের চাইতে তিনি তাঁর নাম-কীর্তনেই অধিকতর আকৃষ্ট হন।

সদা সর্বদা কিভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যাবে সে বিষয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ের বিংশ অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে ভক্তদের প্রতি অতীব সুন্দর এবং খুবই কার্যকরী উপদেশ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভক্ত যদি সঙ্গীত প্রিয় হয় তাহলে বিষ্ণুবিষয়ক সঙ্গীত করবে, যদি সে কথা শুনতে

বা বলতে ভালবাসে তাহলে সে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করবে এবং শ্রীহরির কথা বলবে—

চেতো গীতপ্রিয়ঞ্চেতদ্বিষ্ণুগীতে সমর্পয়েৎ।
কথায়াঞ্চেৎ কথাঞ্চিত্রাং শৃণুয়াৎ কথয়েদ্ধরেঃ।।

আর পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে যে মন যদি রূপ ভালবাসে তাহলে নারায়ণের সুন্দররূপে সুসজ্জিত কোমল প্রতিমা সকল যতখুশী দর্শন করে মনরসনার পরিতৃপ্তি ঘটাবে—

রূপার্থি চেত্তু তস্যৈব প্রতিমাশ্চিত্রকোমলাঃ।
পশ্যেৎ স্বলঙ্কৃতাস্তত্র রমতে যদ্‌যথেচ্ছয়া।।৫।।

এই সমস্ত প্রমাণ থেকে খুব সহজেই অনুমেয় কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁর নামের উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যোড়শ তরঙ্গ

গোস্বামী তুলসীদাসজী তাঁর 'শ্রীরামচরিতমানস' গ্রন্থে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। নামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থের সঙ্গে তিনিও এক বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যে নাম ও নামী অভিন্ন। ভাগবত সহ সমস্ত পুরাণে প্রচার করা হয়েছে যে কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের মধ্যে গুরুত্ব বা অবস্থানগত কোন প্রভেদ নেই। বলা হয়েছে কৃষ্ণের যা ক্ষমতা, তাঁর নামেরও সেই একই ক্ষমতা। কিন্তু তুলসীদাস তাঁর গ্রন্থে নাম ও নামীর মধ্যে বৃহত্তর অর্থে একটি খুব সূক্ষ্ম ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে নাম ও নামী উভয়েই তুল্য-মূল্য হলেও নামী অপেক্ষা নামের ওজন কিঞ্চিৎ বেশী। নাম যেন প্রভু এবং নামী যেন তার সেবক—

সমুঝত সরিস নাম অরু নামী।
প্রীতি পরসপর প্রভু অনুগামী।।

—নাম ও নামী এক এবং অভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে সেব্য-সেবকরূপ সম্পর্ক বর্তমান। সেবক যেমন সেব্যের সর্বদা অনুগমন করে, নামীও তেমনই সর্বদা প্রীতি সহকারে নামের অনুগমন করে।

বিষয়টি স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে কেউ যদি রামের নাম স্মরণ করে তাহলে রাম তার নামের পিছনে পিছনে সেখানে উপস্থিত হন। অর্থাৎ নামের পশ্চাতে রাম ছোটেন, কিন্তু রামের পশ্চাতে নাম ছোটে একথা বলা যাবে না।

তাঁর মতে নাম যে নামী অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ সেই বিষয়টি তিনি অপর একটি চৌপাইতে পরিস্ফুট করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন বস্তুত নামের মাধ্যমেই মানুষ নামীর পরিচয় এবং ধারণা লাভ করে। কোন বস্তুর নাম যদি মানুষ না জানে তাহলে সেই বস্তুটি তার হাতে থাকলেও সে বস্তুটির স্বরূপ সম্পর্কে কোন ধারণা ব্যক্ত করতে পারে না। অপর পক্ষে যদি তার কোন বস্তুর নাম জানা থাকে তাহলে সেই বস্তুটি তার সামনে না থাকলেও সে সেই নামটি শ্রবণ করা মাত্রই বস্তুটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ব্যক্ত করতে পারে—

রূপ বিসেষ নাম বিনু জানেঁ।
করতল গত ন পরহিঁ পহিচানেঁ।।

তুলসীদাসের দৃষ্টিতে নামী অপেক্ষা নামের গুণগত মান বেশী। নাম যেন নামী অপেক্ষা চতুরতর। ঈশ্বর তো দুই ধারণায় বিভক্ত—নিরাকার ও সাকার। এই নিরাকার ও সাকার ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে নাম সেতু হিসাবে অবস্থান করে। দুর্জ্ঞেয় নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে সাকার ব্রহ্মের নাম দোভাষীর মত কাজ করে। দোভাষী না থাকলে যেমন অপরিচিত ভাষা-ভাষী ব্যক্তির সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়, তেমনি সাকার ব্রহ্মের নামের মাধ্যমে নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সেকারণে তাঁর মতে নামী অপেক্ষা নামের ভূমিকা বেশী—

নাম রূপ গতি অকথ কহানী।
সমুঝত সুখদ ন পরতি বখানী।।
অগুন সগুন বিচ নাম সুসাখী।
উভয় প্রবোধক চতুর দুভাষী।।

তুলসীদাসের মতে নাম যেন মণিময় প্রদীপ এবং জিহ্বা যেন মুখদ্বারের চৌকাঠ। গৃহস্থ যেমন চৌকাঠের উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর এবং বাহির উভয় স্থানকেই আলোকিত করতে সক্ষম হয়, তেমনই ভক্ত নামরূপ মণিময় প্রদীপকে মুখদ্বারের চৌকাঠ জিহ্বাগ্রে স্থাপন করলেই তার আন্তর-বাহির উভয় স্থানই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে—

রাম নাম মনিদীপ ধরু জীব দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ জৌঁ চাহসি উজিআর।।

ব্রহ্মের দুই রূপ—নির্গুণ ও সগুণ। উভয়ের লীলাই অসীম, অনাদি, অনুপম। কিন্তু তুলসীদাসের মতে নামের স্থান দুই ব্রহ্মের উপরে কারণ নামই তাদের বশে রাখে অর্থাৎ নামের সাহায্যেই তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা যায়—

অগুন সগুন দুই ব্রহ্ম সরূপা। অকথ অগাধ অনাদি অনূপা।।
মোরেঁ মত বড় নামু দুহূ তেঁ। কিএ জেহিঁ জুগ নিজ বস নিজ বূতেঁ।।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন হলেও উভয়কে জ্ঞাত হওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু নাম জপ করলে উভয়কে জানা সহজ হয়ে যায়। তাই তুলসীদাস মনে করেন 'রাম' নাম নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ শ্রীরামের চাইতে বড়—

উভয় অগম যুগ সুগম নাম তেঁ
কহেউঁ নামু বড় ব্রহ্ম রাম তেঁ।।

সংকটকালে নাম জপ করলে সমস্ত সংকটের অবসান হয় এবং নাম জপকারী সুখ লাভ করে—

জপহি নামু জল আরত ভারী।
মিটহীঁ কুসংকট হোহিঁ সুখারী।।

তুলসীদাস মনে করেন যে নির্গুণের চাইতে নামের প্রভাব অনেক বেশী। সেই কারণে তিনি তাঁর সমস্ত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই সিদ্ধানেত উপনীত হয়েছে যে নাম সগুণ শ্রীরাম অপেক্ষা বড়—

নিরগুন তেঁ এহি ভাঁতি বড় নাম প্রভাউ অপার।
কহউঁ নামু বড় রাম তেঁ নিজ বিচার অনুসার।।

তাঁর মতে নাম যে নামীর চাইতে বড়, নামের ক্ষমতা যে নামীর চাইতে বেশী তার সমর্থনে তিনি কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন যেগুলি অকাট্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত, তিনি বলেছেন যে ভক্তদের কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে নরদেহ ধারণ করে মর্তভূমিতে অবতরণ করতে হয়েছিল এবং সাধুদের সুখী করবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু ভক্ত প্রেমভক্তি সহকারে নিত্য তাঁর নাম জপ করলে অনায়াসে অক্লেশে সমস্ত সুখ ও কল্যাণ আয়ত্ত করতে পারে—

রাম ভগত হিত নর তনু ধারী।
সহি সঙ্কট কিএ সাধু সুখারী।।
নামু সপ্রেম জপত অনায়াসা।
ভগত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা।।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন যে সগুণ ব্রহ্ম প্রভু শ্রীরাম তো সারাজীবনে

মাত্র একজন নারী অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম অনুক্ষণ অসংখ্য পাপী-তাপীকে উদ্ধার ক'রে চলেছে—

রাম এক তাপস তিয় তারী।
নাম কোটি খল কুমতি সুধারী।।

তৃতীয়ত, রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞ রক্ষার জন্য একজন সুকেতু-যক্ষকন্যা তাড়কাকে সৈন্য ও পুত্র সুবাহু সহ নিহত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম তো সদা সূর্য যেমন রাত্রিকে নাশ করে থাকে তেমন ভাবেই অসংখ্য ভক্তের পাপ-তাপ, দুঃখ-দুরাশাকে বিনাশ করে থাকে—

রিষি হিত রাম সুকেতুসুতা কী।
সহিত সেন সুত কীনিহ বিবাকী।।
সহিত দোষ দুখ দাস দুরাসা।
দলই নামু জিনি রবি নিসি নাসা।।

প্রভু শ্রীরামকে স্বয়ং গিয়ে স্বহস্তে হরধনু ভঙ্গ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর নামের এমনই প্রতাপ যে তা কেবলমাত্র জপ করলেই জগতের সব ভয় নাশ হয়ে যায়—

ভঞ্জেউ রাম আপু ভব চাপূ।
ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপূ।।

প্রভু শ্রীরামের উপস্থিতি কেবলমাত্র ভয়ানক দণ্ডক অরণ্যকে আলোকিত করে তুলেছিল। কিন্তু তাঁর নাম অহরহ অগণিত পাপী-তাপীর অন্তর থেকে দুরপনেয় পাপের অন্ধকার দূর করে তাকে পবিত্র, উজ্জ্বল করে চলেছে—

দণ্ডক বনু প্রভু কীনহ সুহাবন।
জন মন অমিত নাম কিএ পাবন।।

শ্রীরঘুনাথ তো কিছু নিশাচর রাক্ষসদের বধ করেছিলেন কিন্তু তাঁর নামরূপ অসি কলিযুগের সমস্ত কলুষতাকে সমূলে বিনাশ করে—

নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন।
নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন।।

শ্রীরঘুনাথ তো শবরী, জটায়ু প্রভৃতি উত্তম ভক্তদের মুক্তি প্রদান করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর নাম-জপ তো অবিরাম দুষ্টদের পাপমুক্ত করে উদ্ধার করে চলেছে। তাঁর নাম জপের মাহাত্ম্যের কথা বেদেও উল্লেখ আছে—

সবরী গীধ সুসেবকনি সুগতি দীনিহ রঘুনাথ।
নামুধারে অমিত খল বেদ বিদিত গুন গাথ।।

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণ—এই দুই সেবককে উদ্ধার করে শরণাগতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম অজস্র দীনহীনকে উদ্ধার করে সেই নামামৃতের চন্দ্রাতপের তলায় সকলকে পরমাশ্রয় দিয়ে চলেছে—

রাম সুকণ্ঠ বিভীষণ দোউ।
রাখে সরন জান সবু কোউ।।
নাম গরীব অনেক নেবাজে।
লোক বেদ বর বিরিদ বিরাজে।।

শ্রীরামচন্দ্রকে অশেষ কষ্ট করে ঋক্ষ ও বানরদের সাহায্যে সেতু বন্ধন ক'রে তবে সমুদ্র অতিক্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁর নাম জপ করলেই দুস্তর ভবসিন্ধু শুকিয়ে যায়—

রাম ভালু কপি কটকু বটোরা।
সেতু হেতু শ্রমু কীনহ ন থোরা।।
নামু লেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ।
করহু বিচারু সুজন মন মাহীঁ।।

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে সীতামাতাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা নগরী প্রবেশ করার জন্য রাবণের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভক্তগণ কেবল প্রেম সহযোগে তাঁর নাম জপ করেই অনায়াসে বিনাশ্রমে প্রবল মোহরূপ অরিদলকে পরাভূত করে ঈপ্সিত পরমধামে প্রবেশ করতে পারে—

রাম সকুল রন রাবনু মারা।
সীয় সহিত নিজ পুর পগু ধারা।।
রাজা রামু অবধ রজধানী।
গাবত গুন সুর মুনি বর বানী।।
সেবক সুমিরত নামু সপ্রীতী।

বিনু শ্রম প্রবল মোহ দলু জীতী।।
ফিরত সনেহঁ মগন সুখ অপনেঁ।
নাম প্রসাদ সোচ নহিঁ সপনেঁ।।

এই সমস্ত দিক বিচার ক'রে তুলসীদাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে—"ব্রহ্ম রাম তেঁ নামু বড় বর দায়ক বর দানি" অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ রাম উভয়ের থেকে নাম বড়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে ভগবানের নাম-নামীর সম্বন্ধের ধারণার বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ ও তুলসীদাসের উপলব্ধির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে।

সপ্তদশ তরঙ্গ

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের ভজন-পূজন-নামসঙ্কীর্তন এক বিশেষ তাৎপর্য, মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বহন করে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মানুষের জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সমাজের গরিষ্ঠ মানুষের জীবন সততা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, ধর্মবোধ (ধর্মান্ধতা নয়), চারিত্রিক শুচিতা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণের সৌরভে সুরভিত ছিল। তাই তাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য আকুলিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই ত্রিযুগের অবসানে মানুষের জীবনে এক বিরাট ছন্দপতন ঘটলো। যুগযুগান্তলালিত মানুষের শুদ্ধচিত্ত সহসা অশৌচের কালিমালিপ্ত হয়ে পরিণত হল এক পূতিগন্ধময় নরককুণ্ডে যার সর্বদিকে পরিদৃশ্যমান অগণিত পাপসর্গের লেলিহান যুগলজিহ্বা। মানুষের এই অশুভ প্রবৃত্তি ভূমণ্ডলে পরিচিত হল 'কলি' নামে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনটি স্তরকে বলা হয় 'যুগ'। সাধারণত বলা হয় না—সত্যকাল, ত্রেতাকাল, দ্বাপরকাল। কিন্তু কলিকে 'যুগ' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'কাল' নামেও অভিহিত করা হয় 'কাল' শব্দের একটি অর্থ যেমন সময়, তেমনি তার অন্তর্নিহিত অর্থ—ভয়, ধ্বংস, মৃত্যু, সর্বনাশ। কলিকালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বলেছেন—

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ।। ১২।২।১

—হে মহারাজ পরিক্ষিৎ! কালের ক্ষমতা অপরিসীম; কলিকালে ধর্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে "অধর্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ" (১২।৩।২০) অর্থাৎ অধর্মের চার চরণ যথা—অসত্য, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ কলিযুগে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই কারণে ধর্মের চার চরণ যথা সত্য, দয়া, তপ ও দান ক্রমশ ক্ষীণ ও হীনবল হতে হতে এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে এবং একসময় তাও পরিপূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়—

কলৌ তু ধর্মপাদানং তুর্যাংশোঽধর্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষতি।। ১২।৩।২৪
তস্মিঁল্লুব্ধা দুরাচারা নির্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজাঃ।। ১২।৩।২৫

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেছেন যে যখন মিথ্যা-কপটচারিতা, তন্দ্রা-নিদ্রা, হিংসা-বিষাদ, শোক-মোহ, ভয় ও দীনতা প্রভৃতির প্রাধান্য ঘটে তখনই পৃথিবীতে তমোগুণপ্রধান কলি বিরাজ করে—

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকো মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ।। ১২।৩।৩০

কলিযুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে কলিযুগে সর্বপ্রকার অপগুণের উত্থান ঘটবে—

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ।
ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি।। ১২।২।২

অর্থাৎ কলিযুগে ধনীব্যক্তিগণই কুলীন, সদাচারী ও উচ্চগুণের অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন। তখন ধর্ম ও ন্যায় ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য ক্ষমতাশীল লোকেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে।

তখন মানুষকে দরিদ্র হলেই অসৎ ও দোষী বলে ধরে নেওয়া হবে, অহংকার ও বাগাড়ম্বর বড় সাধু হওয়ার লক্ষণ বলে গণ্য হবে—"অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু", মানুষ হবে "ক্ষুদ্রদৃশো" অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন, জনপদ হবে "দস্যুৎকৃষ্টা" অর্থাৎ দস্যু ও লুণ্ঠনকারীতে পরিপূর্ণ, প্রজাগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধিতে কাতর হবে এবং চিন্তা-ভাবনায় জর্জরিত থাকবে—'ক্ষুদ্‌ড্ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে চ চিন্তয়া', পুত্রগণ তাদের বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে প্রতিপালন করবে না—"ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি (১২/৩/৪২), হীনচিত্ত প্রাণীগণ হয়ে উঠবে "শিশ্নোদরম্ভরাঃ" অর্থাৎ কামনাবাসনা ও উদর পূর্তিতেই সদাব্যস্ত, মানুষ হবে "পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ" অর্থাৎ মূঢ়মতি এবং প্রবল চিত্তবৈকল্য সম্পন্ন। কিন্তু এ তো প্রকৃত মানুষের পরিচয় নয়। কিন্তু এত বাধার পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে

কে তাদের দেখাবে সত্যের আলোক যা তাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের পথ প্রদর্শন করবে? কলিযুগে পথভ্রষ্ট সমগ্র মানবকুলের এই অনতিক্রম্য বিপদকে হেলায় অতিক্রম করার পথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবত। বলেছেন—মৃত্যুকালের আতুরতায় অথবা পতন, পদস্খলন বা বিবশতায় মানুষ একবার তাঁর নাম করলেই তার সকল কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে উত্তমগতি লাভ করে। কিন্তু সেই যুগে বসে শ্রীশুকদেব আক্ষেপ করে গিয়েছেন যে দুর্ভাগ্য বশতঃ কলিযুগের মানুষগণ সেই পথ অবলম্বন করবে না। দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের চুয়াল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে এই বিষয়টি শ্রীশুকদেবের ভাষায় মূর্তরূপ পেয়েছে—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।

কিছুটা একই সুরে স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মানারদসংবাদে বলা হয়েছে যে কলিকালে পাপভারে ভারাক্রান্ত জীবগণ কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু তারা যদি বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হয় তাহলে তারা জীবনে সর্বকাজে সফল বলে বিবেচিত হয়—

কলৌ কলিমলাক্রান্ত ন জানন্তি হরিং পরং।
যেঽর্চ্চয়ন্তি তমীশানং কৃতকৃত্যান্ত এব হি।।

সুতরাং দেখা যায় যে কলি কোনও যুগ নয়, কলি কোনও পৌরাণিক চরিত্র নয়। কলি হল মানব সমাজের অশুভ মানসিক রোগ। সমাজের যুবসমাজ যখন মাদকাসক্ত হয়ে পরে, যখন বিপথগামী হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাকে সমাজের মুল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য এক প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ইংরাজিতে যাকে Counseling বলা হয়। অন্তরে যখন অশুভ চেতনার কলি বাসা বাঁধে, তখন অন্তরের কৃষ্ণনামের প্রদীপশিখা Counseling-এর কাজ করে এবং বিপথগামী মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথের দিশা দেয়। কর্কট, কামলা যেমন শরীরের রোগ, কলি তেমনই মনের

রোগসমষ্টি। অতিরিক্ত তামাকু-সেবন বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের ফলে যেমন ঐ সমস্ত দৈহিক রোগের প্রকোপ বর্ধিত হয়, তেমনই মনের পাপাসক্তি অন্তরে কলিরূপ মনোব্যাধির প্রকোপের পথ সুগম করে। যে ব্যক্তি দিবা-নিশি মদ্যপানের কথা চিন্তা করে, তার গতি হয় শুঁড়ি-বাড়ীর দিকে; কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা প্রকৃত পরোপকারের চিন্তা করে, তার মন থেকে সব রকম অশুভ চিন্তা দূর হয়ে সর্বদা অপরের কল্যাণের পথে ধাবিত হয়। যে পুণ্যপ্রাণের অন্তরে সদা সর্বদা হরি নামের পবিত্র গঙ্গা প্রবাহিত তাঁর অন্তরে অনধিকারপ্রবেশকারী পাপরাশির ধূলিকণা বৈশাখের ঝঞ্ঝাবাত্যায় উড়ে যাওয়া শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় নিমেষে বিদূরিত হয়। রক্তে সঞ্চিত শ্বেত কণিকা যেমন শরীরে প্রবিষ্ট রোগ-জীবাণুকে পরাভূত ক'রে শরীরকে রোগের আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে, তেমনই অন্তরের কৃষ্ণনামের ফল্গুধারা অন্তরের পাপরাশিরূপ কলিকে দূর ক'রে অন্তরে শুভ ও পবিত্র বোধ ও চেতনার উন্মেষ ঘটায় অর্থাৎ পাপরূপ কলি তার অন্তরকে আক্রমণ বা পর্যুদস্ত করতে পারে না। আর এর ফলে যে কেবল মাত্র তার মানসিক উৎকর্যতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাই নয়, ধীরে ধীরে সে পরিমিত ও পরিশীলিত জীবনযাত্রা ও পরিমিত পান-ভোজনে অভ্যস্ত হয় এবং এর ফলে তার দৈহিক রোগেরও উপশম হয়। এই জন্য কৃষ্ণনামকে সর্বরোগের ঔষধ বলা হয়।

কিন্তু কলির দংশন বড়ই অমোঘ। শত ঔষধ প্রয়োগেও এই দংশনের গরল অন্তরকে বিবশ করে রাখে। এর কবল থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল অন্তরে সদাসর্বদা কৃষ্ণের অনুধ্যান। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে হরিনাম-সঙ্কীর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে রায় রামানন্দকে বলছেন—''নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়'।।

এবিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে অপূর্ব উপমার সাহায্যে বলা হয়েছে অগ্নিনির্বাপণের জন্য যেমন বারি, তমসা বিদূরিত করার জন্য যেমন প্রভাকরের উদয়, কলির পাপানল মোচনের জন্য তেমনি শ্রীহরির নামকীর্তন—

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ।।

স্কন্দপুরাণে কলির মোহ-পাশে আবদ্ধ বিচলিত মানবকুলকে মাভৈ দান করে বলা হয়েছে—হে কলিপীড়িত জীবগণ! তোমরা কলিরূপ কালসর্পের তীক্ষ্ণ বিষদন্ত দর্শনে বিচলিত হবে না। গোবিন্দ নামের দাবানল কলির সমস্ত প্রভাবকে দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে ফেলবে—

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গেবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্।।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে যে কলিযুগে দেহীগণের 'গোবিন্দ' এই নামের সাহায্যে মাধবের সঙ্কীর্তন ক'রে যতখানি শুদ্ধি অর্জন ঘটে, দ্বাদশ দিবস উপবাস সহকারে পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্র সাধনের মাধ্যমে সেই শুদ্ধিলাভ হয় না—

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্।।

বৃহন্নারদীয়পুরাণের অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের শততম শ্লোকে কলিধর্ম্মপ্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্।।
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ।।

—যে সব হরিনাম প্রিয় মানুষ এই ঘোর কলিযুগে সতত হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! ইত্যাদি নামোচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর ভজনা করেন, কলির সাধ্য কি তার পথে কোনরূপ বাধা হয়ে দাঁড়ায়?

কৃষ্ণনামের শক্তি অসীম। আপাত দৃষ্টিতে অতি ছোট অবয়বের এই দুই অক্ষরের নামকে অতি নিরীহ মনে হলেও অহর্নিশ ক্রমান্বয়ে জগদ্বিধাতা হরির নামোচ্চারণের অনুশীলন ভক্তের অন্তরকে ব্যাঘ্রের মত শক্তিশালী করে তোলে। অসীম মনের শক্তিতে সে তখন মনের সমস্ত ক্লেদ-প্রবেশের পথকে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। ফলে কলিরূপ দূষিত ঝঞ্ঝা তার অন্তরকে আর আলোড়িত

ক'রে তার যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এবিষয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর বলা হয়েছে—

যেহহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্।।

শ্রীমদ্ভাগবতে যদিও বলা হয়েছে যে কলিতে কেবল দোষের প্রাচুর্যই লক্ষিত হয়, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে কলির কিছু ভালো বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করা হয়েছে যা অবশ্যই কৃষ্ণমাহাত্ম্যের সঙ্গে জড়িত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। ১২/৩/৫১

—হে পরীক্ষিৎ! কলিযুগ স্তূপাকার দোষে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার একটা মহান গুণও আছে। সেটি হল এই যে মানুষ সহজেই শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি এবং পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ যদিও ছিল উৎকর্ষতাগুণে ভূষিত, তথাপি এই তিন যুগে মানুষের পরমার্থ লাভের পথ ছিল অতীব কঠিন। বহু কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরমার্থসকল লাভ করতে হত। কিন্তু কলিযুগ দোষের প্রাচুর্যমণ্ডিত, তথাপি কলিতে পরমার্থ লাভের পথ অনেক সহজ। এযুগে মানুষকে পরমার্থ লাভের জন্য ঘোর তপস্যা, জটিল যোগক্রিয়া প্রভৃতি অবলম্বন করতে হয় না। কলিযুগে মানুষ কেবলমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমেই তার সকল স্বার্থ ও পরমার্থ লাভ করতে পারে। এই জন্য গুণমুগ্ধ সারগ্রাহী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কলিযুগের প্রশংসা করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোহভিলভ্যতে।।

বিষ্ণুরহস্যেও অনুরূপভাবে গোবিন্দকীর্তনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তিভাবে হরির অর্চনায় যে ফল পাওয়া যেত, কলিযুগে গোবিন্দ-নাম-কীর্তনে অবিকল সেই ফল লাভ করা যায়—

সদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ।।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে কলিযুগে দোষের অন্ত নাই। কলির অপবিত্র প্রভাবে সমস্ত কিছুই দূষিত হয়ে যায়। কিন্তু সমস্ত দোষের উৎস তো অন্তর। তাই যখন পুরুষোত্তম ভগবান রাধাগোবিন্দ শ্রীহরির সেই অন্তরে আগমন ঘটে তখন তাঁর সংস্পর্শে হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য বিদূরিত হয়ে যায়—

পুংসা কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

শ্রীমন্ ভগবানের তো অনন্ত নাম। বিভিন্ন অবতারে তিনি বিভিন্ন নাম ধারণ করেছিলেন। এই সমস্ত নামেই তিনি পূজ্য। কিন্তু কখনও কখনও হয়তো মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে পারে—কোন নামে তাঁর ভজনা করলে তাঁকে বেশী প্রীত করা যাবে। কিন্তু শাস্ত্র বলে যে এ বিষয়ে মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাঁকে যে কোন নামে ভজনা করাই যথেষ্ট। ভগবানের নাম-সেবা সম্বন্ধে পুলস্ত বলেন—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ।।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ।।

—ভগবান দেবদেব চক্রধারী সর্বার্থশক্তিসম্পন্ন, তাঁর প্রতিটি নামই একার্থবোধক, সুতরাং সর্বার্থসিদ্ধি অভিলাষে তাঁকে যে কোন নামেই ভজনা করা যায়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও প্রায় একই ভাষায় এই কথা বলা হয়েছে—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ।।

—দেবদেব চক্রপাণি ভগবানের সকল নামসমূহই সর্বার্থশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ সকল নামেরই ক্ষমতা সমান। সেই জন্য সকল কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের যার যে নাম ভালো লাগে সে সেই নামেই তাঁর ভজনা করতে পারে।

—সুতরাং ভজনার্থে তাঁর নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভক্তের বিভ্রান্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। যে নাম তার পছন্দ সেই নামে সে তাঁকে ভজনা করতে পারে।

অবশ্য সকল কৃষ্ণানুরাগীর জ্ঞাতার্থে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা

প্রয়োজন। যদিও কৃষ্ণের যে কোন নামই সমার্থক এবং সমান অভীষ্ট ফলদায়ী, তথাপি তাঁর কৃষ্ণবতারের নামের গুরুত্ব সমধিক। সেকারণে তাঁকে কৃষ্ণাবতারের যে কোন নামে ভজনা করা অধিকতর শ্রেয়।

শ্রীভগবানের সকল নামেরই মাহাত্ম্য সমান হলেও কৃষ্ণাবতারের নামের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়—

শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি
কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ।।

প্রভাসপুরাণে নারদ ও কুশধ্বজ সংবাদে শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন যে তাঁর সকল নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামই তাঁর সর্বাধিক প্রিয় এবং এই নাম অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং প্রধান মুক্তিবিধায়ক—

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্।।

তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"সর্ব্বানি নামানি হি তস্য রাজন্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাৎ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা।।

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই সর্বকার্যে সিদ্ধি দান করে। সেজন্য সকল কাজেই ভক্তিভাবে তাঁর কৃষ্ণাবতারের নাম যথেষ্ট স্মরণ করাই ভক্তের কর্তব্য।

ঊনবিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ তো এই বিশ্ব-চরাচরব্যাপী সর্বভূতে বিরাজমান। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রতিটি অণু-পরমাণু, অন্দর-কন্দর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল স্থানে সদাসর্বদা তাঁর মধুর উপস্থিতি। এই পৃথিবীর কোনও স্থানই যেমন ক্ষণকালের জন্য বায়ুশূন্য থাকতে পারে না, তেমনই এই বিশ্বচরাচরের এমন কোন স্থান নেই যেখানে কৃষ্ণের উপস্থিতি ক্ষণকালের জন্যও অবিদ্যমান থাকে।

তিনি যে সর্বভূতে সর্বত্র বিরাজমান এই তত্ত্বটি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ মন্ত্রে বিবৃত হয়েছে। সেখানে সেই পরমব্রহ্ম পরমপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে প্রণতি জানিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি অগ্নি, জল, ওষধি, লতা, বৃক্ষ সকলের মধ্যে বিরাজমান। তিনি সমগ্র বিশ্ব-চরাচর জুড়ে পরিব্যাপ্ত—

যো দেবো অগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।

শ্রীকৃষ্ণের এই সদা-সর্বত্র বিরাজমানতার তত্ত্বটি প্রখ্যাত কবি রজনীকান্ত সেন তাঁর গানে সুললিত ছন্দময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধরসলিলে, গহনে
আছ, বিটপীলতায়, জলদের গায়, শশীতারকায় তপনে।

তিনি যে পৃথিবীর সর্বত্র সদা বিরাজমান এই সত্যের সমর্থন আমরা প্রাপ্ত হই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জুনের মুখনিঃসৃত তাঁর শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধে এসে অর্জুন অবশ্যম্ভাবী প্রিয়জন-বিয়োগের চিত্র মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিতান্ত ব্যথা-দীর্ণ হৃদয়ে বিষণ্ণ-চিত্তে অস্ত্রত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণের জলদগম্ভীর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' এই উদাত্ত সঞ্জীবনী মন্ত্রের

আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন সিংহের ন্যায় জড়তারূপ নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ উপদেশাবলির প্রভাবে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শনে অভিলাষী হলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে সখা কৃষ্ণের নিকট স্বীয় মনোবাসনা ব্যক্ত করে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন যে তিনি যদি তাঁকে উপযুক্ত মনে করেন তাহলে তিনি তাঁকে তাঁর অব্যয় স্বরূপ দর্শন করান—

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শায়াত্মানমব্যয়ম্।। ১১/৪

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাসনা পূরণার্থে অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুন তখন সেই অভূতপূর্ব এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বতোমুখী দৃশ্য দর্শনে নিতান্ত আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হলেন—"ততঃ স বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ" এবং সেই নিতান্ত বিস্মিত হৃদয়ে আবিষ্টের ন্যায় বিশ্বরূপধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।। ১১/১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।। ১১/১৭

—হে প্রভু বিশ্বেশ্বর! আমি সর্বত্রই তোমার বিরাট মূর্তি প্রত্যক্ষ করছি। সর্বত্রই তোমার বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু কোথায় তোমার আদি, কোথায় তোমার অন্ত তা আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ১৬। প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাময় কিরীট, গদা ও চক্রধারী তোমার (মোহন) রূপ সর্বত্র বিরাজ করছে।১৭।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে অর্থাৎ দশম মণ্ডলের নব্বইতম সুক্তের প্রথম মন্ত্রে অনুরূপভাবে এক পরমপুরুষের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য বর্ণনা হয়েছে যাঁর সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-বাহির সর্বত্রব্যাপী বিরাজিত এবং যাঁর থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুরই উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমগ্র ভূমি পরিব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র প্রাণীকুলের আশ্রয়স্থল রূপে বিরাজ করছেন—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্টদশাঙ্গুলম্।।

সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও ঋগ্বেদের পরমপুরুষের মধ্যে অভেদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতএব ঋগ্বেদের যুগে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অস্তিত্ব ছিলনা ব'লে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা গ্রহণযোগ্য নয় ব'লে প্রতিভাত হয়।

যাইহোক, পরমেশ্বরের এই সদা সর্বত্র উপস্থিতির এই তত্ত্বটিই রবীন্দ্র-চেতনার মধ্যেও প্রকাশলাভ করেছে—

তুমি আছ সব চেয়ে, আছ নিশিদিন,
আছ প্রতি ক্ষণে-আছ দূরে, আছ কাছে,
যাহা-কিছু আছে তুমি আছ ব'লে আছে।[১০]

অথবা "যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো"।

সুতরাং কৃষ্ণের উপস্থিতি সর্বত্র সদা বর্তমান। প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভে যেমন কাননের সর্বত্র সুবাসিত হয়ে ওঠে, তেমনই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র স্পর্শে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্থানই পবিত্র হয়ে ওঠে। তাই পৃথিবীর যে কোনও স্থানে যখন তখন শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। বিভিন্ন শাস্ত্রে বহুভাবে বহুক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা প্রচার করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন যে তাঁর নাম কীর্তনের কোন নির্দিষ্ট স্থান, কাল, পাত্র নেই। প্রকৃত ভক্ত যত্র-তত্র, যখন-তখন তাঁর নাম কীর্তন করতে পারে—"নিয়মিতঃ স্মরণে না কালঃ"।

স্কন্ধ পুরাণ ও পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে যেহেতু শ্রীহরি স্বয়ং পবিত্রকারী, সেজন্য তাঁর নামকীর্তনে কোন অশৌচাশঙ্কা নাই। সেকারণে সদাসর্বদা সর্বত্র তাঁর নামকীর্তন করা উচিৎ—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ।।

১০। নৈবেদ্য

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে গোবিন্দের নামকীর্তনের ক্ষেত্রে কোন দেশ, কাল বা অবস্থার শুদ্ধাশুদ্ধি বাছবিচার করার কোন প্রয়োজন নেই। এই নামের বৈশিষ্ট্য অন্য সকলের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা বাসনাকারীর বাসনা পূরণ করে—

নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্।।

বৈশ্বানরসংহিতায় উল্লিখিত আছে যে মুক্তিকামী জীব কেবলমাত্র 'রাম রাম' এই নাম জপ করে গেলেই আকাঙিক্ষত মুক্তি লাভ করতে পারবে। এর জন্য তার দেশকালের নিয়ম বা শৌচাশৌচের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই—

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সকীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে।।

বৈষ্ণব চিন্তামণিতে দেখা যায় নারদমুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে।
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে।।

—হে রাজন্! এমন কোন সময় বা স্থান নেই যেখানে পবিত্র বিষ্ণুনাম কীর্তন করা নিষিদ্ধ। সংসারে দান, যজ্ঞ, স্নান এবং মন্ত্রাদি বিষয়ে কালের বিধিনিষেধ আছে কিন্তু হরিনাম সঙ্কীর্তনের জন্য কোন কালের অপেক্ষার প্রয়োজন নাই।

বিষ্ণুধর্ম পুরাণে ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে বলা হয়েছে—

ন দেশনিয়মঽস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক।।

অর্থাৎ শ্রীহরির নামকীর্তনের ব্যাপারে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। এমনকি উচ্ছিষ্ট মুখেও তাঁর নামগ্রহণের কোন বাধা নাই।

বিংশ তরঙ্গ

প্রকৃত ভক্ত তাঁর একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণে এতই সমর্পিতপ্রাণ যে এক মুহূর্তের প্রভুর অদর্শন মনে হয় যেন এক যুগ অর্থাৎ বারো বৎসর এবং প্রভুবিহনে তাঁর দু'নয়ন হতে অবিরল নির্গত হয় বিরামহীন আঁখিলোর, সমস্ত বিশ্ব-জগৎ তাঁর কাছে মনে হয় শূন্য, অসার। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তমনের এই অনুভূতিটি তাঁর 'শিক্ষাষ্টকম্'-এ সুন্দর ভাষা ও ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে।

এর বঙ্গানুবাদ ক'রে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন।।
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।।

এই একই কথা শোনা যায় দ্বারকাবাসীদের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তাবাচ্যুত।।

—"হে কমললোচন! হে কৃষ্ণ! আপনি যখন আপনার আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য হস্তিনাপুরে অথবা মথুরাপুরীতে যান, তখন আপনার অদর্শনে আমাদের এক একটি মুহূর্তও কোটি বৎসরের মতো দীর্ঘ মনে হয়। আপনাকে ছাড়া আমাদের সেই দশা হয় যেমন সূর্য না থাকলে চোখের।"

কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণভক্তকে হতে হবে আগুনে পোড়ানো খাঁটি সোনা। তার না থাকবে কোন অহমিকা, না থাকবে কোন অসহিষ্ণুতা। তাকে হতে হবে

'তরু হতে' সহিষ্ণু এবং 'তৃণ হতে দীনতর'; তার সমস্ত অসূয়া, অহমিকা, অসহিষ্ণুতা পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে তাঁর শ্রীচরণে। তবেই পাওয়া যাবে তাঁর করুণা, তবেই পাওয়া যাবে তাঁর অভয়াশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের পরং ভক্ত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই ধারণা পোষণ করেন। তাঁর ভাষায়—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণদাসকবিরাজ বিরচিত শ্লোকটির বঙ্গানুবাদটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হৈবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।।
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়।।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে কুন্তীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রায় একই কথা বলেছেন—

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।

অর্থাৎ উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, সৌভাগ্য ইত্যাদির গর্বে যারা গর্বিত তারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভে অক্ষম কারণ তিনি কেবলমাত্র অকিঞ্চনদেরই দর্শন দেন।

আবার একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ন যস্য জন্মকর্ম্ভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।৫১
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেস্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।৫২

—যে ব্যক্তির অন্তরে উচ্চকলে জন্ম, তপস্যাদির জন্য গর্ব জাতি বর্ণাশ্রমজনিত অহংকার এসব কিছুই নেই সেই ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত।।৫১

—যিনি ধনসম্পত্তি বা দেহাদিতে আপন-পর ভেদ করেন না, কোন বস্তুর মধ্যে ভেদাভেদ না ক'রে সমস্ত বস্তুতে সম-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষশ্র করেন এবং কোন বিশেষ বিষয়ের দ্বারা তাড়িত না হয়ে শান্তভাবে অবস্থান করেন তিনিই ভগবানের প্রকৃষ্ট ভক্ত।।৫২

একথায় শ্রীমদ্ভাগবতের মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তকে হতে হবে সর্বোৎকৃষ্ট চারিত্রিক, মানসিক, মানবিক, সামাজিক গুণসম্পন্ন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

নীচজাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতকুলাদি বিচার।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বমুখে তাঁর প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে তাঁর প্রকৃত ভক্ত হবে তাঁর প্রতি প্রেমে গদগদ, প্রেমে চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় অবিরল তাঁর প্রতি ধাবিত হবে, তাঁর জন্য যে অবিরাম রোদনরত হবে, আবার কখনও বা শিশুর মতো হেসে উঠবে, কখনও বা লজ্জা বিস্মৃত হয়ে উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে উঠবে, কখনও বা নৃত্য ক'রে উঠবে—

বাগ গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পূনাতি।। ১১।১৪।২৪

শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ ভক্ত নিত্য বিরাজ করেন এক আনন্দবাজারে যেখানে সে ধন, জন, অর্থ, সম্পদ, মান, যশ, নারী কোন কিছুই কামনা করে না। তার একমাত্র বাসনা জন্মজন্মান্তর ব্যাপী সে যেন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অন্তরের সমগ্র পবিত্র ভক্তি পরিপূর্ণভাবে উজাড় ক'রে দিতে পারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে। তাই মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকম্'-এ বিবৃত হয়েছে—

ন ধনং জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

কাব্যরসিক পাঠকগণের প্রীতার্থে উপরোক্ত শ্লোকটির কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত বঙ্গানুবাদটি উদ্ধৃত করা হল—

"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি।।
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান।।"

কৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্র ভক্তের নয়নকমলদ্বয় হতে অবারিত ধারায় প্রবাহিত হবে নয়নবারি, গদগদ আবেগে কণ্ঠ হয়ে উঠবে অবরুদ্ধ, তাঁর নাম গ্রহণের আনন্দে এক নিবিড় আন্তরিক পুলকানুভূতিতে হৃদয়-কেকী প্রবৃত্ত হবে নৃত্যরঙ্গে—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহনে ভবিষ্যতি।।"

রবীন্দ্রনাথ শ্যামা নাটকে লিখেছিলেন—

ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানিনে জানিনে—
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি

প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের লক্ষণ তো তাই। সে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু বোঝে না। এই পৃথিবীতে কেবল সে এবং কৃষ্ণ। সে যখন নয়ন মেলে তাকায় তখন দেখে এই জগতের সমস্ত কিছুতেই কৃষ্ণ। আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, লতা গুল্ম, পশু, পাখি নদী, জল, সমুদ্র সমস্ত কিছুর রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাণপ্রিয় গিরিধারী নটবরলাল। আবার যখন সে নয়ন মুদে আত্মস্থ হয় তখন সে দেখে তার সমস্ত হৃদয়ের অন্দর-কন্দর জুড়ে বিরাজ করছে তার শ্যামতনু নন্দনন্দন গোলোকবিহারী বালগোপাল। তাই সে আর অপর কারও কথা ভাবে না, আর কাউকে অন্তরে স্থান দেবার বাসনা তার মনে স্থান পায় না। তাই স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্তান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন।
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা।।

—আমি গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদনকে পরিত্যাগ করে আর কাউকে জানিনা, আর কারও ভজনা করি না, আর কাউকে স্মরণ করি না। আমি হরি বিনা আর কাউকে প্রণতি জানাই না, আর কারও স্তব করি না, হরি বিনা আর কারও মূর্তি আমার চোখে পরে না, হরি ব্যতীত আর কোন বাসনা আমার নাই, হরির নাম ভিন্ন আর কোন গান আমি গাই না, তাঁর সন্নিকট ব্যতীত আর অন্যত্র কোথাও আমি গমন করি না।

এই প্রসঙ্গে আদি শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে বলেছেন—

কস্তাং পরমানন্দরসানুভূতি-
মুত্সৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে
চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ।। ৫২৩।।

—সেই পরমানন্দরসকে পরিত্যাগ ক'রে কোন বিদ্বান ব্যক্তি অপর তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি প্রেমানুভব করবে? অতি আনন্দদায়ক প্রকাশমান পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও চিত্র-লিখিত চন্দ্রমা দর্শন করার ইচ্ছা কে করবে?

রবীন্দ্রনাথের চেতনাতেও এই বোধের উন্মেষ ঘটেছিল যার প্রতিফলন আমরা দেখি নৈবেদ্য কাব্যে—

তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগত-প্রাণ। তাঁর কাছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকিছুর গুরুত্ব তাঁর ভক্তের গুরুত্বের কাছে তুচ্ছ। এবিষয়ে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রথমরাত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

ন হি ভক্ত্যাৎ পরশ্চাত্মা প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ।
ন লক্ষ্মী রাধিকা বাণী স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরেব চ।।

ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাংস্তথা।।

"আত্মা, প্রাণ, দেহাবয়ব, লক্ষ্মী, রাধিকা, সরস্বতী, স্বয়ম্ভু, শম্ভু,—এসকলও তাঁহার নিকট ভক্ত অপেক্ষা প্রধান নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগত প্রাণ এবং বৈষ্ণবগণও কৃষ্ণগতপ্রাণ হন। শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন, তিনিও শ্রীবৈষ্ণবগণকে ধ্যান করেন।"

কৃষ্ণ ভক্তের মধ্যে তাঁর পূর্ণতা খোঁজেন। ভক্ত বিনা কৃষ্ণের আপনাকে চেনার মধ্যে অপূর্ণতা থেকে যায়। স্নেহশীল মানবপিতা নিষ্পাপ শিশুপুত্রের দন্তহীন মুখপল্লবের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তার মধ্যে যেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তেমনই পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ পরম স্নেহশীল দৃষ্টিতে তাঁর ভক্তদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হয় যেন তিনি নিজেকে সম্যকভাবে জানতে পারবেন তাঁর ভক্তদের মধ্যে। তাই তাঁর মধ্যে উদিত হয় এক অদ্ভুত ভাব-ভক্তদের প্রতি ভক্তভাব। কবিশেখর ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই বিষয়টি অপূর্ব রমণীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

"কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব।।"

কোন ভক্ত তাঁকে দাস্যভক্তিতে ভজনা করলে তিনিও তাঁর দাস হয়ে যান। আদিপুরাণে আমরা দেখি যে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

গত্বা চ মম নামানি নর্তয়েৎ মম সন্নিধৌ
ইদং ব্রবিমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জুন।

—হে অর্জুন! আমি তোমাকে সত্য বলছি। যার জিহ্বাগ্রে আমার নাম নৃত্যরত থাকে, সে আমাকে কিনে নেয়।

একবিংশ তরঙ্গ

কৃষ্ণতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে একশ্রেণীর নিম্নগতিসম্পন্ন মানুষের কৃষ্ণচরিত্রের ভ্রান্ত মূল্যায়ণের প্রচেষ্টার দিকটি তুলে ধরা প্রয়োজন। তা নাহলে সাধারণ মানুষের মনে কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত বিকৃত ধারণা থেকে যায়। সাধারণ নিম্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের চিন্তা নিম্ন প্রবাহী। সে কিছুতেই মাথা উঁচু ক'রে সীমাহীন নীলাকাশের নীলিমার সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রয়াস করতে পারে না। সে কেবল অহরহ মাথা নিচু ক'রে ভূমিপৃষ্ঠে কোথায় মলিনতা ছড়িয়ে আছে তার অন্বেষণে ব্যস্ত। পবিত্র চিন্তার জগতে সে চিরব্রাত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণের মত সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয় সুমহান চরিত্রের প্রতি কর্দম নিক্ষেপ ক'রে সে এক বিকৃত দুরারোগ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সেই সুপ্রাচীনকালে ভাগবতকার এরকম একটা সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মসৃণ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের সাঁইত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন—সাধারণ মানুষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন। তাই তারা অজ্ঞানতাবশত ভাবে যে কৃষ্ণ পার্থিব কলুষতার সঙ্গে যুক্ত যদিও তিনি সকল কলুষতা থেকে মুক্ত—

তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ। ১।১১।৩৭

একধরণের নিম্নরুচি সম্পন্ন তথাকথিত কৃষ্ণভক্তদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কতখানি হীনভাবে চিত্রিত হয়েছে তা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকলসময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন।"

হিন্দু ভক্ত জনসমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ভক্ত তার আরাধ্য দেবতাকে কোন দূর জগতে অধিষ্ঠিত দেখতে চায় না—তাঁকে তারা তাদেরই ঘরের একজন অতি নিকট ও প্রিয়জন ব'লে ভেবে তাঁর সেবা, তাঁর আরাধনা, তাঁর ভজন-পূজনের মাধ্যমে হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করতে চায়। তাই তারা তাদের আরাধ্যা দেব-দেবীদেরকে কখনও পুত্র, কখনও কন্যা, কখনও মাতা, পিতা, স্বামী, সখা রূপে লাভ করতে চায়। এরমধ্যে দোষের কিছু দেখি না। প্রকৃত ভক্ত তার আরাধ্য দেবতাকে যেভাবেই পবিত্র-কল্পনা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভে সচেষ্ট হোক না কেন তার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে এক শ্রেণীর অত্যুৎসাহী কৃষ্ণভক্ত তাঁদের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের বদ্ধ গৃহের চার দেওয়াল ও অঙ্গনের মধ্যে এমন ভাবে পাতিত ক'রে ফেলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের অতি পবিত্র তনুখানি তাঁরা তাঁদের দেহ নির্গত পুতিগন্ধময় নিষ্ঠীবন ও পুরীষে অনুলিপ্ত ক'রে ছেড়েছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের অন্যান্য অনেক দেব-দেবীর ক্ষেত্রে ভক্তের এরকম মনোভাব বড় একটা দেখা যায়না। যেমন মহাকালীর ভয়ঙ্করী মূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে ভক্ত এতখানি দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারেনি। ব্যতিক্রম আত্মভোলা মহাদেবের ক্ষেত্রে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাঁরা এতখানি সাহস দেখাতে পেরেছেন কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে পরম প্রেমময়। তিনি ধরিত্রীর বুকে অবতীর্ণ হয়েছে ভক্তের জন্য প্রেমের পশরা নিয়ে। তিনি সদা হাস্যময়, বরাভয় দানকারী, অহিংস। তিনি কখনও হিংসা করেন না, হত্যা করেন না। তিনি কখনও কখনও পাপাত্মাকে সংহার করেন বটে; কিন্তু তিনি তা করেন জগতের বৃহত্তর কল্যাণার্থে; নিছক কোন হিংসার বশবর্তী হয়ে নয়। তাই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ব'লে বিশ্বাস করেন তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়; মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সে ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?" বস্তুত এ যে কোনমতেই বাস্তবসম্মত নয় তার স্বপক্ষে তিনি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন ক'রে বলেছেন—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিযা বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমাতে সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ চরিত্র পুরাণেতিহাসে কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা

জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি, তাহার ফল এই যে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।" সুতরাং বিভিন্ন গ্রাম্য কুরচিপূর্ণ ছড়া, গান, কথকতা, নিম্নমানের কাব্য ইত্যাদিতে কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক লেপনের যে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তা সর্ব্বৈবভাবে পরিহর্তব্য। একটি শিশুকে সকলের অলক্ষ্যে ননী-মাখন হস্তগত ক'রতে দেখে তাকে চোর অপবাদ দেওয়াটা খুবই সহজ, কিন্তু ভাগবতকার তাঁর এই ননী-মাখন চুরির পিছনে যে মহৎ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি সম্যকরূপে অনুধাবন করা উচিৎ। শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বজীবে প্রেমময়। তিনি শৈশবেই অনুভব করেছিলেন যে মানুষেরা তো ইচ্ছা করলেই যথেষ্ট নবনীত ভক্ষণ করতে পারে, কিন্তু বানরদের সে সুযোগ নেই। তাই তিনি বানরদের খাওয়ানোর জন্য নবনীত আহরণ করতেন। এরকমই একদিনের ঘটনা হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটি উদ্ধৃত হল—

উলূখলাঙেঘ্ররুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ।।

—"শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্য একস্থানে, উল্টানো উদুখলে চড়িয়া শিকাস্থিত নবনীত আপন ইচ্ছামত বানরদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু দুইটি চৌর্যাপরাধে ভীত, চঞ্চলদৃষ্টি-সম্পন্ন দেখাইতেছিল। পুত্রকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া যশোদা ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ আসিয়া দাঁড়াইলেন"।

একাজকে অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলা কোনমতেই সমীচীন নয় বিশেষ ক'রে একজন শিশুর ক্ষেত্রে। তাই কতকগুলি প্রশ্ন পুনঃপুন ঘুরে ফিরে উদয় হয় অন্তরে—এ তোমরা কেমন মানুষ! শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত ক'রে তাঁর হাতে পুনরায় ফিরে এলে অট্টহাস্য ক'রে বল—গাঁজাখুরি; আর আমেরিকার উৎক্ষেপণাগার থেকে উপগ্রহ

মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ান্তে পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্তন করলে উল্লসিত হ'য়ে ব'লে ওঠো—আহা! বিজ্ঞানের কি অগ্রগতি। তোমাদের ঘরের নিতান্ত শিশু সবার অলক্ষ্যে খাবার এনে রাস্তার অভুক্ত অনাহারী কুকুরটিকে দিলে তা দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে চারিদিকে প্রচার শুরু কর—আহা! এটুকু শিশুর কি উদার মন এবং জীবপ্রেম! এ নিশ্চয়ই বড়ো হয়ে কোন মহাপুরুষ হবে! আর সেই তোমারই শিশু-কৃষ্ণ বানরদের জন্য নবনীত আহরণ করলে তাকে চৌর্যবৃত্তি আখ্যা দাও। কৌরবদের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা ও কৃষ্ণকর্তৃক তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে অবাস্তব কাহিনী ব'লে বর্ণনা কর; আর হিরোসীমায় পরমাণুবোমা বিস্ফোরণের ফলে গর্ভস্থ শিশুসহ প্রজন্মের পর প্রজন্ম তেজস্ক্রিয়তার শিকার ব'লে স্বীকার কর। তোমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তফাৎ এই যে তিনি তেজস্ক্রিতার হাত থেকে পরিক্ষিৎকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন; হিরোসীমায় তোমরা তা পারো নি। কবে এক বিদেশী ভারত আক্রমণকারী কোন এক পর্বতে ব'সে তার সেনাপতিকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা কথা ব'লে গেলেন, সেটি তোমাদের কাছে একটি বিখ্যাত এবং বরেণ্য প্রবাদরূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেল; আর ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-সেনাপতিকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুলনীয় সর্বোৎকৃষ্ট দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ সর্বজীবের পক্ষে কল্যাণকর পরম আদর্শ জীবনচর্যার সর্বোৎকৃষ্ট আচরণবিধিসহ পরম মূল্যবান উপদেশামৃত দিয়ে গেলেন সেগুলি তোমাদের কাছে ধর্মীয় গোঁড়ামি বৈ কিছু নয়! কথায় কথায় তোমরা প্রাচীন বিদেশী মহাপুরুষদের উক্তিকে উদ্ধৃত ক'রে নিজেদের পাণ্ডিত্যের গর্বে গর্ব বোধ কর; অথচ কেউ শ্রীমদ্ভগবদগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দিলে তাকে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট ব'লে বিদ্রূপ কর। তোমরা যারা ক্রীড়ামোদী তারা ব্রতচারী-খো খো খেলার সময় মাঠে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে দলে দলে ছেলে-মেয়েদের খেলার মাঠে জড়ো ক'রে খেলায় মাতো, বল—আহা! সকলের কি ক্রীড়ানুরাগ! অথচ সেই তোমারই কৃষ্ণের মোহন বাঁশী শুনে দলে দলে বালক-বালিকারা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলার জন্য যমুনাপুলিনে সমবেত হ'লে তার মধ্যে কদর্যতার গন্ধ পাও। তোমরা পার্টিতে গিয়ে পুত্র-পুত্রবধূ,

কন্যা-জামাতা, আত্মীয়-পরিজন পরিবৃত হ'য়ে নারী-পুরুষে হাত ধরাধরি ক'রে নৃত্য করো। তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখো না। একে বল আধুনিকতা। আর শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে রাসলীলায় মত্ত হ'লে তাকে ইন্দ্রিয়লালসা নাম দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করো। তোমাদের পার্টিতে নারী-পুরুষের নাচানাচি বর্তমান সমাজ কতখানি অনুমোদন করে জানিনা, কিন্তু রাসলীলার মতো ক্রীড়া তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ও অনুমোদিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একশত এগার অধ্যায়ের একষট্টি সংখ্যক শ্লোকে তাঁর সম্পর্কে একটি পদ ব্যবহার করা হয়েছে—'নবনীতচৌরম্'। কিন্তু উক্ত পুরাণের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি উত্তমরূপে পর্যালোচনা করলে পাঠকের বোধগম্য হবে এই শব্দটির মধ্যে হৃদয় উজাড় করা কতখানি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, প্রেম, মাধুর্য নিহিত আছে। ফলে পাঠকের কখনই মনে হবে না যে এই 'পদটি' কোন দোষণীয় অর্থ বহন করে। বরং সহজেই বোধগম্য হবে এই পদটি ব্যবহারের মাধ্যমে পুরাণকার কত আদরের বন্ধনে সর্বজনের প্রাণের পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বক্ষমাঝে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

তবে তাঁকে এক বিশেষ কারণে 'চোর' ভূষণে ভূষিত করা যায়। বামনপুরাণে বলা হয়েছে—

নারায়ণো নাম নরোনরানং প্রসিদ্ধ-চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং।

অনেকজন্মার্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র ত্রব।

—নারায়ণের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলে তা জন্মজন্মান্তরের পাপ হরণ ক'রে নেয়। এই জন্য তাঁকে 'প্রসিদ্ধ চোর'' বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এহেন চৌর্যাপবাদ তাঁর উজ্জ্বল চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বহন করে।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

'রাস' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'রস্' শব্দ থেকে-রস (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভাব। 'রস্' শব্দের অর্থ হল কোলাহল বা শব্দ। রাসোৎসবের বৈশিষ্ট্য হল এই সময় গোপিনীগণ অঙ্গরাগ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য-গীতে রত হন- "উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।" (ভা ১০।৩৩।৯) রস্ হল ভগবানের এক নাম। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৭ মন্ত্রে ভগবানের অন্যতম নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো রসরাজ— সর্ব রসের সমাহার। রাস হল তাঁর অপ্রাকৃত দিব্যলীলা আর গোপিনীগণ হল শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিবিম্ব। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা গোপিনীগণের রূপে বহুরূপ ধারণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলা করেন। প্রতিবিম্ব হল সততই বাস্তব সত্তা বিহীন। শিশু যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত আপন চিত্র দর্শন ক'রে মহানন্দে তার সঙ্গে ক্রীড়া করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই আপন প্রতিবিম্ব গোপিনীদের সঙ্গে মহানন্দে রাসলীলা উপভোগ করেন—

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ—
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।। ভা ১০।৩৩।১৭

টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন—"যথা গোপ্যো নানাবিধবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ, এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি। তদ্বিলাসানভিভূতসৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ-যথার্ভক ইতি। স্বপ্রতিবিম্বৈর্বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য স ইব। অনেনৈতদ্দর্শিতম্, স্বীয়মেব সর্ব্বকলাকৌশলং সৌগন্ধ্যলাবণ্যমাধুর্য্যাদ্ চ তানু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে; যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বেরিতি।।"

রাসলীলা তৎকালীন সমাজের একটি প্রচলিত নৃত্যানুষ্ঠান যাতে অনেক নর্তকী অংশগ্রহণ করে। 'রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ।' ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থে রাস সম্বন্ধে বলেছে ,

"ক্রমসন্দর্ভধৃত রাস বা 'হল্লীষক' নৃত্যের যে লক্ষণ তাহা এই যে, নৃত্যকেলিতে মণ্ডলাকারে নৃত্যরতা অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে একক নট নৃত্যাভিনয় করে। তাহা বিবিধ তাল ও বিচিত্র গতিবেগমণ্ডিত হইলে রাসনৃত্য বলিয়া উল্লিখিত হয়"।[১১] শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় হল্লীষক নৃত্যের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন—

নর্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নট স্তদ্বৈ হল্লীষকং বিদুঃ।।
তদেবেদং তালবন্ধ-গতি-ভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি।।

—যখন মণ্ডলাকারে নৃত্যরতা অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে একজন নট নৃত্য করে, তখন সেই নৃত্যকে হল্লীষক নৃত্য বলা হয়। আর যখন এই হল্লীষক নৃত্য বিবিধ তাল ও গতিতে সংঘটিত হয় তখন সেই নৃত্যকে রাসনৃত্য বলা হয়। এই রাসনৃত্য স্বর্গেও দুর্লভ, মর্ত্যের কথা তো অনেক দূর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাসনৃত্য একটি বিশেষ প্রকারের শিল্পকলা বিশেষ। বর্তমান যুগে এ ধরণের নর-নারীর নৃত্য সম্মানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য কলুষযুক্ত কোন বিচারে?

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত জুড়ে এমন এমন বিভিন্ন শব্দ আছে যেগুলি একাধিক অর্থ বহন করে। সচরাচর মানব মনের সহজাত প্রবণতা হল অনেকার্থক শব্দকে প্রথমেই তার স্থুল অর্থে গ্রহণ করা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশ এই পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই পাঁচটি অধ্যায়কে 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী' বলা হয়। রাসপঞ্চাধ্যায়ী হল ভাগবতশরীরের প্রাণস্বরূপ। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী অংশে এরকম কতিপয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন 'রতি', 'রমণ' প্রভৃতি যেগুলি কোন কোন পাঠক স্থুল অর্থে গ্রহণ ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্রতা ও স্বর্গীয় উৎকর্ষতা কালিমালিপ্ত করে। কিন্তু এই শব্দ দুটির অপর অর্থ হল 'ক্রীড়া'। সুতরাং রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে 'রতি' বা 'রমণ' ক'রেছিলেন মানে তিনি তাঁদের

১১। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সঙ্গে রাস নামক দিব্যক্রীড়া করেছিলেন। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রযুক্ত এই সমস্ত শব্দগুলিকে স্থূল অর্থযুক্ত মনে করার পূর্বে ভাবতে হবে কোথায় কার প্রসঙ্গে শব্দগুলির এহেন অর্থ করা হচ্ছে। 'কলা' শব্দটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে মর্কট ভাবে 'সুস্বাদু রসাল ফল', সংস্কৃতিবান মানুষ ভাবেন 'সুকুমার শিল্প'। ফলে বিষয়টি কিভাবে গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে শ্রোতার মানসিক গঠনের উপর। যে কোন বিষয় সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে গেলে সেই বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন নচেৎ বিচারভ্রম ঘটা অবশ্যম্ভাবী। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কিভাবে বিচারভ্রম ঘটে একটি বাস্তব উপমার সাহায্যে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয়খণ্ডে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—".......যিনি অতত্ত্বজ্ঞ, লীলায় তাঁহার প্রবেশ ঘটে না। লীলার কদর্য করিয়া তিনি নিজে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হন ও অপরকে বিভ্রান্ত করেন। আপনি দূর হইতে দেখিলেন, একটি লোকের হাতে এক ধারাল ছুরিকা। সে তাহা অপর এক ব্যক্তির উদরে প্রবেশ করাইতেছে। এই ঘটনা দেখিয়া আপনি মনে করিলেন ডাকাত ঐ লোকটাকে ছুরি মারিয়া বধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আপনি ক্রোধান্ধ হইয়া এক লগুড় হস্তে ডাকাতকে মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন এক ডাক্তার এক রোগীর উদরে অস্ত্রোপচার করিতেছে। লোকটি ছুরিকাধারী—ইহা তথ্য। সে ডাকাত-ইহা অতত্ত্ব। সে ডাক্তার-ইহা তত্ত্ব। লোকটি জীবনঘাতক-ইহা অতত্ত্ব। লোকটি জীবনরক্ষক-ইহা তত্ত্ব। আপনি অতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহাকে আঘাত দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি তত্ত্বজ্ঞ হইলে উৎসাহযুক্ত হইয়া তাহার সহায়তা করিতে আসিতেন।"

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কোন অঙ্গকে যাতে মানুষ স্থূলার্থে গ্রহণ না করে তার জন্য শ্রীশুকদেব সযতনে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকের প্রথম পদ হিসাবে 'ভগবান্' এই শব্দটি ব্যবহার ক'রেছিলেন—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপশ্রিতঃ।।

ভা ১০।২৯।১

অর্থাৎ ভগবান হয়েও শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালের প্রস্ফুটিত-মল্লিকা-কুসুম-শোভিত সেই সমস্ত রজনী সমাগত দেখে যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় ক'রে ক্রীড়া করতে ইচ্ছুক হলেন।

সুতরাং এই শ্লোক অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান শব্দের ব্যুৎপত্তি হল—ভজ্ (সেবা করা ইত্যাদি) + গ কর্ম এবং অর্থ হল—ভগযুক্ত। 'ভগ' শব্দের অর্থ হল—পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য যথা সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ বীর্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য। আর এই সুদুর্লভ ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী যিনি তিনি কোনভাবেই কলুষযুক্ত হতে পারে না এবং তাঁর কোন কাজের মধ্যেই কালিমার কণিকামাত্রেরও উপস্থিতি থাকতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে সমালেচনা বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করার আগে অবশ্য বিচার্য হল সেই ব্যক্তির সামাজিক পরিচয়, সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা তার মূল্যায়ন প্রভৃতি। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণসমূহ উত্তমরূপে অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ করলে অবহিত হই যে শ্রীকৃষ্ণ এমনই এক বিশিষ্ট উন্নত চরিত্র যাঁর শ্রীপদাম্বুজে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সূর্যসম দীপ্তিশালী মুকুট পরিহিত মস্তক স্থাপন ক'রে ক্ষমাভিক্ষা করেন,[১২] প্রজাপতি ব্রহ্মা নতমস্তকে যাঁর শ্রীচরণকমল স্পর্শ ক'রে সর্বান্তকরণে আনন্দাশ্রুসিক্তনয়নে যাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে মহাতৃপ্ত হন,[১৩] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাঁকে বন্দনা করেন, সনকাদি ঋষিগণ যাঁকে ধ্যান করেও অন্ত লাভ করতে পারেন না, বেদ পুরাণ যাঁর যথাযথ অর্থ নিরূপণে অপারগ,[১৪] দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় অপরাধকৃত কর্মফলে অর্জিত ভয়ানক পাপরাশির কবল হতে মুক্ত হবার

১২। বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পদস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা।। ভা ১০।২৭।২

১৩। দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং নত্বা মুদশ্রুজলৈরকৃতাভিষেকম্
ভা ১০।১৩।৬২

১৪। ব্রহ্মেশশেষাদিভিরেব বন্দ্যাং ধ্যানৈরসাধ্যং সনকাদিভিশ্চ।
বেদৈঃ পুরাণৈর্নিরূপিতঞ্চ ভজস্ব ভক্ত্যা নবনীতচৌরম্।।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১১১।৬১

মানসে যাঁর শ্রীপাদপদ্মে আকুল প্রার্থনা জানান, যাঁর হাতে মৃত্যু হবে জেনে পিতামহ ভীষ্মের মত মহামহিম চরিত্র জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,[১৫] বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যাঁকে পরমতম ভক্তিতে ছায়াবৎ অনুসরণ করেন, কুন্তীর মত মহীয়সী নারী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিশ্রদ্ধার পারিজাত অর্পণ ক'রে সর্বান্তকরণে যাঁর প্রশস্তি-গান করেন সেই পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় গোপীদের সঙ্গে স্থূল অর্থে রতিক্রিয়া ও রমণকার্য করবেন এহেন অতীব সঙ্কীর্ণ ও কদাচারী চিন্তাধারা শিক্ষিত মানবকুলের নিকট থেকে অপ্রত্যাশিত।

সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সামাজিক অবস্থানটি কেমন ছিল সেটি একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে একবার বুঝে নেওয়া যাক। অকুস্থল চক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভাস্থল। উপস্থিত আছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত সর্বশ্রেষ্ঠ বিদগ্ধজন ও রথী-মহারথীগণ যথা-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, শুক্রাচার্য, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন, অকৃতব্রণ, দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, কৃপাচার্য, মহামতি বিদুর, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশংকর, দেবরাজ ইন্দ্র, সিদ্ধগণ, গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধরগণ, মুনিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, সপত্নীক বড় বড় নৃপতিগণ প্রভৃতি। এই মহতী সভায় এত সব বিদগ্ধজনেদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রাপক হিসাবে নির্বাচিত হলেন কে? নিঃসংশয়ে ও সর্বসম্মতভাবে তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এখানে একটি খুব সঙ্গত প্রশ্ন থেকে যায়। এতসব মহা উন্নত চরিত্রের অধিকারী বিদগ্ধজন একবাক্যে এবং পরম হৃষ্টচিত্তে ঐ রকম একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ

১৫। এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস। নমস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ। রথোত্তমাৎ ভূশরণ্য সংখ্যে।।
মহাভারত, ভীষ্মপর্ব

("হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! আগমন কর। হে খড়্গাধারিন্! হে শার্ঙ্গপাণে! হে গদাধর! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতশরণ্য! হে লোকনাথ! আমাকে অবিলম্বে রথ হইতে পাতিত কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে সংহার করিলে আমার ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ ও ত্রিলোকমধ্যে প্রভাব প্রথিত হইবে।"—কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ)

সভার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রাপক হিসাবে কেন নির্বাচিত করলেন শ্রীকৃষ্ণকে যদি তিনি হন পরম পরস্ত্রীলোলুপ এবং চরম রিরংসা পরায়ণ? এরকম একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে এই শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত বিদগ্ধজনদের একজনও কেউ প্রতিবাদে মুখর হলেন না? বস্তুত কেউ যে কেবল এর বিরোধিতা করেন নি শুধু তাই নয়, উপস্থিত সকলে শ্রীকৃষ্ণকে সভার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রাপক হিসাবে নির্বাচিত করার নিমিত্ত সহদেবের প্রস্তাবকে সাধুবাদ জ্ঞাপন ক'রে সর্বসম্মতভাবে প্রবল সমর্থন করেন।[১৬] এর দ্বারা এটিই প্রতিষ্ঠিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সীমাহীন উন্নত ও পরম পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যার স্থান ছিল উপস্থিত অন্য সকলের চারিত্রিক গুণাবলীর অনেক উর্ধ্বে। মহাভারতে এই একই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে আহুত সভায় শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রাপক হিসাবে নির্বাচিত করার সময় কি বলা হয়েছে সেটি দেখে নেওয়া দরকার। এই সভায় পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করলেন "সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ" পাত্রকে অর্ঘ্য প্রদানের আয়োজন করতে। এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কাকে অর্ঘ্যদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন। প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকেই যথাযোগ্য পাত্র বিবেচনা ক'রে বললেন, "যেমন জ্যোতিষ্ক সমুদয়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্বাতিশায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ; যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্যরশ্মিসমাগমে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্বাত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে; অতএব তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করাই কর্তব্য।" যাঁর সম্পর্কে সমাজের প্রমুখ ব্যক্তিদের এরূপ মহান মূল্যায়ন সেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পরস্ত্রীলোলুপতার মতো জঘন্য দোষ ছিল এহেন কল্পনা জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে। অবশ্য কেউ যদি এ মত পোষণ করার মতো দুঃসাহস করেন যে

১৬। ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ।।
ভা ১০।৭৪।২৫

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশংকর আদি বিশিষ্টজনেরাও একই দোষে দুষ্ট ছিলেন তাহলে বিষয়টি স্বতন্ত্র। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেই সভায় কেউই যে সহদেবের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নি এমন নয়। সেই সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে একজন এর ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ ক'রে তীব্র ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কালিমালেপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলো। সে পাপী দুর্বৃত্ত শিশুপাল। কিন্তু সভায় উপস্থিত কোন বিশিষ্টজন তাকে সমর্থন তো করনেই নি, বরং তার মতো পাপীর মুখ থেকে যাতে কৃষ্ণ নিন্দা না শুনতে হয় তার জন্য নিজ নিজ কর্ণ আচ্ছাদন ক'রে শিশুপালকে সমবেতভাবে তিরস্কার করতে করতে সক্রোধে সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।[১৭] এখন প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণের জন্মের হাজার হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বর্তমান যুগের মানুষ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্পর্কে ঐ সব অতি বিশিষ্ট ও সিদ্ধপুরুষগণের মনোভাবকে মান্যতা দেবে নাকি শিশুপালের মত একজন পাপী নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষের মতকে গ্রহণ করবে? নিঃসন্দেহে যাদের চরিত্র পবিত্র উৎকর্ষতাপূর্ণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অমলিন চরিত্রকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করবেন, আর যাঁদের চরিত্র 'শিশুপালত্ব' দোষে দুষ্ট তাঁরা শিশুপালসুলভ ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের দোষ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবেন। এতে আর বিচিত্র কি?

অপরপক্ষে গোপিনীদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদের সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। গোপীগণও এমনই স্বর্গীয় পরমপবিত্র সত্তা যাঁদের অমলিন রাসলীলা দর্শনের জন্য ব্রহ্মা, মহেশ্বর, নারদ, উদ্ধব, অর্জুনাদি ভক্তগণ পরমপবিত্র চিত্তে অকুস্থলে অবস্থান করেন এবং অনসূয়া, সাবিত্রী প্রভৃতি মহিমময়ী পরম পতিব্রতা দেবীগণ গোপিনীদের চরণধূলির উপাসনা করেন। কাজেই তাঁরাও যে শ্রীকৃষ্ণকে পাপকর্মে প্ররোচিত করবেন এধরণের ধারণাও হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে।

ব্রজগোপীদের অবিসংবাদি চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে এদেশের তরুণ

১৭। ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎসভাসদঃ।
কর্ণৌ পিধায় নির্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা।।
ভা ১০।৭৪।৩৯

সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন, "প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি, তখনই কেবল তোমরা গোপীপ্রেম কি, তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যত দিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তত দিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম-কাঞ্চন-যশোলিপ্সার বুদবুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপী-প্রেম-শিক্ষা, এমন কি, দর্শনশাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতার সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা—ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান। এখানে গুরু, শিষ্য শাস্ত্র, উপদেশ, ঈশ্বর, স্বর্গ, সব একাকার। ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র নাই; সব গিয়াছে, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারে আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। তখন তিনি সর্ব্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তার নিজের মুখ পর্য্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।"

আসলে রাসলীলা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয় নয়। এ হল ভগবানের দিব্য চিন্ময়ী লীলা, সমস্তটাই ভগবানের দিব্যদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানসিক অনুভবের বিষয় যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না, যার সবটাই শ্রীভগবানের লীলানন্দ ভোগের উদ্দেশ্যে স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে সৃষ্ট মায়াচিত্র মাত্র। কিঞ্চিৎ যত্নসহকারে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর পূর্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের একটি পদ লক্ষ্য করলে বিষয়টির সত্যতা দিনের আলোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে ভাগবতকার লিখেছেন যে শরৎকালের প্রস্ফুটিত-মল্লিকা-কুসুম-শোভিত সেই রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ লীলামগ্ন হতে ইচ্ছুক হলেন। এখানে একটি খুব সঙ্গত প্রশ্ন উঠে আসে। মল্লিকা তো গ্রীষ্মের পুষ্প। তাহলে হঠাৎ শরৎঋতুতে প্রস্ফুটিত মল্লিকার দ্বারা প্রকৃতি-পরিবেশ সুশোভিত হবার প্রসঙ্গ আসে কিভাবে? ভাগবতকার সম্পূর্ণ সচেতন ভাবেই কিন্তু শরৎঋতুতে

প্রস্ফুটিত মল্লিকার উপস্থিতির কথা বলেছেন। প্রকৃত কথা হল এই যে সমগ্র রাসলীলাটি যেহেতু বাস্তব চিত্র নয়; গোপীসহ সমস্ত রাসলীলাটাই শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাবে সৃষ্ট মায়াচিত্র মাত্র, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া প্রভাবে তাঁর প্রিয় মল্লিকার মায়াপুষ্পও সৃষ্টি করেছিলেন। এইভাবে শরৎঋতুতে প্রস্ফুটিত মল্লিকার উপস্থিতির কথা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করে যে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র রাসলীলা একটি অপ্রাকৃত বিষয় যা জড়জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা নয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় প্রতিবিম্ব গোপীদের সঙ্গে যে রাসলীলা জড়জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ছিল না, সেই বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তাঁকে ইন্দ্রিয়দোষে দুষ্ট ব'লে অভিযুক্ত কি আদৌ সমীচীন?

এই নৃত্যানুষ্ঠান সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের তেত্রিশতম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে দেখি যে শ্রীকৃষ্ণের সেই অপূর্ব রাসলীলা দর্শনের জন্য দেবতাগণ আহ্লাদিতচিত্তে সস্ত্রীক শত শত বিমানে আকাশ ছেয়ে ফেলেন এবং অনুপম সেই রাসলীলা দর্শন ক'রে আনন্দে উল্লসিত হয়ে গোপীসহ শ্রীকৃষ্ণের উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করেন।[১৮] কাজেই একথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে সকলের পরম শ্রদ্ধার আসনে সমারূঢ় একজন কেউ, অসংখ্য পুরনারীগণের সঙ্গে সর্বসমক্ষে কদর্যকর্মে লিপ্ত হবেন আর দেবতা নামধারী এক অতি উচ্চস্তরের সম্প্রদায় মহানন্দে তা চাক্ষুষ করার জন্য সস্ত্রীক অকুস্থলে ভিড় জমাবে। সেই যুগের অধিবাসী যাদের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদির চূড়ান্ত উৎকর্ষতা ঘটেছিল, যার ধারে কাছে যাবারও যোগ্যতা বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সমাজের নেই, এত হীন ধারণা তাদের সম্পর্কে পোষণ করা নিতান্ত মূঢ়তা ছাড়া কিছুই নয়। কৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যে কোন গোপনীয়তা, কলুষতা বা গ্লানি ছিল না। এই নৃত্য প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের তেত্রিশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীধর বলেছেন,

১৮। যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্ বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মানাম্।।৪
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্।।৫

"তৎ তস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অমলং নির্ম্মলং যশো জগুরিতি।" অর্থাৎ রাসলীলা তৎকালীন সমাজে নির্মল প্রমোদের অঙ্গ ছিল। অতএব অজ্ঞতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এইসব বিভিন্ন দিকের অপব্যাখ্যা ক'রে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের প্রয়াস নিতান্ত নিন্দার্হ।

শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার রমণীয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্।।

ভা ১০।৪৭।৬০

"রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের কণ্ঠে নিজের বাহুদণ্ড সংস্থাপন করে এঁদের মনোরথ পূর্ণ করেছিলেন। ভগবানের যে কৃপাপ্রসাদ, যে পরমানুরাগ এঁরা লাভ করেছিলেন, ভগবানের প্রতি একান্ত প্রণয়শালিনী, তাঁর বক্ষঃস্থলনিবাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তা প্রাপ্ত হননি। তাঁর পূজারিণী কমলকান্তি কমলগন্ধা দিব্যাঙ্গনারাও তা লাভ করতে সমর্থ হন নি, অন্য নারীদের তো কথাই নেই।"

অর্থাৎ সেই রমণীয় মুহূর্তে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলায় রত হলেন তখন তিনি সমবেত গোপনারীগণের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে তাঁদের স্কন্ধদেশে হস্ত সংস্থাপনপূর্বক তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। একশ্রেণীর মানুষ যাঁরা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্কলেপনের জন্য তাঁর ছিদ্রান্বেষণে সতত মনোযোগী, তাঁরা এর মধ্যে আদিরসের গন্ধ পান। তাঁদের বক্তব্য—যদি শ্রীকৃষ্ণ জিতেন্দ্রিয় পরমপুরুষ হন তাহলে তিনি কেন পরস্ত্রী গোপনারীদের অঙ্গস্পর্শ করবেন।

প্রশ্নটি সঙ্গত হতে পারে, কিন্তু বিষয়টির ভিতরে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা সম্যক বোধগম্য হলে তাঁদের অন্তর থেকে এ ধরণের ভ্রান্ত সংশয় দূর হয়েযাবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীগোস্বামী তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' গ্রন্থে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঐ সমস্ত গোপনারীগণকে রক্ত-মাংসের মানবী ব'লে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ঐ সমস্ত গোপনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিৎ শক্তি হতে উৎপন্ন আনন্দমূর্তি। শ্রীল শ্রীজীগোস্বামীর কথায়—

"ন চ সুরস্ত্রীণাং সম্ভব-বাক্যং শ্রী-মহিষী-বৃন্দ-পরং তাসাম্ অপি তৎ নিজ-শক্তি-রূপত্বেন দর্শয়মানত্বাৎ।" অতএব এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার মধ্যে গ্লানির কিছুই ছিল না; শ্রীভগবান কথিত 'অজ্ঞানতা'র কারণেই মূঢ়মতি মানবের এই দৃষ্টিভ্রম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে তিনি স্বয়ং বলেছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।

"অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ না জানায় অব্যক্ত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে।"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দেবী সরস্বতী অতি রমণীয় ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের মধুর রাসলীলার এক অতীব মনোজ্ঞ বর্ণনা করেছেন—

রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্।।
রাসেশ্বরং রাসকরং বরং রাসেশ্বরীশ্বরম্।
রসাধিষ্ঠাতৃদেবঞ্চ বন্দে রাসবিনোদিনম্।।
রাসয়াসপরিশ্রান্তং রাসবাসবিহারিণম্।।
রাসোৎসুকানাং গোপীনাং কান্তং শান্তং মনোহরম্।

সুতরাং তৎকালীন সমাজে রাসলীলা আদৌ নিন্দনীয় ছিল না, বরং এটি সমাজের একটি সর্বজন স্বীকৃত পরম আদরণীয়, রমণীয়, শুদ্ধ ও পবিত্র ক্রীড়ানুষ্ঠান ছিল।

রাসলীলার পবিত্রতা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী যে মধুর ভাষায় একটি শ্লোকে অপূর্ব মন্তব্যটি করেছেন তা সকলের প্রণিধানযোগ্য—

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়-দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপী-রাসমণ্ডলমণ্ডনঃ।।

—ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত ক'রে কামাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা কন্দর্পের যে দর্প হয়েছিল, সেই দর্পকে যিনি নাশ করেছিলেন সেই গোপীজনবল্লভের জয় হোক।

কথিত আছে কামের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা মদনের উন্মাদনায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, চন্দ্র সকলেই তার কাছে পরাভব স্বীকার করেছিল। তারপর কন্দর্প মহাদেবকে বশীভূত করার চেষ্টা করতে উদ্যত হলে ক্রুদ্ধ মহাদেব তাকে দগ্ধ করেন। কিন্তু তাতেও তার মনে হয় মহাদেব তাকে পরাস্ত করতে পারেন নি। বরং তার শরীর দগ্ধ হওয়ায় অনঙ্গ হয়ে তার শক্তি আর বর্ধিত হয়েছে। ফলে তার দর্প অনেক গুণে বেড়ে যায় এবং মূঢ়তা বশতঃ শ্রীহরিকে প্রভাবিত করতে প্রয়াসী হলে শ্রীহরি তাকে নাশ করেন। সুতরাং যিনি কামের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাকেই নাশ করতে পারেন তাঁর পক্ষে কামের বশীভূত হওয়ার বিষয় কারও কল্পনা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

তাই যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যে পরদার-বিনোদনের তত্ত্বকে সমর্থন করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনত্রিশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় একটি নিষেধের বাণী উচ্চারণ করেছেন—'মৈবম্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অমলিন চরিত্র সম্পর্কে মূঢ়তা বশতঃ একবার কলুষতাপূর্ণ মন্তব্য করছেন, তার যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়।

সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য হল আপাতদৃষ্টিতে সমরূপ কর্মকারীগণকে সমশ্রেণীভুক্ত ক'রে ফেলা। তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের আপাত মানবসুলভ লীলাসমূহ প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁকে সাধারণ মনুষ্য পর্যায়ভুক্ত ব'লে বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধরণের চিন্তাধারা যে কত ভ্রান্ত তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থে—"শ্রীধরস্বামী পূর্বপক্ষকে (যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে মলিনতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী) বলিতেছেন যে, আপনি মূঢ় বলিয়া যোগমায়া-সমাবৃত শ্রীভগবানকে চিনিতে পারিতেছেন না। মায়াবৃত জীবের কার্য ও যোগমায়া-সমাবৃত শ্রীভগবানের কার্য একই রূপ দেখিতেছেন। জেলখানার কয়েদী ও জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে একই কারাগৃহে দেখিয়া আপনি উভয়কে একই পর্যায়ভুক্ত মনে করিতেছেন। মর্ত্যবাসী জীবকে ও অমৃতলোক হইতে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ ঈশ্বরকে একই দশাপন্ন মনে করিয়া যা খুশী তাই মন্তব্য করিতেছেন।" আবার অন্যত্র বলেছেন—"শ্রীধরস্বামী পূর্বপক্ষকে বলিতেছেন যে, আপনি ভুল করিতেছেন। অভাবগ্রস্ত এক পথের কাঙাল ভিক্ষা করিতেছে, আর শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা

করিতেছেন—এই দুইকে আপনি একই প্রকার মনে করিতেছেন। পথের কাঙাল অভাবের তাড়নায় ভিখারী আর বুদ্ধদেব জ্ঞানের ও করুণার পরিপূর্ণতায় ভিখারী। দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অসীম। ইন্দ্রিয়ারাম জীবের ভোগময় কার্য ও আত্মারামের বিহার-কার্য সমপর্যায়ে দেখা মূঢ়তার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।" শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের চির-অমলিন সত্ত্বার এতদপেক্ষা অধিক উপযুক্ত ব্যাখ্যা আর বোধকরি হতে পারে না।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্বয়ং মহারাজ পরিক্ষিতের মনেও একবার এধরনের সংশয় জেগেছিল—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।।
স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্।।

(ভা ১০।৩৩।২৭-২৮)

—হে ব্রাহ্মন্! জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশার্থে অংশের সহিত অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই তিনি যিনি ধর্মমর্যাদার বক্তা, কর্তা ও রক্ষক কিভাবে ধর্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী-সংসর্গ করেছিলেন?।।২৭।।

—হে সুব্রত! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হয়েও এই নিন্দিত কর্ম কোন অভিপ্রায়ে করেছিলেন আমার এই সংশয় দূর করুন।।২৮।।

অর্থাৎ পরিক্ষিতের মনে বদ্ধমূল ধারণা যে শ্রীকৃষ্ণ এই কদর্য কর্ম করেছিলেন। কিন্তু শুকদেবের মুখে তিনি দীর্ঘ সময় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলামাহাত্ম্য শ্রবণ করেছেন যা তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণার জন্ম দিয়েছে। ফলে একদিকে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর সুউচ্চ ধারণা অন্যদিকে তাঁর এহেন কদর্য কর্ম—এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়ের সহাবস্থানের কারণ কি এই গূঢ় প্রশ্ন তাঁর মনে এক গভীর সংশয় সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু পরিক্ষিতের সম্ভবত এহেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কৌতূহল বোধহয় শুকদেবের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতসম ব'লে মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়ে মহারাজ পরিক্ষিতের মুখনিঃসৃত এধরণের মূঢ়তাপূর্ণ প্রশ্ন শ্রবণ ক'রে শুকদেব সম্ভবত যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাই তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজাকে সম্বোধন করতে বিস্মৃত হলেন। ইতিপূর্বে মহারাজের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় মহারাজা পরিক্ষিৎকে 'নৃপ', 'রাজন' প্রভৃতি সম্বোধনে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু এইবার তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল। কোন রকম সম্বোধন ব্যতীতই শুকদেব হয়ত বা কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে যা উত্তর দিলেন তা একথায় অভূতপূর্ব—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা।।
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।

(ভা ১০।৩৩।৩০-৩১)

কি অপূর্ব! শ্রীকৃষ্ণের অমলিন, চিরপবিত্র, অকলঙ্ক চরিত্র-সত্ত্বা এবং গুরুভার কাজের ওজনকে উপযুক্ত রূপে বহন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে সম্যক রূপে উপস্থাপিত করার এতদগপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা আর কি হতে পারে। পরিক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যা বললেন তার অর্থ হল—অগ্নি সর্বভুক হলেও তাতে লিপ্ত হয় না। তেমনই তেজস্বী ব্যক্তিগণেরও ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন ও সাহস দেখা গেলেও তা দোষণীয় নয়। যারা অতেজস্বী তাদের এধরনের কর্ম কল্পনা করাও উচিৎ নয়। কারণ মহাদেব ব্যতীত অন্য কেউ হলাহল পানের মূঢ়তা প্রকাশ করলে তা নিশ্চিতভাবে তার বিনাশের কারণ।

দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরম পবিত্রতা সম্পর্কে বলেছেন—

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং বসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্।।

ভা ১০।৭০।৪৪

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনমঙ্গল। তাঁর নির্মল কীর্তি স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে দিক হতে দিগন্তরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ যেন তাঁর চরণধারাসম সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে স্বর্গে

মন্দাকিনী নামে, মর্ত্যে গঙ্গা নামে এবং পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করে চলেছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬/১১ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি—"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" অর্থাৎ তিনি সাক্ষী (সাক্ষাৎদ্রষ্টা), তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ রহিত বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্ত্বা।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যাবতীয় গ্লানিকর চিন্তা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অজ্ঞতার ফসল। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অতীব গূঢ়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে একথাই প্রকাশ করেছেন—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্।" একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে একজন বিশ্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদের অন্তরে সুউন্নত পদার্থবিদ্যার যে দুরূহ তত্ত্ব সঞ্চিত আছে তা একজন শিশু বা নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে বর্ণনাতীত ভাবে দুর্জ্ঞেয়। শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলীর বিকৃত ব্যাখ্যায় যারা সদা উন্মুখ, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মনীষা, দার্শনিকতা প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের শত সহস্রযোজন নিকটেও পৌঁছানোর যোগ্যতা তাদের নেই। তাই তাদের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এবম্প্রকার অবমূল্যায়নের উন্মেষ ঘটে থাকে। প্রকৃত রসবোধ ভিন্ন তাঁর গূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা করাও পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন—"বুঝিবে রসিকজন না বুঝিবে মূঢ়।"

শ্রীকৃষ্ণ তো অনন্ত লীলাময়। কিন্তু তাঁর এই সমস্ত লীলার পিছনে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কিছু ছিল না যদিও কোথাও কোথাও তা ছিল অতিমানবিক। সাধারণ মানুষ যা পারে না, তিনি তাই পেরেছিলেন। আর সেকারণেই তিনি পরমপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি স্বাভাবিক লীলাসমূহকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা! তুমি কি সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করতে পারো? পারো না। কিন্তু হয়ত তোমার চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যাটি তা পারে। তুমি কি এভারেস্ট শৃঙ্গারোহণ করতে পারো? পারো না। কিন্তু হয়ত তোমার পাড়ার ক্লাবের শীর্ণকায় অষ্টাদশবর্ষীয় ছেলেটি তা পারে। তুমি কি রকেট আরোহণ করে চন্দ্রাভিজান করতে পারো? পারো না। কিন্তু হয়ত তোমার পার্শ্ববর্তী কোন

রাজ্য বা দেশের একটি মেয়ে তা পারে। তুমি কি নিরস্ত্র অবস্থায় কেবলমাত্র চপেটাঘাতের সাহায্যে একাকী দশ/বিশ জন সশস্ত্র লোককে ধরাশায়ী করতে পারো? পারো না। কিন্তু জাপানী কোন ক্যারাটেবিদ তা অনায়াসেই পারে। তুমি কি বিশালাকায় বিমান চালিয়ে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত যেতে পারো? পারো না। কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ জামাতাটি হয়ত তা পারে। তুমি কি দড়ি বেঁধে দাঁতে টেনে একটি আস্ত ওয়াগনকে স্থানচ্যুত করতে পারো? পারো না। কিন্তু তোমার চোখের সামনেই অপর একজন তা পারে। তুমি কি দুটি খুঁটিতে বাঁধা রজ্জুর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারো? পারো না। কিন্তু তোমারই সামনে রাস্তার পঞ্চবর্ষীয়া ভিখারী বালিকাটি তা অনায়াসেই তা পারে। তুমি কি আপন স্ত্রীকে পরম পবিত্র ভাব নিয়ে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে পারো? পারো না। কিন্তু পরম পূজনীয় পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তা পারেন। প্রকৃতপক্ষে যা শাশ্বত, যা পরম সত্য তার কোনকিছুই তুমি পারো না। তুমি কেবল একটি বিষয়েই পারদর্শী আর তা হল মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে নিতান্ত অসংযমী আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের মাধ্যমে মহাপাপে কলুষিত জীবন অতিবাহিত করতে এবং যা কিছু তোমার ক্ষমতাতীত ও পরম সত্য তাকে অস্বীকার করতে। তুমি অন্ধকারের জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাই তুমি অনৈতিক পথে অর্থোপার্জন এবং অপরিমিত আহার, নিদ্রা ও মৈথুনকে আসল সত্য ভাব আর শ্রীকৃষ্ণের পাবন নির্মল লীলাকে অস্বীকার, উপহাস করো এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র শ্রীঅঙ্গে কলঙ্ক লেপন কর। তোমাদের উদ্দেশ্যে তাই কঠোপনিষদের সেই অমর বানী উচ্চারণ করে বলতে হয়—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—ওঠো, জাগো, যাকিছু শাশ্বত, যাকিছু সত্য সেই সমুদায়কে জানার জন্য অগ্রসর হও। বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি মহাগ্রন্থে পরম সত্যের যে মহামূল্য আকর নিহিত আছে তার অন্বেষণ কর।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের মতই শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রও প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে Rev. K. M. Benerjea 1885 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রম্' গ্রন্থের ভূমিকাতে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, ''The Nārada-pāncha-ratra is one of the oldest, if not the very first, specimen of Vaishnava literature in Sanscrit. The only work which can contest the palm of seniority with it is the Bhāgavata Purāṇa, commonly known by the name of the Śrībhāgavata.''

ব্যাসদেব বর্ণিত শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনীর কোন বিবরণ নেই। এখানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে কৃষ্ণপ্রাণ বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অতি আদরের, ভালোবাসার, শ্রদ্ধার, ভক্তির চিত্র যার প্রভার কাছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্যুতিও যেন কখনও কখনও অমৃতভাণ্ডে আচ্ছাদিত চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় তদীয় সত্ত্বা নিঃসৃত অনিন্দ্য চন্দ্রকিরণজালের স্পর্শে দ্রবীভূত হয়ে যায়, যার প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে অনুপস্থিত। সেটি হল শ্রীরাধিকার উপাখ্যান। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই নয়, শ্রীরাধার নাম মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীরাধিকার নাম প্রথম পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।

বস্তুত, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থে শ্রীরাধিকার বিবরণ এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব যেন শ্রীরাধিকার চেয়ে ম্লান হয়ে পড়েছে। এবিষয়ে শ্রী কৃষ্ণগোপালগোস্বামিশাস্ত্রি মহাশয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্' গ্রন্থের ভূমিকাতে যে মত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, ''নারদপঞ্চরাত্রে রাধাতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাধান্য পাইয়াছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধিকার প্রাধান্য দান করা হইয়াছে।

কথিত হইয়াছে—ঈশ্বর দ্বিধা বিভক্ত হইলে রাধা তাঁহার বামাঙ্গসম্ভূতা হইয়া আবির্ভূতা হন। প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীরাধাও সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপা ও প্রকৃতির পরস্থিতা। হরির ন্যায় তিনিও নিত্যা ও সত্যস্বরূপা। তিনি যমুনাপুলিন বৃন্দাবনের পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিত রাসমণ্ডলমধ্যে রাসক্রীড়া করিয়া রাধানাম সার্থক করেন—'তদ্রাসে ধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা'[১৯]। স্বয়ং পার্বতী যে বৃন্দাবনকাননে রাসমহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলবিহারিণী রাধিকা এবং বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণ পাদপদ্ম পরিচর্যায় তৎপরা মহালক্ষ্মী—এই তথ্যও আলোচ্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।[২০] সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক বন্দ্যা। স্বয়ং রাধাকান্ত শ্রীরাধিকার অনুগামী ও শ্রীরাধা তাঁহার ধ্যেয়। রাসকেলির মহোৎসবে শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধাচর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণে পরম প্রীতি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সুচিরকাল আরাধনায় যে অভীষ্ট লাভ হয়, শ্রীরাধিকার স্বল্পকালমাত্র আরাধনায় তৎসমস্ত অধিগত হয়।''

কিন্তু শ্রীরাধিকাকে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এত গুরুত্ব দেওয়া হলেও শ্রীমদ্ভাগবতে গ্রন্থকার একবারের জন্যও সেই শ্রীরাধিকার নাম উচ্চারণ করেন নি। শুধু গ্রন্থকারই নয়, শ্রীমদ্ভাগবতে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত উপস্থিত অসাধারণ বা সাধারণ কোনও চরিত্রই একবারের জন্যও শ্রীরাধিকার নাম বা প্রসঙ্গ মুখে আনেন নি। অথচ উভয় গ্রন্থের রচয়িতা একই ব্যক্তি—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আর সংশয়টা এইখানেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্র' উপস্থাপনের ইতিহাসটি জেনে নেওয়া যাক।

কাল দিবাভাগের কোন একটা সময়। স্থান পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ ভারতবর্ষের সিদ্ধ ও সুপুণ্যপ্রদ নারায়ণক্ষেত্রের নারায়ণাশ্রম। চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে আছে অগণ্য হরিৎ বর্ণ বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-তৃণরাজি। সতত সঞ্চরণশীল অরণ্য-কুসুমের সুবাস বহনকারী মৃদুমন্দ মলয়-পবন। বৃক্ষের শাখায় শাখায়, লতাবিতানে নির্ভয়, নিঃশঙ্ক বিহগকুলের কলগুঞ্জন। পুষ্পে পুষ্পে প্রজাপতি-অলিকুল-

১৯। Nārada-pancha-rātra 1/12/62

২০। তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা।। তত্রস্থ ১/১২/৫৫

ভ্রমর-ভ্রমরীদলের নিঃশব্দ পক্ষ সঞ্চালন, সরোবর-সলিলে পতিত ভাসমান শুভ্র মেঘবালিকাদের ছায়াচিত্র আর সদাহাস্যময় অরুণের মনোমুগ্ধকর নয়নলোভন উজ্জ্বল অরুণিমা। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অন্তর আজ স্নিগ্ধ, প্রশান্ত। এইক্ষণে তিনি এক বটবৃক্ষমূলে সুখাসনে উপবেশন ক'রে নিবিষ্টচিত্তে অবিরাম জপ ক'রে চলেছেন দুই অক্ষরবিশিষ্ট একটি মহামন্ত্র—'কৃষ্ণ'। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন তাঁর পুত্র অপাপবিদ্ধ, আজন্ম উর্ধ্বরেতা মহাজ্ঞানী মহর্ষি শ্রীশুকদেব। তাঁর অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে আছে সর্বশাস্ত্রসার এক পরম দুর্জ্ঞেয় সত্য ও পরকল্যাণকারী শ্রীকৃষ্ণের পরম পুণ্যদ বৃত্তান্ত জানার অদম্য কৌতুহলে। তিনি সম্যক জানেন তাঁর সেই কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাতে পারেন একমাত্র সর্ববেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম তাঁর পিতা ব্যাসদেব। তাই তিনি প্রাথমিক সৌজন্য জ্ঞাপন ক'রে পিতাকে বললেন—

''ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদাঙ্গপারগ।
যদ্যৎপ্রকারং জ্ঞানঞ্চ নিগূঢ়ং শ্রুতিসম্মতং।।১৬।।
তেষু যৎ সারভূতঞ্চাপ্যজ্ঞানান্ধপ্রদীপকং।
তত্তৎ সর্বং সমালোচ্য মাং বোধয়িতুমর্হসি।।১৭।।

নারদপঞ্চরাত্র ১ম রাত্রে প্রথম অধ্যায়

—''হে ভগবন্ আপনি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের পারদর্শী অপিচ সকল তত্ত্বই অবগত আছেন। অতএব শ্রুতিসম্মত নিগূঢ় জ্ঞান কতপ্রকার? তন্মধ্যে যাহা সারভাগ অজ্ঞানান্ধের প্রদীপস্বরূপ, তৎসমূহ সমালোচনা পূর্ব্বক আমার বোধগম্য করাইতে আপনিই সমর্থ।'' (শ্রী কৃষ্ণগোপালগোস্বামিশাস্ত্রিকৃত অনুবাদ)

পুত্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পিতা তাঁকে তাঁর ইপ্সিত পবিত্র পরম জ্ঞান শ্রবণ করাতে আরম্ভ করলেন। আখ্যানের শুরুতে তিনি বললেন—

''প্রাণাধিকপ্রিয়ং শুদ্ধং পরং জ্ঞানামৃতং শুভং।
পুরো কৃষ্ণো হি গোলোকে শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।।৩৫।।
সুপূণ্যে বিরজাতীরে বটমূলে মনোহরে।
পুরতো রাধিকায়াশ্চ ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং।।৩৬।।''

নারদপঞ্চরাত্র ১ম রাত্রে প্রথম অধ্যায়

—''ইহা প্রাণাধিক প্রিয় এবং শুভময় ও পরম জ্ঞানামৃত স্বরূপ; পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে সুপবিত্র বিরাজাতীরে মনোহর বটমূলে শ্রীরাধিকার সম্মুখে কমলযোনি ব্রহ্মাকে ইহা বলিয়াছিলেন।'' (শ্রী কৃষ্ণগোপালগোস্বামিশাস্ত্রিকৃত অনুবাদ)

পরবর্তী আলোচনার প্রয়োজনে উপরের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র আখ্যানের শুরুতে স্বয়ং ব্যাসদেব তাঁর পুত্রকে বলছেন যে এই আখ্যানটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন শ্রীরাধিকাকে।

আবার এই গ্রন্থের ২য় রাত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪-১০ সংখ্যক শ্লোকে পরিলক্ষিত হয় সেই ব্যাসদেবের মুখ থেকে মহাদেবের উক্তি ব'লে নির্গত হয়েছে শ্রীরাধিকার কি অসীম গুরুত্বের কথা। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সংশ্লিষ্ট মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হল—

''নারায়নেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।
সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যতমে প্রত্যক্ষং মম সন্নিধৌ।।৪
তত্রোক্তং হরিণা সার্দ্ধং শুশ্রাব কমলোদ্ভবঃ।
শুশ্রুবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে চেদমেব পরং বচঃ।।৫
আদৌ সমুচ্চরেদ্রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
বিপরীতং যদি পঠেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবং।।৬
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণে মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী।।৭
দৈবদোষেণ মহতা যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং।
বামাচারাশ্চ মূর্খাশ্চ পাপিনশ্চ হরিদ্বিষঃ।।৮
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ শতং।
ইহৈব তদ্বংশহানিঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে।।৯
ভবেদ্রোগী চ পতিতো বিঘ্নং তস্য পদে পদে।
হরিণোক্তং ব্রহ্মক্ষেত্রে ময়া চ ব্রহ্মণা শ্রুতং।।১০
ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোঽসেবন্ত নিত্যশঃ।
যৎপাদপদ্মনখরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সুস্নিগ্ধালক্তকরসং প্রেম্না ভক্ত্যা দদৌ পরা।।১২

রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা।।১৩

—"পূণ্যতম সিদ্ধক্ষেত্রে আমার সমক্ষে নারায়ণ কপিল মুনিকে বলিয়াছিলেন।৪। তথায় ব্রহ্মা ও হরি একত্র শ্রবণ করেন এবং সমস্ত মুনিগণও এই পরম বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন।৫। প্রথমে রাধা শব্দ উচ্চারণ করিবে, তৎপরে রমাপতি কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করিবে; যদি ইহার বিপরীত পাঠ করে তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়।৬। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, রাধিকা জগন্মাতা, পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে অধিক বন্দ্যা, পূজ্যা ও গুরুতমা হন।৭। যাহারা অত্যন্ত দুরদৃষ্টবশতঃ রাধিকার নিন্দা করে তাহারা বিরুদ্ধাচারী, মূর্খ, অতি পাপী ও হরিদ্বেষী।৮। তাহারা কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈলে ব্রহ্মার স্থিতিকাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে এবং ইহলোকেও তাহাদের বংশহানি ও সর্ব্বনাশ হয়।৯। সে রোগী ও পতিত হয় এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মক্ষেত্রে ইহা হরি বলিয়াছেন, আমি ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি।১০। সাধুগণ নিরন্তর ত্রৈলোক্যতারিণী রাধার উপাসনা করেন। কৃষ্ণও প্রত্যহ ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন।১১। পূর্ব্বে পবিত্র বৃন্দাবনের বনস্থলীতে কৃষ্ণ, ভক্তিভাবে ও প্রেমপরতন্ত্র হইয়া রাধার পাদপদ্মনখরে সুস্নিগ্ধ অলক্তক রস প্রদান করেন।১২। মধুসূদন রাধাচর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করেন। তাঁহারা দুইই এক; দুধ ও ধবলতায় যেমন প্রভেদ নাই তদ্রূপ তাঁহাদের কোন ভেদ নাই।"

উপরের অংশ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শ্রীরাধিকার উপর এবং এর বর্ণনা আমরা শুনছি স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেবের মুখ থেকে এবং তিনি এই বর্ণনা করেছেন তার প্রিয় পুত্র শ্রীশুকদেবের সম্মুখে যাঁর বিশ্ববন্দিত জ্ঞান ও চারিত্রিক গুণের কারণে পিতা হয়েও তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর কাছে পুত্র শ্রীশুকদেব 'আত্মজ্ঞানীশিরোমণি'[২১]। শৌনক ঋষির মতে শুকদেব—"নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ"[২২] এবং "আত্মারামঃ"[২৩]। ব্যাসদেব সম্যক জানেন পুত্র

২১। ভা ১/৩/৪১
২২। ভা ১/৭/৯
২৩। ভা ১/৭/১০

শুকদেব জগজ্জীবের কল্যাণে পিতার নিকট হতে লব্ধ এই পরম জ্ঞান বৃহত্তর জগতে প্রচার করবেন। তাহলে মহাদেবোক্ত শ্রীরাধিকার এহেন গুরুত্বকে তিনি অবশ্যই সঠিক ব'লে বিশ্বাস করেন। তা যদি সত্য হয় তাহলে একটি সহজ প্রশ্ন মনে আসে। সেটি হল এই যে যখন ব্যাসদেবের মত একজন মহর্ষি জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণের পূর্বে শ্রীরাধিকার পবিত্র নাম উচ্চারণ না করলে তা ব্রহ্মহত্যার পাপের সমতুল্য অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হবে, তা হলে তিনি তাঁর জীবনের পরমাকাঙ্ক্ষিত, অশান্ত হৃদয়ের নিবিড় অতৃপ্তির দহন নিবারণকারী পরম পবিত্র শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত বর্ণনার মধ্যে একবারের জন্যও শ্রীরাধিকার নাম উচ্চারণ করলেন না কেন? উপরের অংশে ব্যাসদেব একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সেটি হল রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। তাঁদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতই অবিচ্ছেদ্য যে তাকে ব্যাসদেব দুগ্ধের সঙ্গে তার ধবলতার তুলনা করেছেন। দুগ্ধকে যেমন তার ধবলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি কৃষ্ণ ও রাধিকাকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে ব্যাসদেব স্বমুখে একটি গ্রন্থে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পূতচরিত্র পুত্রের সম্মুখে একথা বলেছেন, তিনি কি ক'রে বৈষ্ণব শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা চিত্তহরণকারী, আপামর বৈষ্ণব ভক্তদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদরের ধন এবং তাঁর হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির অর্ঘ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সময় শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন? তাহলে ব্যাসদেবের মত একজন মহাত্মা একস্থলে এক প্রকার অন্য স্থলে ভিন্ন প্রকার কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন? তা হলে কি ব্যাসদেব দ্বিচারিতা করেছেন? মহর্ষি ব্যাসদেব সম্পর্কে এহেন ধারণা পোষণ করা পাপাচার ছাড়া কিছু নয়। তাহলে পৃথিবীর কাউকেই বিশ্বাস করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রায় একই সুরে কথা বলেছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ৫৪ অধ্যায়ের ১৭৮ থেকে ১৮০ সংখ্যক শ্লোকসমূহে নারদপঞ্চরাত্রের মতই শ্রীরাধিকার অসীম গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে—

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
প্রবদন্তি চ বেদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ।।১৭৮।।
বিপর্য্যং যে বদন্তি যে নিন্দন্তি জগৎপ্রসূম্।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকাং প্রেমময়ীং শক্তিঞ্চ রাধিকাম্।।১৭৯।।
তে পচ্চ্যন্তে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
ভবন্তি স্ত্রীপুত্রহীনা রোগিণঃ সপ্তজন্মসু।।১৮০।।

—অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করে তারপর 'কৃষ্ণ' কিংবা 'মাধব' নামোচ্চারণ করতে হবে। বেদ ও পুরাবিৎগণ এই নির্দেশ করেছেন। যে এর বিপরীতরূপে অর্থাৎ 'কৃষ্ণরাধা' এইরূপ উচ্চারণ করবে, কিংবা শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকা শক্তিস্বরূপিণী প্রেমময়ী জগজ্জননী শ্রীরাধিকার যে নিন্দা করবে সেই ব্যক্তি যে সময় পর্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য উদিত হবে, ততকাল কালসূত্র নরকে অবস্থান করবে এবং সপ্তজন্ম পুত্রবিহীন ও রোগগ্রস্ত হয়ে থাকবে।

এবার পদ্মপুরাণ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাক।

পদ্মপুরাণে শ্রীরাধিকার উপাখ্যান অন্তে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার উপর প্রীত হয়ে তাঁকে বৃন্দাবন-কাননে রানী পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। অন্যত্র তিনি দেবী লক্ষ্মী, কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি শ্রীরাধা—

বৃন্দাবনাধিপত্যং চ দত্তং তস্যাঃ প্রতুষ্যতা।
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবি তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।।

আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারায়ণ নারদকে বলেন যে শ্রীদামা রাধাকে অভিশাপ দেন যে রাধাকে মর্ত্যলোকে গিয়ে মানবীরূপ পরিগ্রহ করে ব্রজে ব্রজাঙ্গনা রূপে কালাতিপাত করতে হবে—

রাধাং শশাপ শ্রীদামা যা হি যোনিঞ্চ মানবীম্।
ব্রজে ব্রজাঙ্গনা ভূত্বা বিচরস্ব চ ভূতলে।।৬

শ্রীদামাশাপে বিদ্ধ শ্রীরাধিকা নিতান্ত ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন এবং নিবেদন করলেন যে শ্রীদামা তাঁকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়েছেন

মর্ত্যলোকে পতিত হয়ে তাঁকে ব্রজগোপীরূপ ধারণ করতে হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিনা তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর নিকট কৃষ্ণবিহীন ক্ষণকাল শতযুগের সমান। চক্ষুর এক পলকের জন্যও কৃষ্ণবিরহ তাঁর অন্তর নিবিড়ভাবে দগ্ধ হবে। কৃষ্ণই তাঁর আত্মা, মন, প্রাণ, দেহ, দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু। কৃষ্ণই তাঁর জীবনের পরম ধন। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণই স্মরণ করেন। তাঁর সেবা করা ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও তিনি জীবনধারণ করতে পারবেন না। তাহলে এহেন অবস্থায় তিনি কি করবেন তা যেন সকলের ভয়ভঞ্জন তাঁকে বলে দেন—

ভীতা শ্রীদামাশাপাৎ সা শ্রীকৃষ্ণং সমুবাচ হ।
গোপীরূপা ভবিষ্যামি শ্রীদামা মাং শশাপ হ।।৭
কমুপায়ং করিষ্যামি বদ মাং ভয়ভঞ্জন।
ত্বয়া বিনা কথমহং ধরিষ্যামি স্বজীবনম্।।৮
ক্ষণেন মে যুগশতং কালং নাথ ত্বয়া বিনা।
চক্ষুর্নিমেষবিরহাদ্ভবেদ্দগ্ধং মনো মম।।৯
ত্বমাত্মা মে মনঃ প্রাণা দেহমাত্রং বদাম্যহম্।
দৃষ্টিশক্তিশ্চ চক্ষুস্ত্বং জীবনং পরমং ধনম্।।১১
স্বপ্নে জ্ঞানে ত্বয়ি মনঃ স্মরামি ত্বৎপদাম্বুজম্।
তব দাস্যং বিনা নাথ ন জীবামি ক্ষণং বিভো।।১২

শ্রীরাধিকার এহেন ভীত-সন্ত্রস্ত কাতরোক্তি শ্রবণ ক'রে ত্রিভুবনের ভয়ভঞ্জনকারী পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন করে শুচিস্মিত হাস্য-মুখে শ্রীরাধিকাকে মাভৈঃ দান করে বললেন যে রাধিকার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য তিনি স্বয়ং মর্ত্যে গিয়ে জন্মগ্রহণ করে শ্রীরাধিকাকে সঙ্গ দেবেন এবং ব্রজধামে তাঁর সঙ্গে বিহার করবেন। তিনি থাকতে শ্রীরাধিকার এ ধরণের কোন আশঙ্কার কারণ নেই—

কৃষ্ণস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বোধয়ামাস সুন্দরীম্।
বক্ষসি প্রেয়সীং কৃত্বা চকার নির্ভয়াঞ্চ তাম্।।১৩

মহীতলং গমষ্যামি বারাহে চ বরাননে।
ময়া সার্দ্ধং ভুগমনং জন্ম তেঽপি নিরূপিতম্।।১৪
ব্রজং গত্বা ব্রজে দেবি বিরহিষ্যামি কাননে।
মম প্রাণাধিকা ত্বঞ্চ ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে।।১৫

তাহলে খুব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে যে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর অনুপম দিব্যলীলা প্রকাশ করেছিলেন, মথুরাতে তিনি রাজ্যপাট চালিয়েছিলেন; তা সত্বেও কেন কোথাও একবারের জন্যও শ্রীরাধিকার দর্শন পাওয়া গেল না, এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ হল না কেন? যে সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ব্যাসদেব স্বয়ং দেবর্ষি নারদের উদ্দেশ্যে নারায়ণের উক্তি হিসাবে ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উপরোক্ত বিষয়টি বিবৃত করেছেন, সেই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনাকালে শ্রীরাধিকার বিষয়টি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন? ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণনানুযায়ী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে শ্রীরাধিকাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গেই শ্রীরাধিকার মর্ত্যে যাওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং তাঁরা দুজনে ব্রজে গিয়ে অনন্ত বিহার করবেন। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কাউকে কোন কিছু অঙ্গীকার করলে, তার ব্যতিক্রম কখনও হয় নি, হয় না, হতে পারে না। 'সত্য'ই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ভূষণ। মিথ্যাচার তাঁর পক্ষে কদাপি সম্ভব নয়। সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকার ব্রজের কাননে একত্র বিহারের চিত্রের অনুপস্থিতি কি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মিথ্যাচারিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না? তাই মনে হয় শ্রীমদ্ভাগবতের নিরিখে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উপরোক্ত বিবরণ ভগবান ব্যাসদেবের রচনা নয়। কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ, আমাদের সকলের আদরের প্রাণের ধন।

আবার, শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রথম রাত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ের বাষট্টি সংখ্যক শ্লোকে দেবী পার্বতীকে আমরা বলতে শুনি—

"তদ্রাসে ধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।"

—"রাসে তোমায় ধারণ করিয়া থাকি এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ আমাকে রাধা নাম দিয়েছেন।"

তাহলে এখানে একটি খুব সঙ্গত প্রশ্ন হল—যিনি কৃষ্ণকে রাসে ধারণ করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় তাঁর নাম-গন্ধের লেশমাত্র নেই কেন? ধারকের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে ধৃত-বস্তুর অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব? অনেকে অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতে পরোক্ষভাবে শ্রীরাধিকার অস্তিত্বের কথা ব'লে থাকেন। এর সমর্থনে তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী অংশের অর্থাৎ দশম স্কন্ধের ত্রিশ অধ্যায়ের একটি ঘটনার কথা বলে থাকেন। এই অংশে ভাগবতকার পরোক্ষভাবে নামোল্লেখ ব্যতিরেকে এমন একজন ব্রজবধূর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যাঁকে শ্রীরাধিকা ব'লে অনুমান করা যায়। বিষয়টি বিশদভাবে উপলব্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঘটনা-প্রসঙ্গটি আলোচনা করা প্রয়োজন।

শরৎঋতুর এক প্রফুল্ল রজনীতে গোপীগণের ঈপ্সিত মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে পবিত্র রাসলীলায় নিমগ্ন হলেন। দীর্ঘক্ষণ উত্তমরূপে রাসলীলা সম্পাদনের পর এক সময় তিনি সমবেত গোপীগণকে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ প্রদান করলে গোপীগণ আশু কৃষ্ণবিরহ বরণ করতে অস্বীকৃত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনে বিমুখ হলেন এবং আরও অধিক সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলা উপভোগের মাধ্যমে কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুধা লাভে প্রয়াসী হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে সহসা অন্তর্হিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক অন্তর্ধানে বিহ্বল গোপীগণ উদভ্রান্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ভূমিতে তাঁর শ্রীচরণচিহ্ন অনুসরণ ক'রে সমগ্র বনমধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন এবং একদা একস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নের পাশে কোন এক ব্রজবধূর চরণচিহ্ন দর্শন করলেন যা দেখে তাঁদের মনে স্থির ধারণার উদয় হল যে ইনি নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ব্রজবধূ যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা যাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হয়েছেন—

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্তোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্।।২৬
কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা।।২৭

অনয়াহ্হরাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ।।২৮

—সেই পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ যে পথে গেছিলেন, সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন। সামান্য অগ্রসর হতেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশাপাশি কোনো এক ব্রজবধূরও পদচিহ্ন দেখতে পেলেন এবং তা দেখে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তখন দুঃখিত চিত্তে তাঁরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন।।২৬।। 'হস্তিনী যেমন নিজের প্রণয়ী গজরাজের সঙ্গে গমন করে, তেমনভাবেই নন্দনন্দনের কাঁধে নিজের হাত রেখে তাঁর পাশে পাশে হেঁটে গেছেন, কে এই মহাভাগ্যবতী, যাঁর পদচিহ্ন আমরা সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি?'।।২৭।। অবশ্যই ইনি সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আরাধিকা'— যেজন্য আমাদের ছেড়ে শ্রীগোবিন্দ এঁরই প্রতি প্রীতিবশে একা এঁকে নিয়ে নির্জনে চলে এসেছেন'।।২৮।। (গীতাপ্রেসকৃত অনুবাদ)

এইখানেই অনেকে অনুমান করেন এই অনাম্নী ব্রজবধূই হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা।

এই অনাম্নী রমণী যাঁকে বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীরাধিকা বলে কল্পনা করে তাঁর এই অন্তর্ধান প্রসঙ্গে কবি জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দম্ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকে বলেছেন—

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ো হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী—
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্।।

—"প্রীতির ন্যূনাধিক্য বিচার না করিয়া শ্রীহরি সকল গোপীর সঙ্গেই সমভাবে বনে বিহার করিতেছেন। ইহাতে আপনার উৎকর্ষ নষ্ট হইল, এই ঈর্ষায় রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং যাহার শিখরদেশ মধুকরমণ্ডলীর গুঞ্জনে মুখরিত এমনি এক লতাকুঞ্জে নির্জ্জনে বসিয়া সখীকে অতি দীনার মত এই গোপন কথা বলিতে লাগিলেন।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ)

জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে আজ থেকে প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্বে ভট্টনারায়ণ রচিত বেণীসংহার নাটকের মঙ্গলাচরণের মধ্যে রাসপ্রাঙ্গণ থেকে এই একই কারণে রাধার অন্তর্ধানের বিষয় বিবৃত হয়েছে—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তী মনুগচ্ছতোঽশ্রু কলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদ প্রতিমা নিষেবিত পদস্যোদ্ভুত রোমোদগতে
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্ন দয়িতা দৃষ্টস্য বঃ পাতু সঃ।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও দেখি যে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্ত রায় রামানন্দকে অনুরূপ কথাই বলছেন—

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে একমূর্তি রহে রাধা-পাশ।।
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।।
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলাঁ শ্রীহরি।।

অর্থাৎ ভট্টনারায়ণ, কবি জয়দেব বা চৈতন্য মহাপ্রভুর মতে রাধিকা রাসলীলাক্ষেত্রে ছিলেন। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে তাঁকেও সমান চোখে দেখার ঘটনায় রাধার অন্তরে নিতান্ত ঈর্ষা ও অভিমান হয় এবং এই কারণে রাসলীলাস্থল পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হন। এখানে উপরোক্ত মত পোষণকারীদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে বিষয়টিকে অত সরল দৃষ্টিতে বিচার করার মধ্যে একটু ধন্দ থেকে যায়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে রাসলীলাক্ষেত্রে রাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে তাঁকে সমদৃষ্টিতে দেখার কারণে তিনি নিতান্ত অভিমানী হয়ে রাসলীলা-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন, তাহলে একটি সহজ প্রশ্ন আসে। একজন নারীর কাছে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অভিমান উদ্রেকের সঙ্গত কারণ ঠিকই, তাই তাঁর পক্ষে ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু রাধিকার এ অবস্থান তো সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য। তার অগ্রে ও পশ্চাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিশাল

পটভূমিকায় শ্রীরাধিকার পদচারণা কি অবশ্যম্ভাবী ছিল না যদি ব্যাসদেব শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধিকার এ রকম অসীম গুরুত্বের কথা বলে থাকেন? সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অনাম্নী গোপিনী যে শ্রীরাধিকাই সে বিষয়টি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় থেকে যায়। তাই যুগ-যুগান্ত লালিত ঐ অনাম্নী গোপিনীকে শ্রীরাধিকা বলে মেনে নেওয়ার প্রচলিত ধারণাকে অভ্রান্ত বলা যায় না। বরং তাকে ভক্ত-হৃদয়ের আদরের কল্পনা বলা যেতে পারে। কারণ যে রাধিকাকে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে, "দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা" (২।৬।১৩) অর্থাৎ তাঁহারা দুইয়ে এক, দুগ্ধ ও ধবলতার মধ্যে যেমন কোন প্রভেদ নাই, তেমনই তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবাসিনী সেই পরমারাধ্যা শ্রীরাধিকাকে উপস্থাপিত করার জন্য ব্যাসদেবের পক্ষে কোনও গোপনীয়তার বা পরোক্ষতার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হতো না।

তাছাড়া, জয়দেব বা চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাসলীলাক্ষেত্রে শ্রীরাধিকার উপস্থিতি ও অন্য গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তাঁকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তাঁর ঈর্ষান্বিত হয়ে রাসলীলাক্ষেত্র ত্যাগ এই দুটি বিষয়ের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেও শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু রাসলীলাক্ষেত্র শ্রীরাধিকার উপস্থিতিরও কোন প্রামাণ্য সাক্ষ্য বহন করেনা। বরং শ্রীমদ্ভাগবতের ঘটনাপরম্পরা শ্রীরাধিকার সেখানে উপস্থিত না থাকার পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য বহন করে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শ্রীরাধিকা স্থানীয় গোপিনী, আয়ান ঘোষের পত্নী। সমগ্র ব্রজবাসীর নিকট একটি অতি পরিচিত নাম। গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা তাদের কারও নিকট অজানা নয়। এহেন শ্রীরাধিকা রাসপ্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু কেউ তাঁকে রাধা বলে চিনতে পারবে না, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সঙ্গে সহসা অন্তর্হিত হলে উপস্থিত অপরাপর গোপিনীগণ অনুমান করতে পারবেন না যে তিনি কার সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন—এর পশ্চাতে কোন যুক্তি কাজ করে না।

দ্বিতীয়ত, ভট্টনারায়ণ, জয়দেব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাটক বা কাব্যে আমরা দেখি যে রাধিকা কুপিতা হয়ে রাসলীলা ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে চলে যেতে দেখে তাঁর মানভঞ্জনের নিমিত্ত রাসলীলা ক্ষেত্র

পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এ বক্তব্যের সমর্থন তো শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছে। এই বিষয় আলোচনা করার সময় আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা বিষয়টি শুনছি শ্রী শুকদেবের মুখ থেকে যে শুকদেব একজন আজন্ম উর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী যিনি মিথ্যাচার জানেন না, কোন পাপ, গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা, সততা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতাই যাঁর একমাত্র আশ্রয়। এহেন শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে বিশ্বমানবের নিকট প্রকটিত করার মানসে শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতোপম নবনীতধারা পরিবেশন করছেন মৃত্যুপথযাত্রী শাপদষ্ট রাজা পরিক্ষিতের কাছে। একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানবের কাছে শ্রীশুকদেব কেন, কোন মানুষই মিথ্যা পরিবেশন করবেন না। তাই এমতাবস্থায় শ্রীশুকদেব যা বলেছেন তাকেই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মেনে নেওয়াটাই কর্তব্য। এখন দেখা যাক শ্রীশুকদেব রাসলীলাক্ষেত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বিষয়ে ঠিক কি বলেছেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।।১০।২৯।৪৮

—"ভগবান যখন দেখলেন যে, সেই ব্রজরমণীগণ নিজেদের সৌভাগ্যে গর্ববোধ করছেন এবং (কেউবা) মানবতী হয়েছেন, তখন সেই গর্ব প্রশমনের জন্য এবং মানভঞ্জন করে প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি সেইখানেই অন্তর্ধান করলেন।"

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেই অনাম্নী গোপবধূ যে তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আচরণে নিতান্ত আহত ও ক্ষুব্ধ হয়েই রাসলীলাক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলেন তা নয়, শ্রীকৃষ্ণ যে সেই অনাম্নী গোপবধূকে চলে যেতে দেখে তাঁর মান ভঞ্জনের নিমিত্ত তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাসলীলা-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলেন তাও নয়। শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের বিষয়ে এরকম কোন কথা না বলে বরং তাঁর অন্তর্ধানের কারণ হিসাবে কৃষ্ণতত্ত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কৃষ্ণতত্ত্বের মূল কথা হল অহঙ্কারবোধশূন্যতা। ঐশ্বর্যের অহঙ্কার, দারিদ্রের অহঙ্কার, সুখের অহঙ্কার, দুঃখের অহঙ্কার, আত্মসমর্পণের অহঙ্কার, ঔদ্ধত্যের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কারই কৃষ্ণতত্ত্বে ব্রাত্য। কাজেই যখনই কোন কৃষ্ণ-প্রেমাকাঙ্ক্ষীর মনে

কোনপ্রকার অহঙ্কারবোধ জন্ম নেয়, তিনি তখনই তা দূরীভূত করার জন্য পদক্ষেপ নেন। একথার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা পাই তাঁর যদুবংশ ধ্বংসের লীলার মধ্যে।

তৃতীয়ত, সমগ্র রাসলীলার সঙ্গে জড়িত তিনজন মহান ব্যক্তিত্ব—ব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব ও শ্রীসূতগোস্বামী। ব্যাসদেব যে ঠিক কোন কারণে রাসলীলা-প্রাঙ্গণে শ্রীরাধিকাকে অনুপস্থিত রাখলেন তা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকে হয়ত যুক্তি হিসাবে বলতে পারেন যে অনেক সময় সাহিত্যে কোন চরিত্রকে উহ্য রাখা হয় সাহিত্যের এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাই ব্যাসদেব রাসলীলার রসের গাঢ়ত্ব ঘনীভূত করার জন্য শ্রীরাধিকাকে রাসপ্রাঙ্গণে অনুপস্থিত রেখেছিলেন। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের বিদূষক। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় যে চরিত্রটি যদি আদ্যোপান্ত অনুপস্থিত তাকে তাহলে কোন যাদুমন্ত্রে পাঠক বা দর্শক তার অনুপস্থিতির রস আস্বাদনে সমর্থ হবেন? তাছাড়া সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে যদিও শ্রীমদ্ভাগবত অতি উচ্চ সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ, তথাপি ব্যাসদেব কিন্তু নিছক সাহিত্য সৃষ্টি করার মানসে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রথিত করেন নি। তাঁর শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পরমপবিত্র জীবন-কাহিনী ও তাঁর অনন্ত লীলাতরঙ্গেরে সুধামৃতের পরম স্বাদু পরমান্নধারা পরিবেশন। সুতরাং সাহিত্যের কলাকৌশলের অনুশীলন তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবত তো নিছক সাহিত্য-গ্রন্থ নয়—শ্রীকৃষ্ণের আখরাবয়ব। তাই তাঁর পরমারাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পূণ্য অবয়বে কোন পাপ, গ্লানি, মিথ্যাচারের কালিমাস্পর্শ ঘটবে তা ব্যাসদেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং ব্যাসদেব কর্তৃক শ্রীরাধিকাকে রাসপ্রাঙ্গণ থেকে অনুপস্থিত রাখার পশ্চাতে এই যুক্তি খাটে না। তদুপরি, ব্যাসদেবের মত একজন পরম সত্যবাদী মহাত্মা শ্রীরাধিকা সম্পর্কে সব অবগত হয়েও শ্রীমদ্ভাগবতের মত এরকম পূণ্যগ্রন্থে তাঁকে ব্রাত্য করে রেখে দেবেন সে কথাও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাছাড়া, ভাগবত বর্তমানরূপে প্রকটিত হয় ব্যাসদেব কর্তৃক গ্রথিত হওয়ার অনেক পরে রাজা পরিক্ষিতের সম্মুখে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত হওয়ার পশ্চাতে জড়িত আছেন তিনটি সুমহান ব্যক্তিত্ব—ব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব এবং শ্রীসূতগোস্বামী। ব্যাসদেব পূতচরিত্র, সত্যপরায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই অনাম্নী রমণী কে তা পরমপ্রিয় পুত্রের নিকট গোপন করার কোন কারণ বা প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর পুত্র তাঁর নিকটে এসেছিলেন সত্যকে জানার মানসে আর ব্যাসদেব সব জেনেও তাঁর কাছে বিষয়টি গোপন করে যাবেন তা মনে করলে ভাগবত যে মূল ভিত্তি অর্থাৎ সত্যের অনুধ্যানের উপর গড়ে উঠেছে তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দ্বিতীয়ত, সত্যকে জানার এক সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা শ্রীশুকদেবের সমগ্র অন্তরাত্মা জুড়ে বিরাজমান। পিতার নিকট হতে এই পূণ্যগ্রন্থ সম্পর্কে কোনপ্রকার অস্পষ্টতা নিয়ে তিনি বিদায় নেবেন তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে ঐ অনাম্নী ব্রজবধূর প্রকৃত পরিচয় শুকদেব সম্যক জানতেন। তা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁর মতো একজন পরম পবিত্র মহাত্মা যিনি সততা ও সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক, যাঁর নিকট সত্যই একমত্র পরম ধর্ম, মিথ্যাচার বা মিথ্যাভাষণ যাঁর নিকট সূর্যের বুকে কলঙ্ক স্বরূপ, তিনি মৃত্যুপথযাত্রী একজন ভাগবত-শ্রবণ-অভিলাষী পূণ্যপ্রাণের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে শ্রীরাধিকার মত সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা ইচ্ছা করে গোপন করে যাবেন তা কদাপি সম্ভব নয়। তাঁর অন্তর শিশুর মত সরল, পুষ্পের মত পবিত্র, প্রকৃতির মত নিষ্পাপ। তাই যদি তিনি পিতার নিকট শ্রীরাধিকার কথা শ্রবণ করে থাকতেন তাহলে তাঁর পক্ষে তা পরিক্ষিতের কাছে গোপন করা সম্ভব হতো না।

সুতরাং ভাগবতের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে বলা যায় ব্যাসদেব শ্রীরাধিকাকে রাসলীলাক্ষেত্র উপস্থাপিত করেন নি। অর্থাৎ ব্যাসদেবের চেতনায় শ্রীরাধিকার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার অনুপস্থিতির বিষয়ে আরও অনেক প্রশ্ন মাথাচাড়া দেয়। প্রশ্নগুলি হল—কেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনের সমস্ত রকম সর্বোচ্চ আদর্শকর্ম সম্পাদন করে গেলেন কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রাণী শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাত্য থেকে গেলেন? কেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আয়ান ঘোষের পত্নী হয়ে শ্রীরাধিকার মর্তে আগমনের প্রসঙ্গ থাকলেও শ্রীমদ্ভাবতে সে প্রসঙ্গ অনুক্ত থেকে গেল? কেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসের ভিয়ানে রসের কারিগর বিভিন্ন বৈষ্ণব কবিদের রচনায় যেসব উপাখ্যানের বর্ণনা দেখা যায়, তাদের

একটিরও অস্তিত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা গেল না? নন্দনন্দনের অপরূপ মহিমাময় সর্ব লীলার শ্রেষ্ঠ লীলা নরলীলার এটিও তো একটি হৃদয়-নন্দন অঙ্গ! তবে কি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে যে রাধিকার প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছ তার সঙ্গে ব্যাসদেব সহমত পোষণ করেন নি? তবে কি ব্যাসদেবের সময় শ্রীরাধিকাতত্ত্বের কোন অস্তিত্বই ছিল না? উত্তর বড় জটিল ও কঠিন। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে ব্যাসদেবকৃত শ্রীমদ্ভাগবতই হল বৈষ্ণব শাস্ত্রের মূল এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাই যা নাই শ্রীমদ্ভাগবতে তাকে মূল বৈষ্ণবতত্ত্বের অঙ্গীভূত না ভেবে ব্যাসদেবোত্তর যুগের সংযোজন বলে ভাবাই সমীচীন। বিষয়টি সম্ভবত শ্রীমদ্ভাগবদোত্তর যুগের কোন অতি উৎসাহী ভক্ত বা কবিকুলের মানসিক বিলাস।

যাই হোক এখান থেকে আমরা দুটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রথম সিদ্ধান্ত হল এই যে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র মোটেই প্রাচীনতম গ্রন্থ নয়, তা কখনই ব্যাসদেবের রচনা নয় এবং তা কখনই ব্যাসদেবের সমসাময়িক কালে বা তার পূর্বে রচিত হয় নি। তাঁর পরবর্তী কালে কোন এক সময় এটি রচিত হয়েছিল এবং সেই সময়ের প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাতে ব্যাসদেবের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব কর্তৃক শ্রীরাধিকার প্রসঙ্গ বা নাম উল্লেখ না হওয়ার কারণ হল এই যে নিশ্চয় ব্যাসদেবের চেতনায় 'শ্রীরাধিকা' নামের কোন অস্তিত্ব ছিল না, থাকলে তিনি অবশ্যই শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর প্রসঙ্গ আনতেন।

অন্যদিকে, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ উপাখ্যান যে ব্যাসদেবের মস্তিষ্ক প্রসূত হওয়া সম্ভব নয় তা এই দুই গ্রন্থে পরিবেশিত রাধা-মাহাত্ম্য বর্ণনা ও রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উভয় গ্রন্থেই বলা হয়েছে রাধা নামের পূর্বে দৈবাৎ যদি কৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয়ে যায় তাহলে উচ্চারণকারীর যৎপরোনাস্তি সর্বনাশ সাধিত হবে। সে নির্বংশ হবে, ব্রহ্মহত্যার পাপ অর্জন করবে, ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হবে, তাকে অনন্তকাল ব্যাপী সময় কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলে ভাজা হবে ইত্যাদি। এই কথাগুলি তৎকালীন সমাজের একশ্রেণীর গ্রাম্য, অশিক্ষিত, অন্ধ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ততোধিক গ্রাম্য, অশিক্ষিত, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। ব্যাসদেবের মত মহাত্মা যিনি বেদের শ্রেণী বিভাগ করেছেন, মহাভারত, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার মত সর্বগ্রন্থসার, শ্রীমদ্ভাগবতের মত অপূর্ব ও অনবদ্য কৃষ্ণজীবনী ইত্যাদি সর্বকালজয়ী মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন যাদের প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি অক্ষর গভীর ও উচ্চমার্গের অর্থ বহন করে, তিনি এধরণের নিম্নরুচি সম্পন্ন, বালখিল্য সুলভ, নিম্নমানের পদ রচনা করবেন এটা মেনে নেওয়া কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং আমরা সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানের স্রষ্টা শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যাসদেব নন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রীমদ্ভাগবতের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণের নামোচ্চারণের পূর্বে শ্রীরাধিকার নামোচ্চারণের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদি গ্রন্থের ভয়ানক নির্দেশকে মেনে চলেন নি। তিনি তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ লিখেছেন—

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।।

যাইহোক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চিত্রিত কৃষ্ণ-রাধা চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে কৃষ্ণ বা তাঁর প্রিয়তমা নারীর চরিত্র এভাবে চিত্রিত করা কদাপি ভাগবতকার ব্যাসদেবের কর্ম নয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চিত্রিত কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সমাপ্তি শ্লোকে তাঁর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির সার ব্যাখ্যা করেছেন—

নামসঙ্কীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।।

—যে ভগবানের নামসঙ্কীর্তন পাপপুঞ্জকে সর্বতোভাবে বিনাশ করে এবং

যাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, প্রণতি নিবেদন সর্ব দুঃখকে চিরকালের জন্য নিবৃত্ত করে, সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীহরিকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কি গভীর, কি ব্যাপক, কি সুউচ্চ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ব্যাসদেবের অন্তরে সদা প্রবাহিত ছিল তা উপরিলিখিত শ্লোকটি থেকেই প্রমাণিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি কৃষ্ণের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা বড়ই নির্মল, বড়ই পবিত্র, বড়ই নিষ্কলুষ। কোন কালিমা, কোন গ্লামি, কোন অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি হত্যা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন হিংসা ছিল না। পূতনাকে বধের মধ্যে তিনি তাকে করুণাই করেছিলেন। কংসকে হত্যার মধ্যে নিহিত ছিল তাকে উদ্ধার করার উদারতা। তাঁর প্রেম ছিল নিষ্কলুষ। ব্যাসদেবের মত একজন কৃষ্ণের পরম ভক্তের পক্ষে তাঁর ঈদৃশ চরিত্র চরিত্র-চিত্রণই প্রত্যাশিত ছিল।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা সর্বাঙ্গে পূতিগন্ধময় কর্দমলিপ্ত। ভাগবতপুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী যে কৃষ্ণ এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতির কারণ[২৪], অর্জুনের মতে যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, অনন্তশক্তি, 'ভক্তানামভঙ্কর' অর্থাৎ ভক্তদের ভয়হরণকারী, সংসারতাপতপ্ত জীবের একমাত্র তাপহর[২৫], যিনি ভীষ্মের প্রশস্তিতে "ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্" অর্থাৎ যিনি সকলের আদিকারণ ও পরমপুরুষ নারায়ণ[২৬], এবং সর্বাত্মা, নিষ্পাপ পরমাত্মা[২৭], দেবাদিদেব ভগবান, যিনি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত, যাঁর না আছে আদি না আছে অন্ত[২৮], উদ্ধবের মতে যিনি স্বয়ং ভগবান, যাঁর শ্রীপাদপদ্মে মুকুট-মণ্ডিত মস্তক স্থাপন ক'রে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত প্রণতি জানান[২৯], ব্রহ্মার প্রশস্তিতে যিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ

২৪। শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১
২৫। তত্রস্থ ১/৭/২২
২৬। তত্রস্থ ১/৮/১৮
২৭। তত্রস্থ ১/৯/২১
২৮। তত্রস্থ ২/৬/৩৯
২৯। ২৮। তত্রস্থ ৩/২/২১

ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ বৃত্তির কোনটারই বশীভূত নন[৩০], যিনি ব্রহ্মারও ঈশ্বর[৩১], ভক্ত প্রহ্লাদের ভাষায় সত্ত্বগুণই যাঁর অতীব প্রিয় শরীর[৩২], যিনি পরমেশ্বরগণেরও ঈশ্বর[৩৩], ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র যাঁর ভজনা করে[৩৪], যিনি সাধুপুরুষদের পরম গতি[৩৫], যিনি অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা[৩৬], সেই শ্রীকৃষ্ণ কি করে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এত কদর্য চরিত্রদোষের অধিকারী হলেন তা ভাবতে বড় বিস্ময় লাগে। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' কথাটি শিরোধার্য করে মেনে নেবার পথে কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকতে পারে না। সেই সূত্র ধরে যদি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কেউ কদাচারী মন্তব্য করে বসে তাহলে বোধকরি মন্তব্যটি খুব একটা অসমীচীন হবে না। বস্তুত এই পুরাণে পরস্ত্রী বিরজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক সম্পর্ক নিতান্ত পাশবিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে যা শ্রীকৃষ্ণের মত পরমপুরুষের পক্ষে যৎপরোনাস্তি বেমানান ও আপত্তিকর। এই বক্তব্যের সমর্থনে নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের অন্তর্গত তৃতীয় অধ্যায় থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল—

তাঞ্চ রূপবতীং দৃষ্ট্বা প্রেমোদ্রেকাং জগৎপতিঃ।
চকারালিঙ্গনং তূর্ণং চুচুম্ব চ মুহুর্মুহুঃ।।১৪
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং বিভুঃ।
রহসি প্রেয়সীং প্রাপ্য চকার চ পুনঃপুনঃ।।১৫
বিরজা সা রজোযুক্তা ধৃত্বা বীর্য্যমমোঘকম্।
সদ্যো বভূব তত্রৈব ধন্যা গর্ভবতী সতী।।১৬

—"প্রভু হরি সেই প্রিয়তমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বারংবার নানাবিধ

৩০। তত্রস্থ ৩/৯/২০
৩১। তত্রস্থ ৪/১৪/২০
৩২। তত্রস্থ ৭/৯/৩৭
৩৩। শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২৮/৭
৩৪। তত্রস্থ ১০/৩৮/৮
৩৫। ২৮। তত্রস্থ ১০/৩৮/৮
৩৬। ২৮। তত্রস্থ ১০/৮৪/২২

বিপরীতাদি শৃঙ্গার করিলেন। তখন সুভগা সাধ্বী রজঃস্বলা সেই বিরজা, হরির অমোঘবীর্য ধারণ করিয়া তথায় গর্ভবতী হইলেন।'' (পঞ্চানন তর্কারত্নকৃত অনুবাদ।)

শ্রীকৃষ্ণের মত একজন পরম সত্ত্বময় পরমপুরুষের কথা তো বহু দূরের বিষয়, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন সদাচারী কোন সাধারণ মানুষের নিকট থেকেও কি এই আচরণ কাঙ্ক্ষিত? কদাপি নয়। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরব্রহ্ম, এই বৃহৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি সকল দেবদেবীর মধ্যে পূজ্যতম, এই জগৎ সংসার যাঁর প্রতি প্রেমে-ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় তাঁর শ্রীচরণকমলে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন ক'রে দিতে পারলে ধন্য হয়ে যায় সেই শ্রীকৃষ্ণ যে কদাপি পাশবিক কামনার বশীভূত হতে পারেন না তার প্রকৃষ্ট যুক্তি আমরা পাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবানের লীলা-অবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত উক্তি থেকে—

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত।। ভা ২।৭।৭

—রুদ্র প্রমুখ দেবতাগণ ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন কিন্তু নিজেকে নিজে দগ্ধকারী সেই অসহ্য ক্রোধকে তাঁরা দমন করতে সমর্থ হননি। সেই কামজয়ীগণেরও উপর বিজয়কারী ক্রোধ নরনারায়ণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রবেশ করার আগেই ভয়ে কাতর হয়ে কেঁপে ওঠে। কাজেই তাঁর হৃদয়ে কাম কি ক'রে প্রবেশ করতে পারে?

ব্রহ্মসংহিতার ৫/৬ মন্ত্রে বলা হয়েছে—

এবং জ্যোতির্ম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ।
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর। তিনি সদা আত্মারাম, সদানন্দময়। তিনি পরাৎপর ও চিন্ময় আত্মজগতেই রমণপরায়ণ। জড়া-প্রকৃতি মায়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কহীন।

তিনি পদ্মপত্রে নীড়, সকল কিছুর মধ্যে থেকেও কোনকিছুতে লিপ্ত হন

না। তাঁর কাছে নারী-পুরুষ, চেতন-অচেতন কোন কিছুরই আলাদা স্বত্ত্বা নেই। তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হয়েছে—

নৈব স্ত্রী ন পুমানৈব ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে।।

—তিনি না নারী, না পুরুষ, না জড়। তিনি যে দেহ ধারণ করেন তার সঙ্গেই তিনি সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন।

ফলে কোন বিশেষ দেহের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এহেন কদর্য আখ্যান পাঠ ক'রে অন্তর নিবিড় বেদনায় আর্তনাদ করে। মনে প্রশ্ন জাগে—এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এরূপ কদর্য আখ্যান গ্রথিত হওয়ার কি কোন প্রয়োজন ছিল? বস্তুত যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরম পবিত্র অমৃতগাথা অন্তরের সমস্ত গ্লানি, মালিন্য, স্থূলতা, সংকীর্ণতা, পাপাসক্তি, হীনমন্যতা, অসূয়াদি হৃদয়ের সর্বপ্রকার তমসাকে অপনোদিত ক'রে হৃদয়কে পবিত্র গঙ্গাবারি বিধৌত পুণ্যভূমিতে পরিণত ক'রে তোলে, সেখানে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এহেন কদর্য কল্পনাবিলাসী আখ্যান-পাঠে হৃদয় নিতান্ত বিদ্রোহী হ'য়ে ব'লে ওঠে—না! আমরা এ কৃষ্ণকে চিনি না। এ কৃষ্ণকে আমরা চাই না। যেখানে যত পুস্তকে কৃষ্ণ সম্পর্কে এধরণের কুরুচিকর ভ্রান্ত গল্প নিবদ্ধ আছে, বিনাশ ক'রে দাও সব। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্কলেপনের পাপাচার থেকে মুক্ত করো ধরাধাম।

অনেকে হয়ত শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধৃত করে বলবেন যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গূঢ় লীলার অন্তর্নিহিত অর্থ বড় বড় দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, সাধু, মুনিরাও বুঝতে পারে না, সেখানে সাধারণ মানুষ এর অর্থ বুঝবে কি করে? ভাগবতে তিনি স্বয়ং বলেছেন যে মায়ার আবরণে মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ থেকে, তাই তারা তাঁর বিচিত্র লীলার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ। তাঁর ভাষায়, 'তময়ং মন্যতে লোকে' ইত্যাদি। তাঁর এই বক্তব্যকে সর্বান্তকরণে মেনে নিলেও বলতে হয় যে সব বিষয়েরই একটা মাত্রা থাকে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে দিয়ে কদর্যতম পাশবিক

কর্ম করিয়ে মানুষের দৃষ্টিকে দোষী করাটা অনুমোদনযোগ্য নয়। ভাগবতকার ব্যাসদেবের পক্ষে এ ধরনের রচনা সম্ভব নয় বলে মনে করাই বোধকরি সমীচীন। স্বর্গত শ্রদ্ধেয় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় চণ্ডীদাসের সাহিত্য সম্পর্কে একটি কথা বলেছিলেন—"এ পর্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিতেছে, কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না—চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিষ বাহির হইতে পারে কি না?"

অনুরূপে, অতি সঙ্গতভাবেই মহর্ষি ব্যাসদেবের নামে যে সমস্ত রচনা পরিচিত আছে সেগুলি সম্পর্কেও এই একই দাবী উপস্থাপিত করা যায় এবং এই সমস্ত মাপকাঠিতে বিচার করে বলা যায় যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-রাধা-বিরজার যে কদর্য ত্রিকোণ প্রেম-কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা কদাপি ব্যাসদেব-গ্রথিত নয়।

এখন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত শ্রীরাধার চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এখানে তাঁর স্বর্গীয় মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই পুরাণের 'কৃষ্ণজন্মখণ্ডে' তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে মানবসমাজের একেবারের নিম্নস্তরের নারীচরিত্রের এমন সমরূপ ক'রে উপস্থাপিত করা হয়েছে যা এই পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বর্ণিত তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্যের পক্ষে আপত্তিকরভাবে বেমানান। এই পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে একশত এগার অধ্যায়ে শ্রীরাধিকা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন—

অহমেব স্বয়ং রাধাচ্ছায়া রায়াণকামিনী।
রায়াণঃ শ্রীহরেরংশঃ পার্ষদপ্রবরো মহান্।।৬৯
রাশব্দশ্চ মহাবিষ্ণুর্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রীমাতৃবাচকঃ।।৭০
ধাত্রীমাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বুধৈঃ।।৭১

"আমি স্বয়ং রাধা রায়ানকামিনী ছায়ামাত্র। রায়ান শ্রীহরির অংশ এবং প্রধান পারিষদশ্রেষ্ঠ। যাঁহার প্রতি লোমকূপে সমুদয় বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, তিনিই মহাবিষ্ণু। সেই মহৎ বিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্ব সকল 'রা' শব্দে জানিবে। ধা শব্দে ধাত্রী ও মাতা বোধ হয়। আমিই মহাবিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্বসকলের ধাত্রীমাতা। আমিই ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি। এই জন্য পণ্ডিতগণ ও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রাধা নামে নির্দেশ করিয়াছেন।" (পঞ্চানন তর্কালঙ্কারকৃত অনুবাদ)।

একদিকে এই পুরাণে যেমন শ্রীরাধার চরিত্রকে পরম মহিমান্বিত করে দেখানো হয়েছে, অপরদিকে তেমনই তাঁর চরিত্রকে এমন এক অতি সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে যেখানে তিনি অতীব অসহায়তা ও চরম দুর্গতির শিকার।

এখানে দেখি শ্রীকৃষ্ণের চূড়ান্ত লাম্পট্যে শ্রীরাধিকা যারপরনাই বিব্রত, বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ সুযোগ পেলেই যখন তখন যত্র তত্র বিরজার সঙ্গে কদর্যকর্মে লিপ্ত হন। এই কুকর্মে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি এক সাগরেদ যোগাড় করেছেন যার নাম সুদামা যিনি এহেন কুকর্ম চলা কালীন কৃষ্ণ ও বিরজাকে কোন গোপন কক্ষে ঢুকিয়ে কবাট অবরুদ্ধ করে লগুড় হস্তে দ্বার পাহারা দেন যাতে তাঁর প্রভু নির্বিঘ্নে তাঁর কুকর্ম সমাধা করতে পারেন। শ্রীরাধিকাও কিছু কম যান না। তিনিও ওঁৎ পেতে থাকেন কখন কৃষ্ণ কোথায় দরজা বন্ধ করছেন। তাঁর নিযুক্ত আড়কাঠির মাধ্যমে সংবাদ এল—কৃষ্ণ বিরজাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন। নিতান্ত কুপিতা রাধিকা কৃষ্ণকে হাতে-নাতে ধরার নিমিত্ত সঙ্গীসাথী সহ লগুড়হস্তে ধাবিত হলেন অকুস্থলের প্রতি। মনে দৃঢ় সংকল্প—আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেনই। যথারীতি তিনি অবরুদ্ধ কবাটের সামনে বাধা পেলেন কৃষ্ণের কুকর্মের অনুচর ভৃত্য সুদামার নিকট। ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় শ্রীরাধিকা সুদামার সঙ্গে নিতান্ত কলহে লিপ্ত হলেন। নিতান্ত ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় সুদামার প্রতি হুংকার বর্ষণ করলেন, "দূরং গচ্ছ গচ্ছ দূরং রতিলম্পটকিঙ্কর'—ওরে লম্পটের সাগরেদ। দূর হ এখান থেকে। কিন্তু প্রভুভক্ত সুদামা তাতে রাজী নয়। ফলে শুরু হল সুদামার সঙ্গে তাঁর সখীদের কলহ। ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য রাধিকা নিদারুণ অভিশাপবাণে বিদ্ধ করলেন সুদামাকে—"গচ্ছ ত্বমাসুরীং যোনিং গচ্ছ ক্রূরমতে দ্রুতম্।" যাও! তুমি দ্রুত অসুরযোনি প্রাপ্ত হও।

সুদামাও ঘটনার আকস্মিকতায় নিতান্ত বিহ্বল, বাক্যহারা। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তিনি দর্শন করছেন শ্রীরাধিকাকে। ভাবছেন—একি! তিনি কাকে প্রত্যক্ষ করছেন! ইনিই কি সেই জগদ্বরেণ্য বিশ্ববন্দিতা জগন্মাতা শ্রীরাধিকা! নাকি একেবারে অশিক্ষিত, অপরিশীলিত, নিম্নমানের সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন কোন গ্রাম্য রমণী যাঁর স্থান-অস্থানের জ্ঞান নেই, হিতাহিতের বোধ নেই, সামাজিক মর্যাদা রক্ষা বা হারানোর কোন ভয় বা অনুভূতি নেই। শ্রীরাধিকার এহেন অতি সামান্যা মানবীর ন্যায় আচার-আচরণে অতি বিস্মিত সুদামা কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনিও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীরাধিকাকে অভিশাপ দিলেন—

মনুষ্য ইব কোপস্তে তস্মাৎ ত্বং মানুষী ভুবি।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো ময়া সপ্তা ত্বমম্বিকে।।১০২
ছায়য়া কলয়া চাপি পরগ্রস্তা কলঙ্গিনী।
মূঢ়া রায়াণপত্নীং ত্বাং বক্ষ্যন্তি জগতীতলে।।[৩৭] ১০৩

—মানবীর ন্যায় তোমার ক্রোধ, সে কারণে তুমি মর্ত্তে মানবী হবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই তোমায় আমি অভিশাপ দিলাম। পরগ্রস্তা, কলঙ্কিনী ও মূঢ় রায়ানপত্নীরূপে তুমি জগতে পরিচিত হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধিকার চরিত্রকে অতি নিম্নরুচিসম্মত বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করে চিত্রিত করা হয়েছে যা অতি অকিঞ্চিৎকর এক দ্বাররক্ষীর কাছেও অনুমোদনযোগ্য নয়।

কাজেই যে ব্যাসদেব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এত মহিমময়ী দেবী হিসাবে যে রাধিকার গুণকীর্তন করেছেন, তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সেই রাধিকার এহেন দুর্গতি করবেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সুতরাং এই সমস্ত দিক বিচারে বলা যায় যে শ্রীরাধিকা চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতাকার ব্যাসদেবের সৃষ্টি নয় আর এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে আকারে-ইঙ্গিতে রাসলীলায় শ্রীরাধিকার প্রসঙ্গের অবতারণার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায় না।

৩৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ন।

চতুর্বিংশ তরঙ্গ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থ কৃষ্ণতত্ত্বের সুসমৃদ্ধ আকর। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবন ও লীলা বর্ণনার সূত্রে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে এসে পড়েছে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তার বেশীরভাগটাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি বলে কৃষ্ণদাস দাবী করেছেন। আর এই বক্তব্যকে নস্যাৎ ক'রে দেবার কোন কারণ দেখি না। তিনি মহাপ্রভুকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও, তিনি যে পরম চৈতন্যভক্ত সনাতন ও রূপ গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য অকাদমী, নিউ দিল্লি কর্তৃক প্রকাশিত ভূমিকা, টিপ্পনী ও শব্দকোষ সম্বলিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের ভূমিকা থেকে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

“বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণদাস সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। মনে হয় তিনি রূপ গোস্বামীর আঁখরিয়ার কাজ করতেন। সনাতনের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল বিগ্রহের সেবায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ (ও নিয়োগ) ছিল। সনাতন-রূপের পৈতৃকনিবাস ছিল ঝামটপুরে সংলগ্ন নৈহাটি গ্রামে। মনে হয় যে ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস সনাতনরূপের পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তির তদারক করতেন এবং তাই বৃন্দাবনে এসেও তাঁকে মদনগোপালের সেবার তত্ত্বাবধানে করতে হত। রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে এলে পর সনাতন ও রূপ তাঁকে দেহত্যাগ করতে না দিয়ে রাধাকুণ্ডতীরে রেখেছিলেন। তখন থেকেই কৃষ্ণদাস রঘুনাথ দাসের সেবা (অর্থাৎ তদারক) করতেন।” “চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে মনে হয় যেন কৃষ্ণদাস বেশ কিছুকাল ধরে রূপের সঙ্গলাভ করেছিলেন।”

সুতরাং হয় তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে অথবা চৈতন্যের পরম ভক্ত রূপ গোস্বামীর মুখ থেকে শ্রবণ করে তাঁর নিজস্ব ভাষা ও স্বকীয় ভঙ্গিতে মহাপ্রভুর উক্তি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফলে এই গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে যে যে বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে তার মূল নির্যাসটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বক্তব্য বলে স্বীকার করার পথে কোন আপত্তি না থাকাই কাম্য।

যাই হোক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য অতি সুললিত ও সহজবোধ্য ভাষায় বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যা শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মূল নির্যাসকে মনে করিয়ে দেয় এবং যে কোন কৃষ্ণভক্তের জন্য কৃষ্ণতত্ত্বের অনুশীলন ও আচরণের সহজ পথ উন্মোচিত করে। এই গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণতত্ত্বের কিছু কিছু বিষয় পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে এই গ্রন্থের অবশিষ্ট বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে প্রয়াসী হব।

কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য হল তিনি সূর্যের মত উজ্জ্বল, ভাস্বর, দীপ্তিমান। সূর্য উদিত হলে তমসার অন্ধকার বিদূরিত হয়ে পৃথিবীর সত্য রূপটি প্রকাশিত হয়। তখন আর সেখানে দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী অন্ধকারের ঠাঁই হয় না। তেমনই অজ্ঞানতার মায়াবরণ আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, অর্ন্তদৃষ্টিকে করে বিভ্রান্ত। সত্যের আলোক থেকে বঞ্চিত হৃদয় হয় বিপথগামী। মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চির আকাঙিক্ষত মুক্তির পথ হয় অবরুদ্ধ। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বের আলোক অন্তরে প্রবেশ করলে হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ারের অর্গল যায় খুলে, সত্য ও সুন্দরের রূপ দর্শনে তার অন্তর হয় দীপ্ত, উদ্ভাসিত। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে হৃদয়ে উদিত হয় জ্ঞানের আলোক। আর এই জ্ঞানের আলোকই তো মানুষকে প্রকৃত মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলে। বস্তুত হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে সেখানে হোক আলোর অধিষ্ঠান—এই তো মানুষের চিরন্তন কামনা। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।' কৃষ্ণদাস তাই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।।

তাই কৃষ্ণ মানে জ্ঞান, কৃষ্ণ মানে প্রজ্ঞা, কৃষ্ণ মানে আলো, কৃষ্ণ মানে আনন্দ। আর এহেন আত্মজনের সান্নিধ্য পেলে কার না হৃদয় উল্লসিত হয়! কৃষ্ণ অনুরাগের আলো হৃদয়ে আনে নিবিড় পুলকানুভূতি।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।।

আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্ গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সুন্দর হে সুন্দর।।

সমগ্র চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের নাম লীলা। প্রতিটি লীলা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। লীলাগুলির নাম আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলা। আদিলীলার সপ্তদশ অধ্যায়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার পন্থার হদিস দিয়েছেন। কেবলমাত্র জ্ঞান বা যোগক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। একমাত্র প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে পাওয়া যায়—

জ্ঞানধর্ম্মে' যোগধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস।

কিন্তু সেই প্রেম হওয়া চাই 'অহৈতুকী' ও 'নির্গ্রন্থ'। অহৈতুকী ভক্তির অর্থ হল নিষ্কাম ভক্তি। এই প্রেমে কোন লাভের আশা থাকে না। 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অর্থ হল আসক্তিহীন। সুতরাং কামনা-বাসনা-আসক্তি বিহীন বিশুদ্ধ ভালোবাসার মাধ্যমেই কেবল কৃষ্ণকে লাভ করা যায়—

এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইঞা।।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁর সঙ্গে রামীর স্বর্গীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অহৈতুকী' প্রেমের এক অপূর্ব সংজ্ঞা প্রদান করেছেন—

লালসার জ্বালাহীন, নির্ম্মল নিষ্কাম
প্রেম-আত্মশুদ্ধি, তৃপ্তি, চিত্তের বিশ্রাম।

এ এক এমনই প্রেম যার মধ্যে কোন লালাসার দংশন থাকে না, যা পরিপূর্ণরূপে পবিত্র, কামনা-বাসনাহীন, পবিত্র গঙ্গাজল যেমন অঙ্গশুদ্ধি ঘটায়, এই প্রেম তেমনই আত্মশুদ্ধি ঘটায়। এ প্রেম চিত্তকে চঞ্চল করে না, বরং এই প্রেম চিত্তকে দান করে নিবিড় শান্তি, প্রগাঢ় বিশ্রাম।

মানুষের অন্তরে কামনার লেলিহান অগ্নিশিখা মানুষের অন্তরকে করে রাখে অশান্ত, চঞ্চল। সব সময় কিছু পাবার তাড়না তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সর্বদা অন্তর থাকে বিক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণ-ভক্তের অন্তরে কোন

কামনা-বাসনা থাকে না। তাই তার অন্তর শান্ত, উদ্বেগশূন্য। প্রেম-ভক্তির নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা সতত তার অন্তরাত্মাকে করে রাখে প্রদীপ্ত। তাই সে চক্ষু নির্মীলিত ক'রে তার আরাধ্য দেবতার ধ্যান করতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত।।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে এই সত্য রমণীয় ভাষায় প্রকাশ লাভ করে—

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই।।
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিড়ে, নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে—
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এই ঠাঁই।।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হল অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে মুদিতলোচনে চাই।।

কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাও কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না—"শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ"। আবার আসক্তিযুক্ত ও নিষ্ঠাবিহীন অন্তরে কেবলমাত্র লোক-দেখানো বৈরাগ্য দ্বারাও কৃষ্ণের করুণা পাওয়া যায় না। পবিত্র অন্তরে নিষ্ঠাপূর্ণ চিত্তে বাহ্যিকভাবে প্রচলিত লোকাচার পালনের মধ্য দিয়ে নিষ্কাম স্বার্থশূন্য প্রেম-ভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব। তাই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ হল—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ! ....
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।।
মোর মোহ মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

সুতরাং একমাত্র শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমেই কৃষ্ণপ্রেমে সফলতা আসা সম্ভব। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি বলতে কি বোঝায় তার সম্যক ধারণা ভক্তের অন্তরে থাকা প্রয়োজন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত ব্যাখ্যা থেকে এর একটি সহজ ও সরল ধারণা পাই—

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।।
এই শুদ্ধভক্তি হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রেমের এক অপূর্ব প্রভাবের কথা বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে সকলের অন্তর থেকে অহংবোধ দূর হয়ে যায়। এর প্রভাবে সকলে উচ্চ-নীচের ভেদ-রেখা বিস্মৃত হয়। গুরুজনও নিজেকে লঘুজনের দাস হিসাবে ভাবতে শেখে—

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব।।

শিষ্যও প্রয়োজনে গুরুর ভ্রম নিরসনের জন্য তাঁকে শিক্ষা দিতে পারে। আর গুরুও শিষ্যের নিকট থেকে সেই শিক্ষা অম্লানবদনে স্বীকার করে। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হবে।

মহাপ্রভু চলেছেন শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে। সঙ্গে অগণিত ভক্তমণ্ডলী চলেছেন পবিত্র হরিনামের মধুবারি বর্ষণ করতে করতে। পথে গৌড়ের রামকেলি গ্রামে তাঁর সাক্ষাৎ হল ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে। শ্রীরূপ প্রভুকে দেখলেন, উপযুক্ত ভক্তি নিবেদন করলেন। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে অতশত সঙ্গী-সাথী দেখে শ্রীরূপের মনে হল—প্রভু বৈষ্ণব-ধর্মাচরণের পথ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন। কারণ বৈষ্ণবের একমাত্র সম্বল যে অহংবোধহীনতা, অন্তরের দীনতা তা কিঞ্চিৎ হলেও অবলুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই তিনি প্রভুকে প্রকৃত বৈষ্ণবাদর্শ যা তিনি প্রভুর নিকট থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিনি একবার প্রভুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন-যাত্রার এই নহে পরিপাটী।।

আর যেহেতু মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেম অভিলাষী, তাই তিনিও শ্রীরূপের এই বাণীকে ধৃষ্টতা বা ঔদ্ধত্য বলে না ভেবে তার প্রকৃত মূল্যায়ন করলেন এবং উপযুক্ত সময়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র একজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বিপদসঙ্কুল বনপথ ধরে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে।

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণপ্রেমের এক অতি গূঢ় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ ভক্ত কৃষ্ণ দরশনের জন্য সততই ব্যাকুল। সে কৃষ্ণের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করে, তবুও কৃষ্ণ তার কাছে অধরা থেকে যায়। তাই কৃষ্ণবিরহে তার অন্তর আকুল। মনে হয় যেন কৃষ্ণ বিরহ-বেদনায় তার সর্ব অঙ্গে এক অসহনীয় গাত্রজ্বালা। আবার, সে যে কৃষ্ণে অনুরক্ত, সে যে প্রাণ-মন উজাড় ক'রে কৃষ্ণকে নিষ্কাম ভাবে ভালোবেসেছে, এই ভাবনা তার অন্তরকে নিবিড় পুলকানুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। কৃষ্ণের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগবোধ তার অন্তরে সিঞ্চন করে প্রাণজুড়ানো শীতল বারিধারা। ফলে এই দ্বিবিধ বিপরীত প্রকারের বিচিত্র দুর্লভ অনুভূতিতে তার অন্তর পরিপ্লাবিত হয়। এ প্রেম একদিকে যেমন তাকে বিরহানলে দগ্ধ করে, অপরদিকে তেমনই তাকে এক নিবিড় অব্যক্ত সুখানুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। এ দুঃখ তাকে পীড়িত করে না। এ দুঃখ তার বড় আদরের, এ দুঃখ তার বড় ভালোবাসার। কৃষ্ণদাস বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত্র।
এই প্রেম-আসাবাদন তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

রবীন্দ্রনাথও প্রেমের এই বিপরীতধর্মী দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেছিলেন—

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।।
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।।
পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে।

কৃষ্ণপ্রেমের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ধরা পরেছে কৃষ্ণদাসের লেখনীতে। পৃথিবীতে কৃষ্ণই যেন একা পুরুষ এবং সমগ্র মানবকুল সমষ্টিগতভাবে নারীসদৃশ। কৃষ্ণের প্রেমে আপাদমস্তক নিমজ্জিত এই সব ভক্তরূপী নারীগণের পৃথিবীর কে কোথায় কি বিরূপ মন্তব্য করলো তার কোন খেয়াল থাকে না। সমস্ত অপবাদ, সমস্ত বিরূপ মন্তব্য তারা হাসিমুখে হেলায় উপেক্ষা করে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য অহরহ কৃষ্ণের সঙ্গসুধা লাভ—

লোকধর্ম্ম লজ্জাভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় নারীগণে।।

রবীন্দ্রনাথও বোধকরি শাশ্বত প্রেমের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে হৃদয়ের মাধুর্যরসে নিষিক্ত করে প্রকাশ করেছেন তাঁর গানে—

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি।।

শ্রীকৃষ্ণ দিব্যশক্তি সম্পন্ন অলৌকিক লীলাময় এক মহান পুরুষ। অনুমান বা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে যার বিচার করা, বিশ্লেষণ করা, সম্যকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁকে জানতে গেলে লাভ করতে হবে তাঁর অনন্ত করুণা। কঠোপনিষদের ১.২.৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" এর অর্থ হল যে পার্থিব জগতের যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁর ঐশ্বরিক সত্যকে বিচার করা যায় না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন—

"অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার।।"
"অনুমান প্রমান নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।।
ঈশ্বরের কৃপা-লেখ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলেছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

—আমার ব্যাপ্তি, আমার যা স্বরূপ লক্ষণ, আমার যত রূপ, গুণ আর লীলা—আমার আশীর্বাদে সেই সকল তত্ত্ববিজ্ঞান তুমি উত্তমরূপে জানতে পারবে।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতেও এই ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় যখন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠেন—

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে, তুমি জানাও যারে সেই জানে।।

৩৮। গীতা প্রেসকৃত অনুবাদ

গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকেং শরণং ব্রজ।।" রবীন্দ্রনাথও হয়তো এই আহ্বান অন্তরে অনুভব ক'রে গ্রথিত করেছিলেন তাঁর অনাবিল প্রেম-ভক্তি রঞ্জিত সেই অমৃতময় প্রার্থনা—"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে।" এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।।

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্মের সকল প্রকার ধারণা, অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে পরিপূর্ণরূপে অকিঞ্চন হয়ে অর্থাৎ দেহ-মনের সমস্ত বিত্ত-গ্লানি-পূর্ণতা-অপূর্ণতা তাঁর পায়ে সমর্পণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে তাঁর পায়ে আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যেই জীবনের শান্তি ও সার্থকতা। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। ভক্ত মনেপ্রাণে চাইলেও সব সময় সফল হয় না। তাই তার অন্তর হয় বেদনার্ত। তাই তিনি থেকে যান ভক্তের কাছে অধরা যা ভক্তের অন্তরকে গভীরভাবে পীড়িত করে। রবীন্দ্রনাথও বোধকরি এই ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর অক্ষমতা তাঁকে নিবিড়ভাবে ব্যথিত করেছিল। তাই তাঁর হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে এক নিতান্ত আক্ষেপের বিলাপ ক্রন্দনের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে—

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি তোমারে নাথ-
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা।।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত, কতমতো-
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় ভক্ত রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়।।
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম।।

উপরের উদ্ধৃতিতে ভক্ত রামানন্দ রায় যে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় ও তাদের মধ্যে তার মতভেদের কথা বলেছেন সেই বিষয়টি চৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ প্রকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর।।
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ।।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।

এই সমস্ত রসের মধ্যে দাস্যরসকেই সর্বোত্তম বলে মনে করা হয়। সর্বদা নিজেকে সেই নন্দনন্দনের দাস অর্থাৎ সেবক রূপে গণ্য করে তাঁর ভজন-পূজন-আরাধনার মধ্যে ব্যাপৃত থাকলে কৃষ্ণের করুণালাভ সহজতর হয় কারণ অন্যান্য রসের ক্ষেত্রে ভক্তের অন্তরে কিছু না কিছু সুপ্ত অহংবোধ থেকে যেতে পারে। কিন্তু দাস্যরতির ক্ষেত্রে ভক্তের অন্তরে দীনভাব প্রকাশ পায় আর কৃষ্ণপ্রেমে এই লক্ষণটিই বৈষ্ণব ভক্তের প্রকৃত লক্ষণ।

কৃষ্ণের পূজার জন্য জাঁকজমক ও আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নেই। অতি সাধারণভাবে কয়েকটি তুলসীপত্র এবং একটু জল সহযোগে তাঁর পূজা করলেই তিনি সন্তুষ্ট।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ভক্ত রঘুনাথ রায়কে বলেন—

এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি।।

এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

জলেনাপি জগন্নাথঃ পুজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ।
পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষ্ণার্ত্তঃ সুজলৈর্যথা।।[৩৯]

৩৯। হরিভক্তিবিলাস—১৯শ বিলাস

অর্থাৎ যেরকম তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জললাভে সন্তুষ্ট হন তেমনই ভগবান হরি ভক্তিভরে জলদ্বারা পূজিত হলেও প্রীত হন।

গৌতমীয়তন্ত্রে নারদ বলেছেন যে ভক্ত যদি একটিমাত্র তুলসীপত্র এবং যৎসামান্য জলদ্বারা হরিকে পূজা করেন তাহলেও হরি ভক্তের কাছে কেনা হয়ে থাকেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে কৃষ্ণ স্বয়ং বলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

—"যিনি আমাকে তুলসীপত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি যা কিছু শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ভক্তের সেই ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করে থাকি।" (ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কৃত অনুবাদ)

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত অনেক অসুর, রাক্ষস প্রভৃতিকে সংহার ক'রতে হয়েছিল। আবার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্জুনকে অধার্মিক আত্মীয় পরিজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত ক'রতে হয়েছিল। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে অনেকে তাঁর চরিত্রের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারেন। তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি ভগবানই হবেন তাহলে কেন তিনি একের পর এক নরহত্যা করেন? কেন তিনি অপরকে আত্মীয়-পরিজনসহ অসংখ্য নরহত্যা সংঘটিত করার নিমিত্ত যুদ্ধ ক'রতে প্ররোচিত করেন? এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে সেই সমাজে এই বিশ্ব চরাচরের সুরাসুর সকলে তাঁকে তাঁদের পালক ও রক্ষাকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন সেই সমাজের সুপ্রীম কোর্ট, দুর্বৃত্তের দণ্ডাদাতা। বর্তমান সমাজে শীর্ষতম আদালতের বিচারপতি কোন জঘন্য অপরাধীর অপরাধ সম্যকভাবে বিচার ক'রে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশদান করলে সমাজ নিশ্চয় সেই বিচারককেই 'খুনি' আখ্যা দেবে না; বরং সেই জঘন্য অপরাধীকে শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি দিলে সমাজের মানুষ হতাশাগ্রস্ত হবে। ঠিক এ কারণেই বৃহত্তর সমাজকল্যাণের স্বার্থে শ্রীকৃষ্ণকে দুর্বৃত্তের উপযুক্ত দণ্ডবিধানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। নচেৎ তাঁর মতো একজন অমিত শক্তিধর পুরুষ যাঁকে সমাজের আপামর জনসাধারণ ভরসা করতেন, তিনি তাঁদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতেন। আর প্রত্যেকটি দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন। কোন রকম্ অন্যায় ব্যক্তিগত আক্রোশের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি কোন হত্যালীলা সংঘটিত করেন নি।

বস্তুত তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বীয় মহিমা প্রচার করতে গিয়ে কোথাও ছলনা বা কৌশল বা ধর্মভীরু মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। যা কিছু সত্য, যা কিছু শাশ্বত, যুক্তিপূর্ণ, সুবিবেচনান্তে গ্রহণযোগ্য সে কথাই তিনি লোকহিতার্থে প্রচার করেছেন। কিন্তু সেখানে

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করা হয় নি; মানুষের স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আবার শ্রীমদ্ভগবদগীতার 'মোক্ষযোগ' অধ্যায়ে সর্বশ্রেণীর মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, ''সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণম্ ব্রজ।'' এ কিন্তু কোনও ধর্মপ্রচার নয়। তৎকালীন চূড়ান্ত সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার আবহে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এটাই অভিপ্রেত ছিল। কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে মহাসংগ্রাম চলছে। মুহূর্তে মুহূর্তে রথী-মহারথীরা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে সহস্র সহস্র নাগরিকগণ রক্ষাকর্তা বিহীন হয়ে পড়ছেন, উদভ্রান্তের মত কে কোথায় পরিবার পরিজন সহ পলায়ন ক'রে জীবন রক্ষা করবেন সেই চিন্তায় ব্যাকুল, কার প্রভু ভাল, কার প্রভু মন্দ সে বিচারের সময় তাদের নেই। এমত অবস্থায় সমস্ত অসহায় মানুষদের একটিই আন্তরিক কামনা-একটি নিরাপদ আশ্রয় ও পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা। আর সেই উপযুক্ত সময়ে সেই উপযুক্ত কাজটিই করেছেন সর্বজন-হিতকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অবস্থার অভিঘাতে বিভ্রান্ত, বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষদের তাই পূর্ণ অভয় দেওয়ার মানসে সকলের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—মাভৈ! তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তোমাদের সকলকে আশ্রয় দেব, রক্ষা করবো। ঐ রকম অশান্ত, অনিশ্চিত সামাজিক পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন প্রবল পরাক্রান্ত অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের কাছে সমাজের এটিই কাম্য ছিল। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ যিনি যুদ্ধ-বিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন, যাঁর অনুপ্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় গাণ্ডীব ধারণ ক'রেছিলেন, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল, সমাজের আক্রান্ত মানুষের কাছে এটাই ছিল তাঁর যুদ্ধান্তে প্রথম কর্তব্য। তা না হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটানোর দায়ে তিনি অপরাধী হয়ে থাকতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে আর ধর্মযুদ্ধ বলা যেত না। তাই যে যুদ্ধ তিনি জগতের কল্যাণের জন্য সংঘটিত করেছিলেন, তার জন্য তিনি যুদ্ধোন্মাদ ব'লে পরিচিত হতেন। কাজেই তাঁর এই আহ্বানের মধ্যে কোন ধর্মীয় গন্ধ ছিল না, যা ছিল তা হল সমাজের প্রতি শুভ কর্তব্যবোধ যা কখনই নিন্দনীয় বা বিতর্কমূলক নয়।

তৎকালীন সমাজে তাঁকে কিরকম ভাবে ন্যায়দণ্ডধারী হিসাবে স্বীকার করা হতো তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়র পঞ্চম শ্লোকে দেখি দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—"...দণ্ডং ভগবান বিভর্ষি ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায়"। অর্থাৎ তিনি দুষ্টের দমনের জন্য দণ্ড ধারণ করেন। তিনি ত্রিজগতের স্রষ্টা, পালক ও রক্ষাকর্তা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডধারণ না করলে সৃষ্টিকে রসাতলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? একজনকে তো এই দায়িত্ব নিতেই হবে। আর সেই সমাজে একাজের জন্য তাঁর চাইতে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। তাই ন্যায়দণ্ড ধারণ ক'রে কংস, শিশুপাল, ভৌমাসুর প্রভৃতির মত মহা অত্যাচারীদের তাঁর স্বহস্তে শাস্তি বিধানের মধ্যে কোন গ্লানি ছিল না। তাই ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের দণ্ড ধারণ সম্পর্কে বলেছেন—

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্।।

ভা ১০।২৭।৬

—"আপনি জগতের পিতা, গুরু ও অধীশ্বর। জগতের নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডধারী অনিস্তার কালও আপনি। ভক্তগণের প্রার্থনাপূরণ ও জগতের কল্যাণের জন্য আপনি স্বেচ্ছায় লীলাশরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়ে থাকেন, এবং আমাদের মতো যারা নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে ক'রে অভিমানে মত্ত হয়, তাদের সেই মিথ্যা মান-গর্ব ধূলায় মিশিয়ে দেবার ছলে নানাবিধ লীলা বিস্তার করেন।"

শ্রীকৃষ্ণের এই দণ্ডধারণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত-টীকাকার শ্রীধর উপরোক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন—"ত্বং পিতা জগতাং জনকঃ। গুরুরুপদেষ্টা অধীশো নিয়ন্তা ইতি দণ্ডধারণে হেতুত্রয়ম্। কালত্বাৎ সমর্থঃ। তস্মাদুপাত্তদণ্ডোঽহিতায় কল্যাণায় স্বেচ্ছাতনুভির্লীলাবতারৈঃ সমীহসে। তব সমীহালীলৈব জগদীশমানিনামস্মাকং মানবিধুননমিত্যর্থঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁর এই ভূমিকা অস্বীকার করেন নি। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে তিনি যে দণ্ডধর একথা দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা ক'রেছেন—"মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।"

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় দোষের কারণ, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সেসব খাটে না। পার্থিব জগতের কোন বিষয়ে তাঁর কোন বন্ধন হয় না। শ্রীশুকদেব বিষয়টি খুব প্রাঞ্জল ভাষায় ও উপস্থাপিত করেছেন—

"যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রাভববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াঽঽত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ।।

ভা ১০।৩৩।৩৫

—যাঁর শ্রীপাদপদ্মরেণুর সেবায় ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হ'য়ে, যোগবলে যাঁকে লাভ ক'রে যোগীগণ কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে, এবং জ্ঞানীগণ যাঁর তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়ায় বন্ধনমুক্ত অবস্থায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করে, আপন ইচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিভাবে বন্ধন হবে?

সত্যই তাই! অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে অসমর্থ। কারণ তাদের ও শ্রীকৃষ্ণের মাঝে মায়ার একটা পর্দা ঝোলানো আছে। ফলে তারা যা দেখে তা অস্পষ্ট, অসত্য। বস্তুত পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় আছে যা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান হলেও বাস্তবে অস্তিত্বহীন। উর্ধ্বগগনে দৃষ্টিপাত করলে সতত পরিদৃশ্যমান হয় সুনীল আকাশ। কিন্তু বাস্তবে তা অস্তিত্বহীন। আমরা আকাশকে নীল দেখি কারণ আমাদের দৃষ্টি অতদূরে পৌঁছাতে পারে না। ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় কর্মের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে আমাদের দৃষ্টি তথা অনুধাবনশক্তি পৌঁছাতে অসমর্থ। তাই অজ্ঞানতার অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু দ্বারা অতত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ যা দেখে তা সত্য নয়; নিছক দৃষ্টিভ্রম মাত্র। সাধারণ মানুষের স্থূল ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে বিচার করা যায় না। উষর মরুভূমির বুকে বালুরাশির উপর সূর্যালোকের প্রতিফলন দেখে নিষ্পাপ মৃগ তৃষ্ণার জলভ্রমে ছুটে চলে। তার কাছে এই জলের ধারণা ভ্রান্ত নয়, সত্য। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর বিচারে সেটি জল নয়, নিছক মরীচিকা মাত্র। মৃগের ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি তাকে জল ভাবে। আমরা কুন্তীর মুখে ঠিক এই কথাই প্রতিধ্বনিত হতে শুনি—

নমস্যে পুরুষং ত্বাঽদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্।।

মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা।।
ভা ১।৮।১৮-১৯

—"আপনি সমস্ত জীবের অন্তরে ও বাইরে একভাবে অবস্থিত কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর; কারণ আপনি প্রকৃতির অতীত আদিপুরুষ পরমেশ্বর। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। ইন্দ্রিয়দ্বারা যা কিছু বুঝতে পারা যায় তাও আপনি এবং আপনিই যবনিকা দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। আমি অবোধ নারী, অবিনাশী পুরুষোত্তম আপনাকে কি করে চিনতে পারি? নাট্যরসানভিজ্ঞ মানুষ যেমন চরিত্রানুরূপ পোশাক পরা নটকে প্রত্যক্ষ দেখেও তাকে স্বরূপে চিনতে পারে না, সেইরকমই আপনাকে দেখেও চেনা যায় না।"

ষড়্বিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের অমলিন, নিষ্কলুষ অপাপবিদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপর একটি প্রয়াস হল ভৌমাসুরের ষোড়শসহস্র পত্নীকে তাঁর বিবাহ-প্রসঙ্গ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী ভৌমাসুরকে স্বহস্তে নিধন ক'রে তার ষোড়শ সহস্র পত্নীকে মুক্ত ক'রে তাদেরকে বিবাহ করেন। অসজ্জনেরা নিতান্ত মূঢ়তা বশতঃ এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর চরিত্রে নিরন্তর কলঙ্ক লেপন ক'রে এসেছেন। এই ঘটনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আদৌ কোন কলুষতাপূর্ণ দিক আছে কিনা তা বিচারের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ভৌমাসুরের মাতা ভূমিদেবীর মনোভাব কিরকম সেটা একবার জেনে নেওয়া যাক। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনষাট অধ্যায়ে দেখি যে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুরধার চক্রের আঘাতে গজারূঢ় ভৌমাসুরের কিরীট কুণ্ডল সমন্বিত মস্তক ভূলুণ্ঠিত হল—"সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলৎ।" চারিদিকে আত্মীয়-স্বজনদের গগন ভেদী হাহাকার ধ্বনির মধ্যে আবির্ভূত হলেন ভৌমাসুরজননী পরম শ্রদ্ধেয়া পৃথিবীদেবী। সদ্য পুত্রহারা শোকাতুরা জননী তিনি। সন্তান পাপী হোক বা অত্যাচারী, জননীর কাছে সন্তান সতত হৃদয়ের ধন। তাই পুত্রহন্তাকে দেখা মাত্রই শোকাতুরা জননী তীব্র ক্ষোভে জ্ব'লে উঠবেন, অভিশাপে তাঁকে বিদ্ধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও তিনি তা করলেন না। তিনি তখন মহান দেবতাগণের দ্বারা পূজিত বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৈজয়ন্তী ও বনমালা সহ প্রতপ্ত কাঞ্চনস্থ রত্নসমূহে সমুজ্জ্বল অদিতির কুণ্ডলদ্বয়, বরুণের ছত্র ও ইন্দ্রের মহামণিসমন্বিত মণিপর্বত অর্পণ ক'রে তাঁকে বরণ করলেন—

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে প্রতপ্তজাম্বুনদরত্নভাস্বরে।
সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ প্রাচেতসং ছত্রমথো মহাণিম্।।২৩।।

এরপর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে তাঁর স্তুতিগান করলেন—

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্! নমোঽস্তু তে।।২৫।।

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে।।২৬।।
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ।।২৭।।
অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে।।২৮।।
ত্বং বৈ সিসৃক্ষু রজ উৎকটং প্রভো
তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ।।২৯।।
অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি।
কর্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যাদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ।।৩০।।
তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং
ভীতঃ প্রপন্নার্তিহরোপসাদিতঃ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং
শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্।।৩১।।

—"হে দেবদেব! হে সর্বেশ্বর! হে শঙ্খচক্রগদাধর! আপনাকে নমস্কার। হে সর্বান্তর্যামিন্! আপনি ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ ক'রে থাকেন। আপনাকে নমস্কার।২৫।। পদ্মনাভ আপনাকে নমস্কার, পদ্মমালাধারী আপনাকে নমস্কার, কমললোচন আপনাকে নমস্কার, কমল-চরণ আপনাকে নমস্কার।।২৬।। বাসুদেব ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে নমস্কার। জগতের আদিকারণ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমপুরুষ আপনাকে নমস্কার।।২৭।। হে পরাবরাত্মন্! হে ভূতাত্মন্! হে পরমাত্মন্! স্বয়ং জন্মরহিত, এই বিশ্বের জনয়িতা, বৃহৎ স্বরূপগুণযুক্ত ও অনন্তশক্তিযুক্ত আপনাকে নমস্কার। হে প্রভু! আপনিই সৃষ্ট্যাদি কার্যে নির্লিপ্ত হয়েও জগৎসৃষ্টি করার ইচ্ছায় উৎকট রজোগুণ, জগৎ পালন

করার জন্য সত্ত্বগুণ এবং জগৎ সংহার করার জন্য তমোগুণ ধারণ ক'রে থাকেন। হে জগৎপতি! কাল, প্রকৃতি ও জীব আপনিই; আপনি পুরুষোত্তমও বটেন।।২৯।। হে ভগবন্! আমি (পৃথিবী), জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহংকার, মহত্তত্ব ও জীব, এই চেতনাচেতন কার্যসমূহ অদ্বিতীয় আপনাতেই বিদ্যমান আছে। আপনি ব্যতীত কিছুই নাই। আপনিই পরমকারণ; লোকপ্রসিদ্ধ যে বহুকারণবাদ, তা ভ্রমপূর্ণ।।৩০।। হে শরণাগত মানবের দুঃখহারী! ভৌমাসুর-পুত্র এই ভগদত্ত আপনার ভয়ে ভীত হয়ে পরেছে। এইজন্য আমি একে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে উপস্থাপিত করলাম। আপনি একে পালন করুন। আপনার অখিলের পাপনাশকারী করকমল এর মস্তকে স্থাপন করুন।।"৩১।।

এখন সহজেই অনুমেয় যে এই বিশ্বচরাচরের সর্বশ্রেণীর প্রতিভূ যাঁকে পরম পূজনীয় স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন; নরকাসুরের (ভৌমাসুরের অপর নাম) নিধনের অব্যবহিত পরেই সকলের কাছে পরম পূজনীয়া নরকাসুর-জননী পৃথিবী নিজে যাঁকে এরকম অবর্ণনীয় শ্রদ্ধেয় ভাষা ও ভক্তিতে বন্দনা করলেন, তিনি তার অব্যবহিত পরেই সর্বস্তরের মহাত্মাদের এত শ্রদ্ধা, ভক্তি, উচ্চ ধারণা সমস্ত কিছুকে ভেঙ্গে, চুড়ে তছনছ ক'রে দিয়ে নরকাসুরের ষোড়শ সহস্র বিধবা রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র তাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে বিবাহ করার মত অতীব হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন এরকম উৎকট আষাঢ়ে কল্পনা নিঃসন্দেহে অসুস্থ মস্তিষ্কপ্রসূত। যদি কারও শ্রীমদ্ভাগবতকে ধর্মগ্রন্থ ব'লে মানতে আপত্তি থাকে তবে এই মহাগ্রন্থকে এক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য ব'লে তাকে মানতেই হবে। সেক্ষেত্রে একথা ধ'রে নেওয়া কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে যে জগতে অতুল মহাকবি ব্যাসদেব যিনি তাঁর মহাকাব্যে যে মহান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটিকে এত বিরাট মহাগুণের অধিকারী ক'রে চিত্রিত করেছেন তাকে হঠাৎ এরকম কলঙ্কজনক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক'রে ফেলার মত এতবড় হঠকারিতার পরিচয় দেবেন? ব্যাসদেব তো দূরের কথা, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কোন সাহিত্যিকও একাজ করবেন না। ফলে একথা কখনই মেনে নেওয়া যায় না শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন মহাত্মা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে এরকম একটি কাজ করেছিলেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর পরমপবিত্র

চরিত্রে কালিমা লেপনের পূর্বে উত্তমরূপে বিচার ক'রে দেখা সমীচীন কোন পরিস্থিতিতে তিনি একাজ করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একথা সত্য যে ঐরকম একজন দুর্দান্ত পৃথিবীত্রাস অসুরের হাতে নিদারুণ অত্যাচারিতা ও নারীজীবনের চরমতম লাঞ্ছনার শিকার ঐসকল নারীগণ যখন তাদের চূড়ান্ত উৎপীড়কের নিধনকারী পরম শৌর্যবান সৌম্যমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন তখন তাঁরা তাঁকে 'মনসাবব্রিরেঽভীষ্টংপতিং দৈবোপসাদিতম্' অর্থাৎ দৈবকর্তৃক উপস্থাপিত পতি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে। একজন অত্যাচারী পুরুষের হাতে চূড়ান্ত উৎপীড়িত কয়েক সহস্র নারী মুক্ত হওয়ার পরপরই অপর একজন পুরুষকে দর্শনমাত্রই তাকে বিবাহ ক'রে ফেলার সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলবে এরকম হাস্যকর মানসিকতা নারী মনস্তত্ত্ব সমর্থন করে না। একজন নারীর পক্ষে কোন পুরুষকে পতি হিসাবে স্বয়ং নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অনেক সময় নিতে হয়। কিন্তু এখানে দেখি শ্রীকৃষ্ণকে ঐ অবস্থায় দর্শনমাত্র তাঁরা তাঁকে পতি হিসাবে কল্পনা ক'রেছিলেন। তাহলে এখানে প্রকৃত ঘটনা কি? আসল কথা হল ঐসমস্ত স্ত্রীগণ 'পতি' অর্থে Husbad মনে করেন নি। 'পতি' শব্দের অপর একটি অর্থ হল—রক্ষাকারী, পালনকর্তা—পা (পালন করা) ডতি কর্তৃ। নরকাসুর ঐ বিপুল সংখ্যক নারীদেরকে বলপূর্বক অপহরণ ক'রে তার ভোগ্যবস্তু হিসাবে বন্দী ক'রে রেখেছিলো। তাঁদের কাল অতিবাহিত হয়েছে নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। ঐ রকম দুর্দান্ত দানবের কবল থেকে কখনও যে তাঁরা উদ্ধার পাবেন এরকম আশা-ভরসা তাঁদের মনে ছিল না। তারপর হঠাৎ যখন তাঁরা একদিন প্রত্যক্ষ করলেন যে একজন অতি অপরূপ সৌন্দর্যময়, জগতের অতুলনীয় শৌর্যবান এক জ্যোতির্ময় পুরুষ সহসা অবতীর্ণ হয়ে সেই দুর্দমনীয় দানবকে স্বহস্তে সংহার ক'রে তাদেরকে শাপমুক্ত করলেন; তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম দর্শনেই তাঁকে তাঁদের 'পতি' অর্থাৎ রক্ষাকর্তা বলেই মনে হয়। কাজেই এত বিপুল সংখ্যক নারীর শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনেই 'পতি' অর্থাৎ Husband মনে করার যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তার কিঞ্চিৎ পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

যাই হোক আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনষাট অধ্যায়ে দেখি শ্রীকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ঐ ষোড়শ সহস্র রমণীগণকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্ত জেনেই যদি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে বহুগামিতার কালিমা সিঞ্চন করা হয় তাহলে এরকম একজন মহিমময় চরিত্রের প্রতি ক্ষমাহীন পাপাচার করা হবে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের আর একটু গভীরে অনুসন্ধান করলে সহজেই অনুধাবন করতে পারব শ্রীকৃষ্ণ কেন এই বিবাহ করেছিলেন, কিভাবে এই বিবাহ ক'রেছিলেন এবং এই বিবাহোত্তর জীবনের বৈশিষ্ট্য কি ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একজন আদর্শ প্রজাবৎসল রাজা। রাজ্যের সমস্ত প্রজাকুলের উপযুক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। তিনি আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সত্যের প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতীর বিনাশার্থে। তাই তিনি যখন শুনলেন যে পাপিষ্ঠ ভৌমাসুরের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত তখন স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ভৌমাসুরকে সংহার ক'রে সকলকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করলেন এবং তখনই নরকাসুরের ভবনে ভৌমাসুর কর্তৃক অপহৃতা বন্দিনী সেই রমণীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে—

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষটসহস্রাধিকাযুতম্।
ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ।।
ভা ১০।৫৯।৩৩

এর মধ্যে তাঁর কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। ভৌমাসুর কর্তৃক অপহৃত ভৌমাসুরের অন্তঃপুরে বন্দিনী ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয় কন্যাগণ যখন দেখলেন যে একজন পরম শৌর্যবান পুরুষ তাঁদের অত্যাচারী অপহরণকারীকে সংহার করেছেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের অন্তরে আশা জাগে এইবার হয়তো তাদের মুক্তি ঘটবে। সেইজন্য তাঁরা তাঁকে তাঁদের রক্ষাকর্তা ভেবে তাঁর চিত্তে নিজেদের পরিপূর্ণরূপে সমাহিত করলেন—"সর্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ।" শ্রীকৃষ্ণ তো শরণাগতবৎসল! শরণাগতকে উদ্ধার করার জন্য তিনি তো সদা ব্যাকুল। তাই সেই অসহায়া মহিলাগণ যখন তাঁর শরণ নেন তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উদ্ধার ক'রে তাৎক্ষণিক আশ্রয়দানের দ্বারকায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তারপরই যে বিশাল সমস্যাটির সৃষ্টি হ'ল সেটি হল—সেই বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল নারীদের পুনর্বাসন, সামাজিক নিরাপত্তা,

সামাজিক সম্মান ইত্যাদি বিষয়গুলির কি হবে? নরকাসুর তাদেরকে বলপূর্বক অপহরণ ক'রে এনেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের আর পিতৃগৃহে বা পূর্বতন স্বামীগৃহে আশ্রয় হবে না। সামাজিক সংস্কার এর পথে বিশাল বাধা। শ্রীকৃষ্ণের কাছেও এ এক গম্ভীর সমস্যা। কিন্তু তিনি তো জগৎপালক, জগতের আধার! ''বাসুদেবাখিলাবাস''[৪০]। এই বিশাল সমস্যার সমাধান তো তাঁকেই করতে হবে! তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে বিবাহ করাই সেই গভীর সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ বিবেচনা করলেন। কারণ তৎকালীন সমাজে নারীজীবনে বিবাহই ছিল সামাজিক সুরক্ষা ও সম্মান রক্ষার একমাত্র উপায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বিবাহ না ক'রে অন্যভাবে আশ্রয় দিলে তাঁদের সামাজিক সুরক্ষার অভাব হয়ত হত না; কিন্তু নারীজীবনের প্রাপ্য আত্মসম্মান লাভে তাঁরা বঞ্চিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় বিহীন আশ্রয়ে তাঁদের নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত পরান্নভোজী ভেবে নিদারুণ আত্মগ্লানি ভোগ করতে হত। তাছাড়া যতই তাঁরা সুরক্ষিত থাকুন, অন্তত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপহাস, কটূক্তির হাত থেকে তাঁরা রেহাই পেতেন না। শ্রীকৃষ্ণ মানব শরীর ধারণ ক'রে মানুষের মতই আচরণ করতেন যদিও অন্তরে তাঁর ঈশ্বর সত্ত্বা অটুট থাকত। তাই তিনি মানুষের এই সমস্ত খুঁটি-নাটি দুর্বলতার বিষয়গুলি সম্যক উপলব্ধি করতেন বলেই সামগ্রিক বিচারে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তিনি তাঁদেরকে বিবাহ ক'রে সামাজিক স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ভৌমাসুরকে নিধন করার পর শ্রীকৃষ্ণ ঐ সমস্ত রমণীগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করতে গেলেন কোন উদ্দেশ্যে? তাঁদেরকে পুনর্বাসন দেবার ইচ্ছাই যদি তাঁর ছিল তাহলে তিনি তো তাঁদেরকে ভৌমাসুরের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রেখেই তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে হয়ত এ ধরণের সমস্যার উদ্ভব হত না বা তাঁদেরকে বিবাহ করার তাঁর প্রয়োজন হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণ এরকম ব্যবস্থা করলে তাঁকে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের উপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হত এবং তাহলে তাঁকে প্রাগ্জ্যোতিষপুর অধিকার করতে হত। কিন্তু ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী যে

৪০। ভা ১০।৩৭।১১

পরমপুরুষ তাঁর তো পররাজ্য বা পরধনে কোন লোভ থাকতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যদিও মানবকুলকে নিতান্ত অত্যাচার ভোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কংস, শিশুপাল ইত্যাদি বহু অত্যাচারী রাজাকে নিধন করেছিলেন তথাপি তিনি কদাপি তাদের রাজ্য অধিকার বা সম্পদ হস্তগত করার কথা অন্তরে স্থান দেন নি এবং ভৌমাসুরকে নিধনের পরেও তাঁর এই মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নি বা তিনি ভৌমাসুরকৃত অপরাধের বোঝা তার পুত্রের স্কন্ধে অর্পণ করে আসেন নি। বস্তুত এ তাঁর সুমহান চরিত্রের এক অতি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর চরিত্রের এই অতি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যুগে যুগে পররাজ্যলোভী সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যে এহেন কুকার্য হতে নিরস্ত হবার বারতা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, এই বিবাহের পদ্ধতি ও বিবাহোত্তর জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রের নিষ্কলুষ দিকটি প্রকটিত করে। তিনি ষোড়শ সহস্র রমণীকে একই সময়ে, একই লগ্নে, এক সঙ্গে ষোড়শ সহস্র অবয়ব ধারণ ক'রে বিবাহ করেছিলেন—

অথো মুহূর্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ।।

ভা ১০।৫৯।৪২

বিবাহের পরে তিনি প্রত্যেকের গৃহে একই সঙ্গে উপস্থিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন লীলা করতেন। এ কি ঐশ্বরিক সত্ত্বা ব্যতীত কোন পার্থিব মানুষের পক্ষে সম্ভব? কখনই নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি ঐ সমস্ত পত্নীদের নিকট রক্ত-মাংসের শরীরে নয়, মায়ারূপ ধারণ ক'রে গিয়েছিলেন। ফলে পার্থিব নর-নারীদের বিবাহিত জীবনে যে শরীরী সম্পর্ক থাকে তা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই এই সম্পর্ক নির্মল, নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ, পবিত্র, অপার্থিব ও সর্বোপরি ঐশ্বরিক। একদা দেবর্ষি নারদ কৌতূহল বশতঃ এই সমস্ত পত্নীদের গৃহে গৃহে গমন ক'রে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন লীলামগ্ন অবস্থায় দর্শন ক'রে নিতান্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। মুহূর্তকাল পূর্বে যে এক গৃহের মূর্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তা যেন অন্য গৃহের মূর্তি অণুমাত্র অবগত নয়। ''ইহা কিন্তু যোগদর্শনের কায়ব্যূহ নয়, ইহার নাম

মুখ্যপ্রকাশ।"[৪১] তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলেছেন—

মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে রাসে।
ইহাকে জানিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশে।।

কোন চরিত্রের প্রতি নির্বিচারে কলঙ্ক নিক্ষেপ করা কোন বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারে না। সমগ্র পরিস্থিতি ও পারিপার্শিকতা উপযুক্তরূপে বিবেচনা ক'রে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করলে সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করা যাবে তৎকালীন সমাজে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কী উচ্চধারণা করা হতো এবং তাহলেই নিশ্চিৎ ভাবে অনুভূত হবে যে এতবড়ো শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে আসীন যিনি তিনি কোন পার্থিব কলুষতায় লিপ্ত হতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজা পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যে পরমশ্রদ্ধার বাণী ইচ্চারণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের পরম স্বর্গীয় অপার্থিব বৈশিষ্ট্যের বন্দনা করে—

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ।
দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ।।৯
স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্তাহত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ।।১০

—"সর্বভূতময় জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা যাঁর কৃপায় জগৎসৃষ্টি ক'রে থাকেন, যাঁর অনুগ্রহে তাঁর নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়েও ব্রহ্মা যাঁর স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সর্বান্তর্যামী— সেই পরমপুরুষ প্রকৃতির (মায়ার) নিয়ন্তা হয়েও স্বশক্তিভূতা প্রকৃতিকে অতিক্রম করে মায়াসম্বন্ধশূন্য...."[৪২]

আবার দ্বারকাবাসীদের চোখে তিনি এমনই পরমপুরুষ যাঁর শ্রীপাদপদ্মে ব্রহ্মা, মহাদেব ও ইন্দ্র পর্যন্ত বন্দনা করেন, যে পাদপদ্ম এই জগতে পরম কল্যাণকামীর কাছে সর্বোত্তম আশ্রয়, যার শরণ নিলে মহাশক্তিশালী কালও

৪১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৪২। গীতাপ্রেসকৃত অনুবাদ

সেই শরণাগতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে দেখি কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের পর পাণ্ডবদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'রে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলে পরমানন্দপ্রাপ্ত দ্বারকাবাসীগণ তাঁকে প্রণাম ক'রে বলেন—

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ।।

ব্রহ্মসংহিতার ৫/৫০ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণাম জানিয়ে বলা হয়েছে—

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

অর্থাৎ গণেশ যিনি ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশের কর্তা তিনিও এই ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশকালে পর্যাপ্ত শক্তি অর্জনের মানসে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলদ্বয় তাঁর মস্তকে ধারণ করতেন।

অগস্ত্যসংহিতায় বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে গাণপত্য, শৈব, শাক্ত, সৌর প্রভৃতি যতপ্রকার মন্ত্র প্রচলিত আছে সেই সমুদায় মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব মন্ত্র অর্থাৎ কৃষ্ণমন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তের ঈপ্সিত অভিলাষ পূরণের সহায়ক হিসাবে এই মন্ত্রই সর্বোত্তম—

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদং।।

গোপালদেবের মন্ত্রমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মূল এবং শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রই সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন—

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ।।

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাখ্য নামক স্থানেও একই ভাবে

প্রচারিত হয়েছে যে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম। বিশেষতঃ এই মন্ত্রই ভোগ ও মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন দেবতা আছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই সকল দেবতাগণের দেবতা। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম। তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ মাত্রই তাঁর মন্ত্রসমূহ ভুক্তি-মুক্তি ফলদানে সক্ষম হয়ে ওঠে—

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্চতে
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈসাধনং।।
যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ।
অভেদাত্তন্মনূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে।।
কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।। ইতি

কূর্মপুরাণে কৃষ্ণের পূজার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁর পূজা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকার পুণ্যজনক বৈদিক কর্ম নাই—

ন বিষ্ণুরারাধনাৎ পূণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকং।
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিং।।

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয় সংবাদে উল্লিখিত আছে যে মানুষের যতপ্রকার ধর্মকর্ম আছে তারমধ্যে ভগবান বিষ্ণুর অর্চনাই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। বস্তুত সমস্তপ্রকারের যাগ-যজ্ঞ-হোম-তপস্যা-তীর্থভ্রমণ প্রভৃতিতে যত ফললাভ হয়, তার কোটিগুণেরও বেশী ফললাভ এক বিষ্ণু পূজায় হয়ে থাকে—

বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাচ্চ ধর্ম্মো বিষ্ণুর্চ্চনং নৃণাং।
সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমস্তীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলং।।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সংপূজ্য চাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ।।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে বলা হয়েছে যে মহাঘোর এই সংসার নিয়ত জন্ম-মৃত্যু ভয়ে আকুল। এই মহাঘোর সুগভীর পারাবার অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হল বাসুদেবের পূজার্চনা—

সংসারেঽস্মিন মহাঘোরে জন্মমৃত্যু ভয়াকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতং।।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায় যে মহারাজ পৃথু তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিয়ে বলছেন যে একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হলেন সমগ্র জীবকুলের মুক্তিদাতা। তিনি ব্যতীত অপর কারও জীবকুলকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা নাই। হরিপূজা কোন সামান্য বস্তু নয়। তাঁর পূজার অভিলাষ তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ নির্গতা গঙ্গাদেবীর মত নিয়ত বৃদ্ধিশীল হয়ে সংসারতাপতাপিত ভক্তের অন্তরের তাপ ও গ্লানি, মালিন্য প্রভৃতি ধৌত করে তার চিত্তে সাত্ত্বিক বাসনার বৃদ্ধি ঘটায়—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ।।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে সুমধুর বীণাধ্বনি সহযোগে নারদমুনির কণ্ঠ নিসৃত সঙ্গীতে শ্রুত হয়—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অর্থাৎ হরিনামই আমার জীবন এবং কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি নাই।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে জগৎপূজ্য জগন্নাথ জননীর ন্যায় এই বিশ্বসংসারকে রক্ষা করেন; তিনিই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকারী। যে ব্যক্তি সেই নারায়ণকে পূজা না করেন তিনি ব্রহ্মঘাতীর সমতুল্য।—

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকং।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকং।।

হরবীর্ষপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে যে যতদিন দেহে প্রাণ থাকে ততদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত কোনপ্রকার প্রতিমার অর্চনা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যু বা শিরচ্ছেদ অধিকতর বরণীয়—

প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণস্য বা ত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্।। ইতি

নৃসিংহপুরাণে শ্রীব্যাস ও শুকদেবসংবাদে মার্কণ্ডেয় ও মৃত্যুঞ্জয় সংবাদের পর উল্লিখিত হয়েছে যে একদা যমরাজ এক ব্যক্তিকে নরকে পচতে দেখেন। তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে নারায়ণ সামান্যতম জলদ্বারা পূজিত হলেই প্রসন্ন হয়ে ভক্তের দুঃখ-দুর্গতি মোচন করেন, যাঁকে কেবলমাত্র স্মরণ করলেই তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, কেন সে সেই নারায়ণের পূজা করে নাই—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিন্ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ।
উদকেনাপ্যলাভে তু দ্রব্যাণাং পূজিতঃ প্রভুঃ।
যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ।।
নরসিংহো হৃষিকেষঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
স্মরণান্মুক্তিদে নৃণাং স ত্বয়া কিং ন পুজিতঃ।

গোপালতাপনী উপনিষদের পূর্বভাগের চৌত্রিশ মন্ত্রে বলা হয়েছে বাসুদেব জ্ঞানময়, জ্যোতিঃ স্বরূপ, অবিদ্যামল রহিত, মনস্তাপ শূন্য এবং অশেষ রাগাদিসঙ্গবিরহিত কেবল বিশুদ্ধ গুণযুক্ত। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই—

ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদি নিরস্তসঙ্গম্।
যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি।।

ঐ উপনিষদের পূর্ববিভাগের অন্তিম মন্ত্রে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্তব করে বলেন—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যয়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম। সেজন্য তাঁর ধ্যান, রসন ও ভজন করা কর্তব্য।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে বলা হয়েছে, "নাস্তি শ্রেয়োত্তমং নৃণাং বিষ্ণোরারাধনাৎ পরং" অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নেই।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে এমন একটি অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যার পরে তাঁর সম্পর্কে আর কোন প্রকার হীন, হাল্কা বা তুচ্ছ মন্তব্য করার অবিসংবাদিতভাবে কোন অবকাশ থাকে না এবং

সর্ব গুণে গুণান্বিত হিসাবে তাঁকে সর্ব দেব-দেবীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং অগ্রগণ্য হিসাবে পূজিত বলে গ্রহণ করতেই হয়। আর এধরণের যোগ্যতা একমাত্র তিনিই অর্জন করতে পারেন যিনি সার্বিকভাবে নির্মল, নিষ্কলুষ, পূতচরিত্র। ফলে কিছু কিছু পৌরাণিক গ্রন্থে ও বৈষ্ণব রসসাহিত্যে তাঁর চরিত্রকে যেভাবে হীন ও অতি হাল্কা রসে সিক্ত করে তাঁর মধ্যে পরমেশ্বরের লীলা দর্শনের প্রয়াস করা হয়েছে তা তাঁর প্রতি নিতান্তই অসমীচীন ও অসৌজন্যমূলক অপপ্রচেষ্টা মাত্র বলে প্রতীয়মান হয়।

যাইহোক এবিষয়টি লিখিত আছে নারপঞ্চরাত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমরাত্রে। এখানে দেখা যায় যে একদা যখন ব্যাসদেব তাঁর প্রিয় পুত্র শ্রীশুকদেবের সঙ্গে নারদপঞ্চরাত্রের বিশদ বৃতান্ত বিষয়ক আলোচনায় রত তখন ব্যাসদেব সহসা একটি আকাশবাণী শ্রবণ করলেন যাতে বলা হয়েছে—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

—যদি হরির আরাধনা করা হয় তাহলে আর (অন্য) তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি হরির আরাধনা করা না হয়তাহলে আর (অন্য) তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি হরি অন্তর ও বাহিরে বিরাজ করেন তাহলে আর (অন্য) তপস্যার কি আবশ্যক? আবার যদি হরি অন্তর ও বাহিরে বিরাজ না করেন তাহলে আর (অন্য) তপস্যার আবশ্যক (লাভ) কি?

একথার মর্মার্থ হল যে এই বিশ্বে কৃষ্ণ হলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আরাধ্য দেবতা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজন-পূজন করলে অন্য কোন প্রকার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজন-পূজন না করলে অন্য কোন প্রকার সাধন-ভজন নিষ্ফল। অর্থাৎ কৃষ্ণময় এ জগৎ। কৃষ্ণ ব্যতীত কিছু নেই। কৃষ্ণই শেষ কথা। মানুষের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এতদপেক্ষা উচ্চ আসন আর কিছু থাকতে পারে না। নারীলোলুপতার মত হীন কলঙ্কের মসীলিপ্ত কোন ব্যক্তিকে কি বৃহত্তর সমাজ এহেন উচ্চ সম্মান দিতে পারে? কদাপি নয়।

গোপালতাপনী উপনিষদের পূর্বভাগে বাসুদেব-স্তুতি অংশে প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে বলছেন—

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।।
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।। ইতি

—হে ভগবান্ গোবিন্দ! আপনিই এই সমগ্র বিশ্বের রূপ, বিশ্বের সকল বস্তুতে আপনিই বিরাজমান, আপনিই এই বিশ্বের অধীশ্বর, এই বিশ্বের আত্মা। আপনাকে প্রণাম। আপনি জ্ঞানময় পরমানন্দস্বরূপ, গোপীজনের নাথ। আপনাকে প্রণাম।

হরিভক্তিসুধোদয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে নিবেদন করেন—

প্রাণানাং প্রাণভূতায় চক্ষুষাঞ্চক্ষুষে নমঃ।
শ্রোত্রানাং শ্রোত্রভূতায় মনসাং মনসে নমঃ।।

—প্রভো! তুমি সমস্ত প্রাণের প্রাণ স্বরূপ এবং তুমি সমস্ত চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত কর্ণের কর্ণস্বরূপ এবং তুমিই সকল চিত্তের চিত্তস্বরূপ। তোমাকে নমস্কার।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রারম্ভে ব্রহ্মার পুত্র নারদ কৃষ্ণের প্রতি স্তুতি করে বলেন—

গণেশশেষব্রহ্মেশদিনেশপ্রমুখাঃ সুরাঃ।
কুমারাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ।।১
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা।
ভক্ত্যা নমন্তি যং শশ্বত্তং নমামি পরাৎপরং।।২
ধ্যায়ন্তে সন্ততং সন্তো যোগিনো বৈষ্ণবাঃ সদা।
জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং।।৩
ধ্যায়ে তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং।
নিরীহমতিনির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।।৪

সর্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্বকারণকারণং।
সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ং।।৫
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলালয়ং।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ধাম ভগবন্তং সনাতনং।।৬
স্তুবন্তি বেদা যং শশ্বন্নান্তং জানন্তি যস্য তে।
তং স্তৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনং।।৭

—গণেশ, শেষনাগ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও আদিত্যাদি দেবগণ, সনৎকুমারাদি মুনিগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ তথা লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি যাঁহাকে নিরন্তর ভক্তিভাবে নমস্কার করেন, সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। এতদ্ব্যতীত সাধুগণ, যোগীগণ ও বৈষ্ণববৃন্দ অতুলনীয় জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্যামরূপ যে কৃষ্ণের ধ্যান করেন, নিতান্ত নির্লিপ্ত পরমাত্মা, পরমেশ্বর, নিরীহ, নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত সেই পরমব্রহ্মকে ধ্যান করি। (১-৪)। তিনিই সকলের ঈশ্বর, সর্বরূপী, সর্বকারণের কারণ, নিত্য সত্য এবং পুরাণ ও অব্যয় পুরুষ।৫। তিনিই মঙ্গলময়, মঙ্গলার্হ, মঙ্গল, মঙ্গলালয়, স্বেচ্ছাময়, সনাতন। সেই পরমধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বেদ সকল নিরন্তর স্তব করেও তার অন্ত পায় না সেই পরমানন্দ আনন্দের বিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের স্তব করি। ৬-৭)

বামনপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তুতি করে বলেন—

কস্ত্বাং জেতুং প্রভো শক্তঃ কস্তত্তঃ পুরুষোধিকঃ।
ত্বং হি নারায়ণোঽনন্তঃ পীতবাসা জনার্দনঃ।।৪৮
ত্বং দেবঃ পুণ্ডোরীকাক্ষস্ত্বং বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গচাপধৃক্।
ত্বমব্যয়ো মহেশানঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ।।৪৯
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি চার্চয়ন্তি মনীষিণঃ।
জপন্তি স্নাতকাস্ত্বাং চ যজন্তি ত্বাং চ যাজ্ঞিকাঃ।।৫০
ত্বমচ্যুতো হৃষিকেশশ্চক্রপাণির্ধরাধরঃ।
মহামীনো হয়শিরাস্ত্বমেব বরকচ্ছপঃ।।৫১
হিরণ্যাক্ষরিপুঃ শ্রীমান্ ভগবানশ্চ সূকরঃ।

মৎপিতুর্নাশনকরো ভবানপি নৃকেসরী।।৫২
ব্রহ্মা ত্রিনেত্রোঽমররাড় হুতাশঃ
প্রেতাধিপো নীরপতিঃ সমীরঃ।
সূর্যো মৃগাঙ্কোঽচলজঙ্গমাদ্যো
ভবান্ বিভো নাথ খগেন্দ্রকেতো।।৫৩
ত্বং পৃথ্বী জ্যোতিরাকাশং জলং ভূত্বা সহস্রশঃ।
ত্বয়া ব্যাপ্তং জগতসর্বং কস্ত্বাং জেষ্যতি মাধব।।৫৪
ভক্ত্যা যদি হৃষিকেশ তোষমেষি জগদগুরো।
নান্যথা ত্বং প্রশক্যোঽসি জেতুং সর্বগতাব্যয়।।৫৫

—হে প্রভু! আপনাকে কে জয় করতে পারে? আপনার চাইতে বড় আর কে আছে? আপনি অনন্ত নারায়ণ পীতাম্বরধারী জনার্দন। আপনিই ধনুর্ধর বিষ্ণু। আপনি অব্যয় মহেশ্বর, তথা পরম পুরুষোত্তম। যোগীগণ আপনার ধ্যান করেন, বিদ্বান ব্যক্তিগণ আপনার অর্চনা করেন, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনার নাম জপ করেন, ঋত্বিকগণ আপনার পূজা করেন। আপনি অচ্যুত, হৃষিকেষ, চক্রপাণি, ধরণীধর, মহামৎস, হয়গ্রীব মহাকচ্ছপ (কূর্ম) প্রভৃতি অবতার। আপনি হিরণ্যাক্ষদৈত্যদলনকারী পরমৈশ্বর্যময় বরাহ অবতার, আপনিই আমার পিতার উদ্ধারকারী ভগবান নরসিংহ। আপনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ এবং বায়ু। হে গরুড়ধ্বজ। আপনি সূর্য, চন্দ্র, আকাশ এবং স্থাবর-জঙ্গমের আদি কারণ। আপনার সহস্র রূপের কিরণজ্যোতিজালে আপনি সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত ক'রে থাকেন। হে মাধব! আপনাকে কে জয় করতে পারে? হে জগদগুরু হৃষিকেশ জনার্দন! আপনি একমাত্র ভক্তিতেই তুষ্ট হন। হে সর্বগত! হে অবিনাশী! আপনাকে অন্য কোন প্রকারে জয় করা যায় না।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মানারদসংবাদে বলা হয়েছে যে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন এই কলিকালে সর্বদা শ্রীহরির পূজাই বিধেয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরির পূজা করলে সকল দেবতার পূজাই সুসম্পন্ন হয়। সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ সর্ব সুরাসুরের প্রণম্য শঙ্খচক্রগদাধারী কেশবের ভক্তিভরে আরাধনা করলে লোকসকলকে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না—

যুগেঽস্মিন্ তামসে তস্মাৎ সততং হরিমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ সুর্য্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
অর্চ্চিতে সর্ব্বলোকেশে সুরাসুরনমস্কৃতে।
কেশবে কেশিকংসঘ্নে ন যাতি নরকং নরঃ।।

স্কন্দপুরাণে ধ্রুবের প্রতি মার্কণ্ডেয় বলেন—

সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন দেবদেবো জনার্দনঃ।
স প্রাপ্নোত পরমং স্থানং সত্যমেতন্ময়োদিতং।।

—আমি সত্য করে বলছি, যে ব্যক্তি অন্তত একবার মাত্র দেবদেব জনার্দনের অর্চনা করেন তিনি পরম পদ লাভ করেন।

এই পুরাণে আমরা অঙ্গিরাকে বলতে শুনি—

যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবেদং যস্য নান্তো মহাত্মনঃ।
তমারাধায় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি।।

—যদি তুমি সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করতে চাও তাহলে যাঁর অন্তরে এই নিখিল বিশ্ব বিরাজমান এবং যিনি অন্তবিহীন সেই অনন্ত গোবিন্দের আরাধনা কর।

পুলস্ত বলেন—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ শাশ্বতপুরুষঃ।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাং।।

—যিনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং নিত্যপুরুষ সেই হরিকে আরাধনা করলে দুর্লভ মুক্তিও লাভ করা যায়।

পুলহ বলেছেন—

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিং।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধায় সুব্রত।।

—হে সুব্রত! যে জগৎপতি যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা করে দেবরাজ ইন্দ্র সুরপতি হতে সমর্থ হয়েছিলেন তুমি সেই বিষ্ণুর আরাধনায় ব্রতী হও।

বশিষ্ঠ বলেছেন—

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্যদিচ্ছতি।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু সর্ব্বোত্তমোত্তমং।।

—যখন বিষ্ণুর অর্চনা করলে সর্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠ লাভ হয়ে থাকে তখন মনে মনে (তাঁর নাম স্মরণ করে) ইচ্ছা প্রকাশ করলে অন্যান্য উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করা যায় এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাশীখণ্ডে উল্লেখ আছে—

হরেরারাধনং পুংসাং কিং কিং ন কুরুতে বত।
পুত্রমিত্রকলত্রার্থং রাজ্যস্বর্গাপবর্গদং।।
হরত্যঘং ধ্বংসয়তি ব্যাধীনাধীন্নিরস্যতি।
ধর্ম্মং বিবর্দ্ধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতি মনোরথং।।

—হরির আরাধনার ফলে মানুষ পুত্র, মিত্র, কলত্র, রাজ্য, স্বর্গ, অপবর্গ প্রভৃতি কি না লাভ করতে পারে? হরির আরাধনার ফলে পাপ ধ্বংস হয়, রোগব্যাধি দূর হয় এবং ধর্মবৃদ্ধি ও সর্বপ্রকার মনোরথসিদ্ধি হয়।

অগস্ত্যসংহিতায় বলা হয়েছে—

আরাধ্যৈব নরো বিষ্ণুং মনসা যদ্যদিচ্ছতি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিহতং ভুরি স্বল্পমথ্যপি বা।।

—মানুষ অন্তরে অল্প বা অধিক যা কিছু কামনা করে বিষ্ণুর আরাধনার ফলে সে তার অধিক পেয়ে থাকে।

বিষ্ণুপুরাণে মরীচি বলেন—

অনারাধিতগোবন্দের্নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ।
ন হি সংপ্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতং।

—হে নৃপনন্দন! গোবিন্দের আরাধনা ব্যতীত উত্তম স্থান লাভ করা যায় না। সেজন্য তুমি অচ্যুতের আরাধনা কর।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লেখ আছে—

যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি।
যন্নাভিনলিনাদাসীদ্বহ্মা লোকপিতামহঃ।

যদিচ্ছাশক্তিবিক্ষোভাদ্ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবসংক্ষয়ৌ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি।

—যদি উৎকৃষ্ট স্থান লাভের বাসনা থাকে তাহলে যাঁর পাদোদক মস্তকে ধারণ করে শিব নৃত্য করে থাকেন, যাঁর নাভিকমল থেকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি, যাঁর ইচ্ছাশক্তিতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ঘটে থাকে সেই গোবিন্দের আরাধনা কর।

হরিভক্তিসুধোদয়ের অষ্টম অধ্যায়ের তেতাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে প্রহ্লাদকে তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বলতে শুনি—

ন সোঽস্তি তনুভূল্লোকে যোঽনন্তাৎ প্রেরিতঃ স্বয়ং।
ব্রবীতি ভুঙ্ক্তে পিবতি চেষ্টতে চ শ্বসিত্যপি।।

—জগতে এমন কোন শরীরধারী জীব নাই যে অনন্ত বিশ্বময় হরি কর্তৃক প্রেরিত না হয়ে স্বয়ং বলতে পারে, ভোজন করতে পারে, পান করতে পারে, শারীরিক কোন প্রকার চেষ্টা করতে পারে এমন কি নিশ্বাস পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারে।

কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথও একথাই বলার প্রয়াস করেছেন নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে—

অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।
গিরি উঠিয়াছে ঊর্ধ্বে তোমারই ঈঙ্গিতে,
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সংগীতে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের একশত ত্রিশ অধ্যায়ের চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে সনৎকুমার বলেন—

সর্ব্বেষু চ পুরাণেষু বেদেষু চ চতুর্ষু।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নাস্ত্যেব কৃষ্ণমন্ত্রাৎ পরো মনুঃ।।

—সমস্ত পুরাণ, চতুর্বেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের কোথাও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের উপর কোন মন্ত্র নেই।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের প্রথম লহরীতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এমন একটি মহোত্তর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন যার তুলনা পৃথিবীর আর কোন চরিত্রের মধ্যে বোধকরি পাওয়া যাবে না। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বৈশিষ্ঠ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এই লহরীর দুই শত ঊনষাট সংখ্যক শ্লোকে একটি শব্দ চয়ন করেছেন—'মাঙ্গল্য' যার অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—"মাঙ্গল্যং জগতামেব বিশ্বাসাস্পদতা মতা" অর্থাৎ জগতের বিশ্বাসভাজনতা (বিশ্বাসের পাত্র হওয়া) কে 'মাঙ্গল্য' বলা হয়। পরবর্তী শ্লোকে তিনি বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ এমনই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে তাঁর পরম বৈরীও তাঁর চরিত্রের সততা, পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ অবিশ্বাস করার কথা ভাবতে পারে না। তাঁর আশ্রয়ে সকলেই পরম নির্ভয়, পরম নিশ্চিন্ত—

অন্যায্যং ন হরাবিদি ব্যপগতদ্বারার্গলা দানবা
রক্ষী কৃষ্ণ ইতি প্রমত্তমভিতঃ ক্রীড়াসু রক্তাঃ সুরাঃ।
সাক্ষী বেত্তি স ভক্তিমিত্যবনতব্রাতাশ্চ চিন্তোজ্ঝিতাঃ
কে বিশ্বম্ভর! ন ত্বদঙিঘ্র যুগলে বিশ্রম্ভিতাং ভেজিরে।।

—হরিতে কোন অন্যায় নাই এই পরম বিশ্বাসে দানব সকল দ্বারের অর্গল মোচন করে অর্থাৎ দ্বার খুলে (পরম নিশ্চিন্তে) অবস্থান করছে। কৃষ্ণ রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাসে দেবগণ নিশ্চিন্ত হয়ে ক্রীড়ারত হয়েছেন। তিনি সাক্ষী সুতরাং ভক্তিমাত্রই গ্রহণ করেন এই বিশ্বাসে প্রণতজন চিন্তা ত্যাগ করেছেন। সুতরাং হে বিশ্বম্ভর! তোমার চরণ যুগলে কে বিশ্বাস স্থাপন না করতে পারে।

সুতরাং যে কৃষ্ণ দেব-দৈত্য, মানব-দানব, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের পরম আস্থাভাজন, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চারিত্রিক শুচিতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া কি কোন প্রকারে সমর্থনযোগ্য? অতএব সকলের দৃষ্টিতে যিনি পরম শ্রদ্ধেয় সেই শ্রীকৃষ্ণ নারীলোলুপতার মত হীন দোষে দুষ্ট হবেন এ ধারণা পোষণ করা মোটেই সমীচীন নয়।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সমগ্র মানবসমাজের সামনে এক মহিমময় আদর্শ রূপে দণ্ডায়মান যার কাছে আর সমস্ত আদর্শ ম্লান, তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণের সুউচ্চ চরিত্রাদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মল ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তাহা নন। ইঁহারা সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসুন্দর স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিময় হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপরে হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষণ যাঁহার অংশ মাত্র; যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্য ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।" একথা বলার পর বোধ করি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রাদর্শের সুমহান উচ্চতা, প্রসারতা এবং গভীরতা সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না।

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বযুগে বিরাজমান। কিন্তু তিনি যে ভক্তের প্রেমের টানে মানবের দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে নেমে আসেন এই মর্তভূমে এই নূতন বার্তা দান করে শ্রীমদ্ভাগবত। প্রেমময় শ্রীগোবিন্দকে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে মানবের দুঃখের কথা জানতে হয় না। তিনি পূর্ব থেকেই তা জেনে আসেন। "পূরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো"। তিনি 'বিশ্বাত্মা' এবং ভক্তজনের অভয়দাতা। "ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ"। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। শ্রীশুক বলেন—

"ত্বমেব এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ"।

ভা ১০।২।২৮

তিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। তিনি জগৎজীবের কল্যাণে পুনঃ পুনঃ স্বীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ ধারণ করেন।

"বিভর্ষি রূপাণ্যবধোব আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরারস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্"।।
ভা ১০।২।২৯

তিনি সত্যের আধার। সত্যই তাঁর স্বরূপ। সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে তিনি সত্যরূপে বিরাজমান। সত্যই তাঁকে লাভ করার একমাত্র পন্থা (উপায়)—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং..........."।। ভা ১০।২।২৬

তিনি সর্বদ্রষ্টা। কিন্তু তাঁর স্বরূপ অবাঙ্মনসোগোচর। কেবলমাত্র ভক্তই তার উপাসনার মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ দর্শণ করতে সক্ষম হয়। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

"ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি"।।
ভা ১০।২।৩৬

তিনি 'অভয়াশ্রয়'—নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর। তিনি কলিকলুষ নাশের উদ্দেশ্যে ভক্তের বিশুদ্ধ প্রেমের টানে নেমে আসেন মর্ত্যভূমে বিভিন্ন মাধুর্যের পশরা নিয়ে। কখনও তিনি তাঁর অনির্বচনীয় রূপমাধুর্যে জগৎকে মোহিত করেন। নৃত্যরত ময়ূর তাঁর রূপমাধুর্য প্রত্যক্ষ করে নৃত্য ভুলে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পরে, নদীজল প্রবহমানতা বিস্মৃত হয়, সঞ্চরণশীল মলয়পবন স্তব্ধ হয়ে যায়, নরনারীর অন্তর বাৎসল্য-প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। কখনও তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর অপরূপবেণুমাধুর্য। তাঁর বাঁশরীর মধুর তানে ভক্তহৃদয় মোহিত হয়ে যায়। তাঁর বংশীধ্বনি 'সর্বভূত-মনোহরম্'। যমুনাতটে উদগত সেই মধুর তানের সম্মোহনে ভক্ত নরনারী উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে চলে সেদিকে। ব্রজের বৃষ, মৃগ ও গাভীগণ দূর হতে সেই বেণুধ্বনি শ্রবণ করে আত্মহারা হয়ে দলে দলে দন্তে তৃণ ধারণ করে উৎকর্ণ হয়ে নিদ্রিত ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করে থাকে।

"বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্"।। ভা ১০।৩৫।৫

তাঁর এই অলৌকিক লীলা সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধিকার শ্রীচরণযুগলের রুনুঝুনু নূপুরনিক্বণের ন্যায় সুললিত ধ্বনিসমৃদ্ধ ভাষায় অর্পণ করেছেন তাঁর অন্তরের সুগভীর উপলব্ধির অর্ঘ্য—

নিজ সম সখা সঙ্গে গো-গণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।।

কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিতে লুকিয়ে আছে এক সর্বসম্মোহনী শক্তি। ওলো সই! ও বাঁশী শুনে কি ঘরে থাকা যায়। ওই যে বাজে তার ডাকাতিয়া বাঁশী! চল না ছুটে ওই কাল-যমুনার কুলে তমাল তলিতে। বাঁশী শুনে রাধার মন বড় উচাটন। আসলে রাধা তো রাধা নয়। সে যে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ সমগ্র ভক্তের রাধাভাব। চণ্ডীদাসের লেখনীতে ভক্তমনের এই ভাব মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছে—

কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিন্দী নই কুলে।
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন।।
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি চিত্তের হরিযে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে।।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরানি।।

কখনও তিনি ভক্তের প্রতি উজাড় করে দেন প্রেমমাধুর্য। এ প্রেম লৌকিক প্রেম নয়-বিশুদ্ধ প্রেম যার বৈশিষ্ট্য হল আত্মার প্রিয়ত্ব ধর্ম। এই ধর্ম কৃষ্ণে অর্পিত হলেই তিনি ধরা দেন ভক্তের কাছে। আবার কখনও তিনি অদ্ভুত বিচিত্র লীলাময়। তাঁর লীলামাধুর্যের অনাস্বাদিত অমৃতরস পান করে ভক্তহৃদয় হয় আপ্লুত।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি তাঁর প্রকৃতির গুণ। কিন্তু এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, মনুষ্য ও জীবকুলের মধ্যে প্রবর্তিত

হলেও তিনি এতে লিপ্ত হন না। তিনি 'অবিষক্তদৃষ্টয়ে'। সর্বজীবের অন্তিম ও একমাত্র আশ্রয়স্থল তাঁর শ্রীচরণ। কিন্তু অসজ্জন ঐ শ্রীচরণাশ্রয় লাভের অনুপযুক্ত। ঐ শ্রীচরণ 'অসতাং দুরাপম্'।

কৃষ্ণপ্রেমের হৃদয়হরণ পারিজাত কাননে যে ভক্তের নিত্য বিহার, তার আর অন্য কোন রক্ষাকবচের প্রয়োজন কি? কৃষ্ণপ্রেমের অভেদ্য চন্দ্রাতপ তাকে সমস্ত দাবদাহ থেকে আড়াল করে রাখে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল কিছুই তার কাছে তুচ্ছ, মূল্যহীন। কবি জয়দেব ভক্তের এই বিষয়টিকে অতি সুললিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন বিরহবিধুরা শ্রীরাধিকার সন্তপ্ত হৃদয়ের দাবাগ্নি প্রশমিত করার নিমিত্ত তাঁর প্রিয়সখীর সান্ত্বনা-বাক্যের মধ্য দিয়ে—

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি নসা কিশলয়শয়নেন।।
সখি যা রমিতা বনমালিনা।।৩১।।
বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন।।৩২।।
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন।।৩৩।।
স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন।।৩৪।।
সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ।।৩৫।।
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন।।৩৬।।
সকলভুবন-জন-বর-তরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন।।৩৭।।

"হে সখি! পবন-সঞ্চালিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিতেছেন, সে পল্লবশয্যায় তাপিত হয় না।।৩১।।

বিকশিত পদ্মের মত সুন্দর মুখে তিনি যাহাকে চুম্বন করিতেছেন, মদনের বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না।।৩২।।

তাঁহার অমৃতমধুর মৃদুতর বচনে যে অভিষিক্ত হইতেছে, মলয়-পবন তাহাকে জ্বালা দিতে পারে না।।৩৩।।

শ্রীহরির স্থলপদ্মের ন্যায় কর-চরণ যে স্পর্শ করিতেছে, সে চন্দ্রকিরণের সন্তাপে ভুলুণ্ঠিত হয় না।৩৪।।

সেই সজল-জলদ-কান্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাহার হৃদয় বিরহভাবে বিদলিত হয় না।।৩৫।।

সেই পীতাম্বরধারী যাহার সহিত বিহার করিতেছেন, পরিজনের পরিহাসে তাহাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না।।৩৬।।

সকল ভুবনের যুব-জন-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিতেছেন, অতিশোকে তাহাকে যাতনা ভোগ করিতে হয় না।।৩৭।।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এখানে দেখি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব-সন্যাসীপ্রধান প্রকাশানন্দকে বলছেন—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।।

কৃষ্ণের সঙ্গসুধা লাভ করে সমগ্র আকাশ, বাতাস, এই অনন্ত বিশ্ব-চরাচর, মানব, পশু অরণ্য, বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, স্রোতস্বিনী, প্রস্রবিনী আনন্দে উদ্বেল। শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'চণ্ডীদাস-জীবনী ও প্রতিভাবিশ্লেষণী' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে শ্রীবৃন্দাবন পরিপ্লাবিত; তাঁহার রাধা নামে সাধা বাঁশীর স্বরে কল্লোলমুখর কলস্বনা যমুনা উজানে বয়, কুলবতী কুল-মান তুচ্ছ করিয়া, সংসারবন্ধন-পাশ ছিন্ন করিয়া, সেই অকুলের কাণ্ডারীর শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রজরাখালেরা তাঁহার সখ্য-প্রেমে বন্দী হইয়া তাঁহার সখা-সহচরবেশে দাসভাবে বৃন্দাবনের বনে বনে গোঠে মাঠে ধেনু চরায়। তিনি তাহাদের সঙ্গে খেলিয়া বেড়ান, রাখাল বালকেরা বনে মিষ্ট ফল সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার শ্রীমুখে তুলিয়া দেয়। তিনি নন্দের পুত্ররূপে তাঁহার বাধা বহন করেন; মা যশোদা বাৎসল্যরসে পূর্ণ

হইয়া তাঁহার মুখে ক্ষীর সর নবনী প্রদান করেন। আর প্রেমোন্মাদিনী আত্মবিস্মৃতা রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রেমের জন্য কুলত্যাগিনী; তাঁহার প্রেমপাশে চিরবন্দিনী।”

কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানসিক অনুভূতি যার কোন তুলনা এই সমগ্র বিশ্বচরাচরে হয় না, কোন উপমাই তার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়। যে যেকোনো উপমার সাহায্যেই তাকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করুক না কেন, তা অসম্পূর্ণ ও অপ্রযুক্ত প্রয়াস হবে। কবি চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে কৃষ্ণ-প্রেমের এই দিকটি অতি নিপুণ ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।।
দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু নাহি স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে ধীর।।
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে।।
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।।
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহি তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।।
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

ভক্তের হৃদয় যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখ ভক্তের অন্তর থেকে রজ-তম গুণ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সকল রি দূরীভূত হয় এবং তিনি তখন ‘ব্রহ্মভূত’ বা ‘আত্মানন্দী’ অবস্থা প্রাপ্ত হন হৃদয়ের কামনা, বাসনা, অজ্ঞতা সব অবলুপ্ত হয়ে তিনি তখন বিরাজ করে এক শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায়। আর ঠিক তখনই অন্তরের শুদ্ধভক্তির মাধ্যমে তিনি পরমেশ্বরকে স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন—

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।।
(ভা ১।২।১৯)

মানুষ যদি অবিরত শ্রীহরির চিন্তন, ভজন, কীর্তনের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে তাহলে সে যাবতীয় জাগতিক দুঃখভোগের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে—

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্।।
(ভা ২।১।৫)

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—অবরিত শ্রীহরির চিন্তন, ভজন, কীর্তনের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারলেই জাগতিক সমগ্র দুখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের দুঃখের কারণ কি তা জানতে হবে। পৃথিবীতে আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ হল ভোগ্যবস্তু। কিন্তু উত্তরটির এত সরলীকরণ করলে একটা বৃহৎ ভ্রান্তি থেকে যায়। আসলে পার্থিব ভোগ্যবস্তু আমাদের দুঃখের কারণ নয়; সঠিক কারণ হল সেই বস্তুর প্রতি আমাদের অন্তরের অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্খা। দোকানে থরে থরে সুরা সাজানো আছে। কিন্তু সেই সুরা কারও দুঃখের কারণ হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রতি মনে অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। তাহলে

বস্তু নয়; বস্তুর প্রতি অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙক্ষাই আমাদের দুঃখের কারণ। আর এখানেই লুকিয়ে আছে কৃষ্ণরহস্য। অনন্যমনা ভক্ত অবিরত শ্রীহরির চিন্তন, ভজন, কীর্তনের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারলে সে অন্তহীন কৃষ্ণমাধুর্যের যে অনির্বচনীয় স্বাদ নিরন্তর লাভ করবে, তার কাছে পার্থিব জগতের ভোগ্যবস্তুর স্বাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ফলে সেই বস্তুর প্রতি তার মনে কোন অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙক্ষা জন্ম নিতে পারবে না। ফলতঃ পার্থিব জগতের কোন দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মানুষের সীমাহীন বিষয়বুদ্ধি মানুষকে ক'রে তোলে অন্ধ, বিবেকহীন। লালসার নিশ্ছিদ্র এক আবরণ-ঝিল্লি রুদ্ধ করে দেয় তার অন্তরের সমস্ত গবাক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় মানুষ হয়ে ওঠে 'আহার-নিদ্রা-মৈথুন' এর যন্ত্র। তার কাছে নেই মমতা, নেই করুণা, দয়া, স্বর্গীয় প্রেম-বোধ, নেই প্রীতি, নেই স্নেহ, নেই বাৎসল্যবোধ। এক বিশ্বগ্রাসী লালসার তাড়নায় সে অপ্রতিহত গতিতে ধেয়ে চলে অভীষ্ট সাধনের পথে। স্থান-কাল-পাত্রের কোন ভেদ তার নেই। সে যে বিষয়-বিষের তমোময় ঘন কুজ ঝটিকায় আচ্ছন্ন! কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায়! আছে! চক্ষু উন্মীলিত ক'রে ঐ দেখ পরম করুণাময় "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ"[৪৩] তোমার, আমার সকল জীব, অজীব, এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে এর হাত থেকে পরিত্রাণের অমৃতপথ নির্দেশ করেছেন। ভাগবত-ধর্ম পালনের মধ্য দিয়েই তুমি পাবে অজ্ঞানতার করালগ্রাস থেকে মুক্তির আলোকবর্তিকা। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত রঘুনাথ দাসকে বিষয়-বিষের স্বরূপ ও তার থেকে পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণের অপার করুণা সম্বন্ধে বলছেন—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহাঅন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ।।
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা।।

৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

ঊনত্রিংশ তরঙ্গ

পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সহজ পন্থা হল ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভক্ত তাঁর পবিত্র নাম ও গুণকীর্তনের দ্বারা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বিশুদ্ধ ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান ক'রে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গসুধা লাভ করতে পারে। কিন্তু এই ভক্তিযোগ কি? গোপালতাপনীয় উপনিষদের পূর্ববিভাগে পঞ্চদশ মন্ত্রে সনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভজনই হল ভক্তি। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার সর্বপ্রকার উপাধি অর্থাৎ লোভ-কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ-মন অর্পণ এবং তার ফলে তাঁর মধ্যে তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত হওয়াকে ভক্তি বলা হয় এবং এই ভক্তিই হল নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান।

শ্রীরূপগোস্বামী বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের ১।১।১১ শ্লোকে ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

—পার্থিব জগতের যাবতীয় অন্যান্য বস্তু বা কর্মের প্রতি সম্পূর্ণ আকর্ষণশূন্য হয়ে সম্পূর্ণভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর মধ্যে সমস্ত চিত্ত সমাহিত করার নামই হল ভক্তি।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

—সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা ত্যাগ করে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্মল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নামই হল ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিশ অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্‌।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।

—গঙ্গার জলধারা যেমন অপ্রতিহত গতিতে সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত হয়, তেমনি আমার সমস্ত গুণাবলী শ্রবণ মাত্রই ভক্তের অন্তরে উদ্ভূত নিষ্কাম ও অনন্য প্রেমের যে ধারা সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম আমার প্রতি ধাবিত হয় সেইটিই হল নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

নারদ ভক্তিসূত্রের ৬০ সূত্রে বলা হয়েছে যে ভক্তি হল শান্তি ও পরমানন্দের আধার—"শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।"

বৃহন্নারদীয়পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্‌।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে।।

—যেমন সমস্ত মানুষের জীবন হল জল, তেমনি সমস্ত সিদ্ধির জীবন হল ভক্তি।

অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। এবিষয়ে বৃহন্নারদীয়পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে একটি খুব সুন্দর ও অতিবাস্তব কথা বলা হয়েছে—

যথা ভূমিং সমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকার্যাণি সাধয়েৎ।।

অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র জীবকুল যেমন ভূমিকেই অবলম্বন করেই বেঁচে থাকে, ভূমিকে পরিত্যাগ করে তার জীবন অস্তিত্বহীন, তেমনি ভক্তি ব্যতিরেকে জীবনে কোনপ্রকার সাধন সম্ভব নয়।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করায় একমাত্র পন্থা হল তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি।

এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় বলেছেন—

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।।

গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে যে ভক্তি হল এমনই বিষয় যার দ্বারা সমস্ত কিছুই লাভ করা যায়—"যয়া সর্বমবাপ্যতে।"

নারদ ভক্তিসূত্রের ৫৮ সূত্রে বলা হয়েছে যে অন্য সকল কিছু অপেক্ষা একমাত্র ভক্তির দ্বারা সর্বাপেক্ষা সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়—

'অন্যস্মাৎসৌলভ্যং ভক্তৌ।'

নারদ ভক্তিসূত্রের ৬৭ সূত্রে বলা হয়েছে—সকল কৃষ্ণানুরাগীর মধ্যে যারা তাঁর প্রতি কেবলমাত্র একাগ্রচিত্ত-ভক্ত তাঁরাই শ্রেষ্ঠ—'ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ'।

পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ এবং অধ্যাপক শ্রী কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রী কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয় লিখেছেন—শ্রীভগবানের অপরিসীম প্রেমানন্দলাভের সাধন হইল ভক্তি.........এখানে সুস্পষ্ট ভাবে বলা দরকার যে, ভক্তিও শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির অন্যতম। তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা নিজ স্বভাববশে তাঁহার নিজেকে ও অন্য সবাইকে আনন্দাস্বাদনের সুযোগ দেয়। ভগবৎপ্রীতিরূপ ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের সেই হ্লাদিনী শক্তির স্ফূর্তি হয়। সত্য বটে ভগবান আত্মারাম, তিনি সর্বার্থপূর্ণ ও সর্বার্থসম্পন্ন; তাঁহার কিছু কামনা করিবার নাই বা তাঁহার অভাবও কিছু নাই। তথাপি তাঁহার আনন্দময় স্বরূপে নিত্যই আনন্দের অফুরন্ত লীলা বিদ্যমান। দীপ অন্ধকার নাশ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যকে প্রকাশিত করে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশিত করে। ঠিক সেইরূপ হ্লাদরূপী শক্তি দ্বারা নিত্যানন্দরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং আপনারও আনন্দ বিধান করেন। অতএব আনন্দাস্বাদনের প্রতি শ্রীভগবানের স্বরূপগত স্বাভাবিক আকর্ষণ। ভক্তের ভক্তিতে তাঁহার সেই স্বরূপগত আনন্দাস্বাদন হয়। কাজেই একদিক দিয়ে জীব যেরূপ ভগবৎপ্রীতিময় ভক্তিভাবে তাঁহার নিজের স্বরূপসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে তেমনি আর এক দিক দিয়ে শ্রীভগবানও তাঁহার স্বরূপশক্তি বশে ঐ ভক্তিতে প্রীতিলাভ করিয়া স্বরূপানন্দের আস্বাদন করেন। শ্রীভগবানের কৃপাবশতই ভক্ত ও ভগবানের এই প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান। ইহা জীবের পক্ষে আশার কথা, ভরসার কথা,

সুখের কথা ও পরম আনন্দের কথা। সূর্যপূজায় দীপ দানের ন্যায় ভক্তি দ্বারা উপহৃত সামান্য বস্তুও তাঁহার প্রীতিবিধান করে। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধবশতই জীব ও ভগবানের মধ্যে এই উপাস্য-উপাসক রূপ নিত্য সম্বন্ধ। তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আর এই সম্বন্ধবশতই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নিত্যকারের সম্বন্ধ। ভক্তিই সেই সম্বন্ধের সেতু। ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান গ্রাহ্য—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"......ইহা ভগবানের উক্তি।

ভক্তিযোগ কাকে বলে এবং তার স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সরল ভাষায় দেবর্ষি নারদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে মহর্ষি ব্যাসদেবকে বলেছেন—

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।।

অর্থাৎ পরমেশ্বরকে লাভ করার ব্রত সফল করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে যা কিছুই বিশুদ্ধ কর্ম করা হয় তাকেই ভক্তিযোগ বলা হয় এবং ভক্তিই হল তাঁকে লাভ করার এক মাত্র সহজলভ্য পথ। অন্য কোন মাধ্যমে তিনি সহজলভ্য হন না।

আবার একাদশ স্কন্ধে ভগবান স্বয়ং স্বমুখে বলেছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মোর্জিতা ১১।১৪।২০
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।১১।১৪।।২১

—হে উদ্ধব! যোগ-সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মানুষ্ঠান, জপ-শাস্ত্রপাঠ এবং ত্যাগ-তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা আমাকে তেমন লাভ করা যায় না। ভক্তের অন্তরে সতত বর্ধমান আমার প্রতি প্রেমপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই আমাকে সর্মধিক লাভ করা যায়।

সাধু-মহাত্মাগণ কেবলমাত্র আমার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে কাজ করলেই আমাকে লাভ করতে পারে।

হরিভক্তিসুধোদয়ের সপ্তদশ অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

অদ্বৈতযোগাদপি চ ভক্তিযোগঃ প্রশস্যতে।
ঘোরেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তান্ পাতি হ্যজঃ স্বয়ং।।

—অদ্বৈতযোগ অপেক্ষাও ভক্তিযোগ অধিকতর প্রশস্ত কারণ ভক্তের মোক্ষলাভের পথে যতকিছু বাধা বিঘ্ন তার সমস্ত কিছুই কৃষ্ণ স্বয়ং দূর করে থাকেন।।

আবার এই হরিভক্তিসুধোদয়েরই বিংশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীনারদ বলেছেন—

ভক্তিযোগস্তু নির্বিঘ্নো যোগমার্গাদ্দ্বিজোত্তমাঃ
যতো বিষ্ণুসনাথস্য দুর্জয়ং নাস্তি কঞ্চন।।

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ অনেক বেশী নিরাপদ। কারণ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করলে স্বয়ং নারায়ণ সহায় হন। সুতরাং যাঁরা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে থাকেন তাঁদের কোন বস্তুই অজেয় নয়।

এবিষয়ে বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হয়েছে—

সর্ব্বোদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তিপ্রণাশনঃ।
স্বভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যন্তি নান্যথা।।

—যিনি শরণাপন্নের দুঃখ দূর করেন, আপনার ভক্তের প্রতি যাঁর অন্তর বাৎসল্যে পরিপূর্ণ, সেই সর্বদেবময় হরি কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট হন, অন্য কোনপ্রকারে তাঁর তুষ্টি হয় না।

ব্রহ্মসংহিতার ৫/৩৩ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ বেদেরও অগম্য। তাঁকে কেবল শুদ্ধ আত্মভক্তির সাহায্যেই লাভ করা যায়—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং বলেছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।

—হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হয়ে প্রত্যহ সদাসর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য হয়ে থাকি।

হরিভক্তিসুধোদয়ের চতুর্দশ অধ্যায়ের ঊনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

নিত্যমুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেন স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশোঽপি বশীকৃতঃ।।

অর্থাৎ তিনি নিত্যমুক্ত। কোন বন্ধন তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু ভক্তের স্নেহের বন্ধনে তিনি সহজেই ধরা দেন। তিনি অজেয়। কিন্তু ভক্তগণ তাঁকে জয় করতে পারে। তিনি কাহারও বশ নন। কিন্তু ভক্তগণ তাঁকে বশীভূত করে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট এ বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে সবিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মা যশোদা দধিমন্থনে ব্যস্ত। দধিমন্থনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, হস্তযুগ কম্পিত, বাহুযুগল অবসন্ন, কোমল মুখমণ্ডল থেকে স্খলিত হচ্ছে মুকুতার ন্যায় স্বেদবিন্দু। কবরীবন্ধন হতে একে একে বিচ্যুত হচ্ছে মালতী কুসুম। এহেন সময়ে শিশু কৃষ্ণ মাতৃস্তন্য পানের নিমিত্ত উন্মুখ হয়ে গমন করলেন মায়ের নিকট এবং মা যশোদা পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হয়ে স্নেহ সহকারে পুত্রকে স্তন্য পান করাতে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু মাঝখানে এক বিপত্তি এসে উপস্থিত। উনানের পাত্রে দুগ্ধ গরম হয়ে উথলে উঠল। যশোদা পুত্রকে স্তন্যপানে বিরত করে ছুটে গেলেন। শিশু কৃষ্ণ কপট-ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে নিজ-অধর দংশন ক'রে প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে দধিমন্থনের ভাণ্ডটি চূর্ণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গৃহে সঞ্চিত নবনীত ভক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন আর বানরদেরকেও তা ভোজন করাতে শুরু করলেন। এই ঘটনায় মাতা যশোদা যৎপরোনাস্তি কুপিত হয়ে দুরন্ত পুত্রকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বদ্ধ করার প্রচেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কৈ তাকে তো বন্ধন করা যায় না। গৃহে, আশেপাশে যত রজ্জু ছিল সব দিয়েও তো তাকে বাঁধা যায় না। মা যশোদা হলেন পরম বিস্মিত। কৃষ্ণ দেখলেন জননী বড়ই পরিশ্রান্ত, কলেবর কম্পিত, সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত। এবার পুত্রের প্রাণ বিগলিত হল। ধরা দিলেন জননীর কাছে এবং মা যশোদাও তাঁর বন্ধনকার্য সমাপ্ত করতে সমর্থ হলেন। এই ঘটনা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলেন—

এবং সংদর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে।।১৯

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।২০
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।।২১

—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বতন্ত্র। ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সহ এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই অধীন। এতদসত্ত্বেও তিনি যশোদার হাতে বন্ধন স্বীকার করে একথাই প্রচার করেছেন যে তিনি শ্রমসাধ্য কর্ম অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, প্রেম-ভক্তির নিকটই ধরা দেন।।১৯।। মাতা গোপী যশোদা মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে যে কৃপাপ্রসাদ পেয়েছিলেন তা তাঁর পুত্র ব্রহ্মা, আত্মা-স্বরূপ মহাদেব এবং তাঁর বক্ষস্থল বিলাসিনী অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীও লাভে অসমর্থ ছিলেন।।২০।। এই ভগবান গোপিকানন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্যপ্রেমী ভক্তদের নিকট যতখানি সহজলভ্য, দেহাভিমানী কর্মকাণ্ডের আচরণকারী ব্যক্তিগণ, বা তপস্বী বা এমনকি তাঁর আত্মভূত ভক্তদের নিকট ততখানি সহজলভ্য নন।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃচ্ছ্রসাধন, ধ্যান-তপস্যা, জ্ঞানকর্ম, যোগকর্ম প্রভৃতি অপেক্ষা অন্তরের অবিমিশ্র নির্মল প্রেম-ভক্তিকে অধিকতর শ্রেয় মনে করেন এবং আন্তরিক প্রেমী ভক্তদের নিকট তিনি সহজে ধরা দেন।

পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের নিকট থেকে ধন, অর্থ, বিত্ত কিছুই আশা করেন না। তিনি ভক্তের নিকট থেকে চান তাঁর প্রদর্শিত ভক্তিযোগের পথে তাঁর প্রতি ভক্তমনের অকৃত্রিম, অটুট ও নিষ্কাম ভক্তি। ভক্ত তার অন্তরের শুদ্ধাভক্তি তাঁর শ্রীচরণে উজাড় করে সমর্পণ করে তাঁর মধ্যেই নিজেকে সমাহিত করতে পারলে কৃষ্ণ যে তার প্রতি কিভাবে এবং কিরূপ প্রসন্ন হন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় নৃসিংহস্তবে—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষঃ
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।

—সত্যই শ্রীকৃষ্ণের হত্যাকারী জরা নামক ব্যাধের তো এমন কোন গুণ ছিল না যার দ্বারা সে কৃষ্ণের পবিত্র কোমালাঙ্গে মারণাঘাত করে সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবে! ধ্রুবের কি এমন বয়স যে সে এরকমভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য পাবে। গজপতি গজেন্দ্রের কি এমন যোগ্যতা, কুব্জার কি এমন রূপ-লাবণ্য, সুদামার কি এমন বিত্ত, বিদুরের কি বংশ পরিচয় বা যাদবপতি উগ্রসেনের কি এমন পৌরুষ ছিল যার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন। বাস্তবিকই তাঁদের এসব কোন যোগ্যতা ছিল না। তথাপি পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতি পরম প্রীত হয়েছিলেন। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হল প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম, অনন্য এবং অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ প্রচার করেছে যে ভক্তিযোগ ব্যতীত সমস্ত মনুষ্য কর্ম বিফল; একমাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমেই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। শ্রীল জীবগোস্বামী চতুঃশ্লোকী ভাগবতের অন্তিম শ্লোকের 'সর্বত্র সর্বদা' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভক্ত সর্ব পরিস্থিতি, স্থান, কাল অবস্থায় ভক্তিযোগ অবলম্বন করতে পারে।

আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন শাস্ত্রে ভক্তির স্বরূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কূর্ম্মপুরাণে ভগবানের শ্রীমুখে ভৃগুঋষি প্রভৃতির প্রতি বলতে শোনা যায়—

যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ।
বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎ পদং।। ইতি

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি বেদ প্রদর্শিত বিধি সহযোগে সর্বদা ভক্তিসহকারে তাঁর অর্চনা করেন তাঁরা অবশ্যই কৈবল্য পদ লাভ করেন।

বিষ্ণুরহস্যে ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে নিয়ত ভক্তিযোগে মগ্ন লোকেরা তাঁর যে রকম তুষ্টিবিধান করে থাকেন জ্ঞানযোগে নিরত ব্যক্তিগণ তাঁর তদ্রূপ সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হন না—

ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যন্ যোগীনঃ পরিতুষ্টয়ে।
তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা।

কৃষ্ণভক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বত্র বিশেষ ক'রে

একাদশ স্কন্ধে বিভিন্ন উপদেশ ও মন্তব্য ছড়িয়ে আছে যা প্রকৃত অনুধাবন করতে পারলে ভক্তের মনে এ বিষয়ে একটি যথার্থ ধারণা গড়ে উঠবে।

ভক্তির একটি প্রবল দাহিকা শক্তি আছে। খাদ মিশ্রিত কাঞ্চনকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে যেমন কাঞ্চনের গরিমা বা মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না; বরং প্রজ্বলিত অগ্নি কাঞ্চনমধ্যস্থ সমস্ত খাদকে ভস্মীভূত করে তাকে আরও খাঁটি, উজ্জ্বল ও মূল্যবান করে তোলে, তেমনই ভক্ত যদি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিষ্কাম চিত্তে শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ মধুময় মহা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে পারে তাহলে তার অন্তরের সকল কলুষ-কালিমা, কামনা-বাসনা, পার্থিব জগতের প্রতি মন্দ আসক্তি, চরিত্রের হীনমন্যতা, অসূয়া, গ্লানি, অন্তরে ষড়রিপুর সর্বপ্রকার প্রভাব সেই প্রেমভক্তির অগ্নিতে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে ভক্ত হয়ে ওঠে সত্যকারের মানুষ এবং কৃষ্ণকে লাভের পথে তার আর কোন বাধা থাকে না। একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এ কথাই বলেছেন—

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্।

ভা ১১/১৪/২৫

হরিভক্তিসুধোদয়ের ৫ম অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে বিভিন্ন জন্মে মানুষ যে সমস্ত পাপরাশি অর্জন করে তার সমস্তই তাঁর ভক্তিরূপ অনলশিখা দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ হয়ে যায়—

কর্ম্মরাশিরনন্তোঽপি সর্ব্বজন্মার্জিতঃ ক্ষণাৎ।
মদ্ভক্তিবহ্নিশিখয়া দহ্যতে তূলারাশিবৎ।।

একাদশ স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে তাঁকে লাভ করার উপায় বলে দিয়েছেন। সমাজের সমস্ত মানুষ তাদের কর্ম ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাদের শ্রেণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্ম আছে যা তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা কর্তব্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে রাখা উচিৎ যে সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে পরম করুণাময় শ্রী হরি বিরাজমান। অন্তরে এই ভাব আনতে পারলে সে কৃষ্ণের উপর অচলা ভক্তি অর্জন করতে

পারে এবং ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে নিরন্তর বর্ধমান অখণ্ড ভক্তির সাহায্যে সে সর্বলোকের একমাত্র অধীশ্বর ও সর্ব সৃষ্টি ও লয়ের কারণ পরব্রহ্ম সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারবে—

ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজন্ নিত্যমনন্যভাক্।
সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্।।৪৪
ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ।।৪৫

কিন্তু যে কেউ ইচ্ছা করলেই এই ভক্তিযোগের অধিকারী হতে পারে না। এই ভক্তি যোগের অধিকার অর্জন করতে গেলে তাকে নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার পথ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এদের মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ পন্থা। যে সমস্ত ব্যক্তি বিষয়াসক্ত নন এবং কর্ম ও তার ফলের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত তাঁরা জ্ঞানযোগী। যারা বিষয়াসক্ত এবং কর্মফলের দুঃখদায়ী পরিণাম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয় তারা কর্মযোগে যুক্ত। এদের মধ্যে যে সমস্ত কর্মযোগী বিষয়ে চরম বিরক্ত বা আসক্ত কোনটিই নন এবং পূর্ব জন্মার্জিত সুকর্মফলের কারণে পরম সৌভাগ্য বশতঃ কৃষ্ণের লীলাকথায় শ্রদ্ধালু হয়েছে একমাত্র তারাই ভক্তিযোগের অধিকারী হতে পারে—

নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেম্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।।১১/২০/৭
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিদঃ।।১১/২০/৮

কিন্তু বিষয়াসক্তি বড় বিষম বস্তু। তার নিগড় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু তাহলে কি হবে এই সমস্ত মানুষদের? এরা কি চিরদিনই কৃষ্ণ সঙ্গসুধা লাভে বঞ্চিত থেকে যাবে? তা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীমধুসূদন তো অসীম করুণাময়। তিনি তো কাউকেও স্বীয় অভয়াশ্রয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। তাহলে কোন সে পথ যা তাদেরকে নিয়ে যাবে তাঁর অমৃতসদনে। পরম করুণাময় শ্রীহরি ও পথেরও সন্ধান দিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন অনেক

মানুষ আছেন যাঁরা উপলব্ধি করেন যে বিষয়ভোগ দুঃখের কারণ। কিন্তু তথাপি তাঁরা সেই বিষয়কে পরিত্যাগ করে যেতে পারেন না এবং তা দুঃখের কারণ জেনেও তাকে আঁকড়ে পরে থাকেন। তাদের অবস্থা যেন রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' কাব্য-নাটকের অশোকের মত যে আপন মনের আর্তনাদকে প্রকাশ করে বলে ওঠে—

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি—
লই গো বুক পেতে অনলবান।

এই সমস্ত মানুষদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি যে বিধান দিয়েছেন তা হল এই যে এই ধরণের মানুষগণ বিষয়ের প্রতি তীব্র বিরাগ নিয়ে বিষয় ভোগ করে যাবে এবং অন্তরে নিরন্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যয় ও প্রেম ধারণ করে তাঁর ভজনায় যুক্ত থেকে তাঁর প্রদর্শিত ভক্তিযোগের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে এবং এইভাবে সেই ভক্তিযোগের মাধ্যমে তাঁর ভজনায় ব্যাপৃত থাকলে একদিন কৃষ্ণ তার অন্তরে অধিষ্ঠান করেন এবং তিনি ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেই হৃদয়ের সমস্ত বাসনামল আপনা আপনিই অপসৃত হয়—

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।

৫।১১।২০।২৮-২৯

মানুষের জীবনে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ না ঘটলে মানুষের জীবনের চির আকাঙ্খিত সত্য ও সুন্দরের দর্শন অপূর্ণ থেকে যাবে এবং অন্তরে বৈরাগ্যের উন্মেষ না ঘটলে পার্থিব জগতের বিষয়াসক্তি প্রবল আকার ধারণ করে তার চরিত্রের ক্রমাগত নিম্নগতি সংঘটিত করবে। তাই মানুষের জীবনে জ্ঞান ও

বৈরাগ্য অমূল্য সম্পদ। সেকারণে মহান ব্যক্তিগণ নিরন্তর জ্ঞান ও বৈরাগ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে চলেন। কিন্তু কৃষ্ণ প্রদর্শিত ভক্তিযোগের এমনই মাহাত্ম্য যে এই ভক্তিযোগে লীন হয়ে যেতে পারলে আর জ্ঞান ও বৈরাগ্য অর্জনের নিমিত্ত কৃচ্ছ্রসাধন করার কোন প্রয়োজন হয় না। এই ভক্তিযোগই তার সকল প্রকার সর্বশ্রেষ্ঠ পরম কল্যাণ প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করে এবং কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, দান, ধর্ম এবং অন্যান্য কল্যাণ সাধনের দ্বারা যা কিছু স্বর্গ, অপবর্গ, শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম বা অন্যান্য শ্রেয় বস্তু লাভ হয় তার সব কিছুই এই ভক্তিযোগের প্রভাবে ভক্ত অনায়াসে লাভ করতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ্।।৩১
যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রে য়াভিরিতরৈরপি।।৩২
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।৩৩

এই পরম কল্যাণের বৈশিষ্ট্য হল নিরপেক্ষতা অর্থাৎ কোন রকম প্রত্যাশাহীনতা। সেইজন্য যারা নিষ্কাম অর্থাৎ সকল প্রকার কামনা-বাসনা রহিত এবং আপ্তকাম অর্থাৎ কর্মফলে উদাসীন তারাই কৃষ্ণের এই ভক্তিযোগের অধিকারী হতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিংশতি অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীভগবান উদ্ধবকে এ কথাই বলেছেন—

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ।।৩৫

তিনি তো অচিন্ত্য, অনন্ত কল্যাণকর গুণসমূহের আধার। তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। যে ভাগ্যবান তাঁর প্রদর্শিত ভক্তিযোগ আয়ত্ত করতে পারেন তিনি মহাত্মা হয়ে যান। এই পাওয়াই হল পরম পাওয়া। তাই ভক্তিযোগ প্রাপ্তির পর সেই ভাগ্যবানের আর কোনকিছু পাওনা অবশিষ্ট থাকে না—

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যনন্দানুভবাত্মনি
ভা ১১/২৬/৩০

এই একাদশ স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের তিপান্ন সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে বলেছেন—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত্ মাম্।।

—যাঁরা কেবলমাত্র নিরপেক্ষ ভক্তির দ্বারা (নিষ্কাম ভাবে) আমার পূজা করে তারাই আমার ভক্তিযোগ লাভ করে থাকে যার সাহায্যে তারা আমাকেই পেয়ে থাকে।

নারদপুরাণে বলা হয়েছে হৃষীকেশ কৃষ্ণকে ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। অর্থ-সম্পদ-ধনের সাহায্যে তাঁকে লাভ করা যায় না। ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর পূজা করলে তবেই অভীষ্ট ফললাভ হয়—

ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ।
ভক্ত্যা সংপুজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতং।।

কৃষ্ণকে লাভ করার একমাত্র উপায় হল জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় অনুক্ষণ তাঁর প্রদর্শিত ভক্তিযোগের মাধ্যমে তাঁর ধ্যানে নিরত থাকা। কিন্তু নিরাকার কৃষ্ণের ধ্যান নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া সুকঠিন। স্বয়ং শংকরাচার্য যিনি নিরাকারবাদী ছিলেন তিনিও একসময় সাকার পূজার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাই অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ধ্যান করার আগে কৃষ্ণের রূপধ্যান করা বিধেয়। সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঠিক রূপ কেমন তা জানা প্রয়োজন।

ভক্তের নিকট নিরাকার ও সাকার ব্রহ্মের অসুবিধা এবং সুবিধা কি তা গোস্বামী তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানস গ্রন্থে সুন্দর উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন বস্তুত নামের মাধ্যমেই মানুষ নামীর পরিয় এবং ধারণা লাভ করে। কোন বস্তুর নাম যদি মানুষ না জানে তাহলে সেই বস্তুটি তার হাতে থাকলেও সে বস্তুটির স্বরূপ সম্পর্কে কোন ধারণা ব্যক্ত

করতে পারে না। অপর পক্ষে যদি তার কোন বস্তুর নাম জানা থাকে তাহলে সেই বস্তুটি তার সামনে না থাকলেও সে সেই নামটি শ্রবণ করা মাত্রই বস্তুটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ব্যক্ত করতে পারে—

রূপ বিসেষ নাম বিনু জানেঁ।
করতল গত ন পরহিঁ পহিচানেঁ।।৪

কাজেই তাঁর মতে ব্রহ্ম সাকার হল তা ভক্তের ভজন প্রক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক। তাই তাঁর মতে সাকার ব্রহ্মই কাম্য।

শ্রীকৃষ্ণের রূপধ্যানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জগদগুরু শ্রীকৃপালুজী মহারাজ বলেছেন—

সব সাধন জনু দেহ সম, রূপ ধ্যান জনু প্রাণ।
খাত গীধ অরু স্বান জনু, কামাদিক সব মান।।

—শ্রীকৃষ্ণকে লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রূপধ্যান ব্যতীত কৃত অন্য যে কোন সাধন যথা জ্ঞান, কর্ম, যোগ, কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি সকলই যেন আত্মাবিহীন শবদেহের ন্যায় মূল্যহীন।

ত্রিংশ তরঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ সংখ্যক শ্লোক থেকে ষোড়শ শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী ভগবানের বদনকমল সদাপ্রসন্ন, নয়নদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় রক্তিম, নীলোৎপলদলশ্যাম কলেবর, হস্তে ধৃত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। পরিধানে পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ কৌশেয় (রেশমী) বসন, বক্ষস্থলে শোভিত শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে বিরাজমান উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি। গলদেশ হতে শ্রীচরণ পর্যন্ত প্রলম্বিত অতীব সুগন্ধি বনপুষ্পের মালা যার উপরে পুষ্পগন্ধে আকৃষ্ট মধুলোভী মধুপের দল সদা গুঞ্জনরত, আর সর্বাঙ্গে শোভিত মহামূল্য হার, কঙ্কণ, কিরীট, অঙ্গদ, নূপুরাদি বিবিধ অলঙ্কার। নিতম্বদেশ এক অতি উজ্জ্বল দ্যুতিময় মেখলাবৃত, তাঁর আসন হল ভক্তগণের হৃৎকমল আর তাঁর দর্শনীয় শ্যামসুন্দর তনুখানি প্রশান্ত এবং মন ও নয়নের আনন্দবর্ধনকারী। শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবানের চেহারার এই বর্ণনার মূল সংস্কৃত অংশ উদ্ধৃত করা হল—

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্।।১৩।।
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।।১৪।।
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্।।১৫।।
কাঞ্চীগুণোল্লসচ্ছ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্।।১৬।।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখাবয়বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনাম্বুজম্।
নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্।।

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজসুধাং মুহুঃ।।

"শ্রীভগবানের মুখপঙ্কজ সদাপ্রফুল্ল, পরম সৌন্দর্যময় আনন্দের খনি। তা থেকে মৃদু হাসি তথা দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নিত্য ক্ষরিত হয়ে চলে করুণারূপ মধু। যদুবংশীয়েরা এখন প্রতিদিন সেই অম্লান মুখশোভা দর্শন করে পরম প্রীতি লাভ করতে লাগলেন।।১৮।। সেই বদনাম্বুজসুধার এমনই গুণ, এমনই প্রভাব যে নেত্রদ্বারা তা পুনঃপুন পান করে মথুরার বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পর্যন্ত যুবকদের মতো রীতিমতো বলশালী তথা উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন।।১৯।।"[৪৪]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ—

সজলাম্ভোদবর্ণাভং সস্মিতং সুমনোহরম্।
পরমাহ্লাদকং রূপং ত্রৈলোক্যচিত্তমোহনম্।।২
গণ্ডস্থল-কপোলাভ্যাং জ্বলন্মকরকুণ্ডলম্।
সদ্রত্নপুরাভ্যাঞ্চ চরণাম্ভোজরাজিতম।।৩
বহ্নিশুদ্ধহরিদ্রাভ-বস্ত্রামূল্যবিরাজিতম্।
মণিরত্নেন্দ্রসারাণাং স্বেচ্ছাকৌতুকনির্ম্মিতৈঃ।।৪
ভূষিতং ভূষণৈ রম্যৈ-স্তদ্রূপেণৈব ভূষিতৈঃ।
বিনোদমুরলীযুক্ত-বিম্বাধরমনোহরম্।।৫
প্রসন্নেক্ষণপশ্যন্তং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
সদ্রত্ন-গুড়িকাযুক্ত-কবাটোরঃস্থুলোজ্জ্বলম্।।৬

—"তাঁহার শরীর জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, পরম আহ্লাদজনক, ত্রৈলোক্যচিত্তমোহন ও অতি মনোহর। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলে উজ্জ্বল মকরাকৃতিকুণ্ডলযুগল লম্বিত; চরণযুগল রত্ননির্মিত নূপুরদ্বয়ে সুশোভিত। তাঁহার বহ্নিশুদ্ধ হরিদ্বর্ণ পরিধান, তিনি মনীন্দ্রসার দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে নির্ম্মিত রম্য ভূষণে বিভূষিত। তাঁহার বিম্বাধর বিনোদ-মুরলী-যুক্ত অতি মনোহর; তিনি

৪৪। গীতাপ্রেসকৃত অনুবদ।

সকলকে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন করেন ও ভক্তানুগ্রহকাতর। তাঁহার বক্ষস্থল বিশুদ্ধ গুড়িকাযুক্ত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণিদ্বারা উদ্ভাসিত।"[৪৫]

শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ নবজলধরশ্যাম রূপমাধুরী সৌদামিনীর অত্যুজ্জ্বল দ্যুতির মত সকলকে চমকিত, বিস্ময়াবিষ্ট করে। সে রূপ দর্শন করে কুল-কামিনীগণ সংসারভ্রষ্টা হন, মুনি-ঋষিরা তপস্যা পরিত্যাগ ক'রে অপলক নয়নে চেয়ে থাকেন তার অধরপল্লবের পানে, রাজা-মহারাজাগণ পর্যন্ত তাঁররূপের প্রখর দ্যুতি সহ্য করতে না পেরে মূর্ছিত হন। চণ্ডীদাস তাই বলেন—

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা।।
দখিয়া সে রূপ মদনে মুরছে
কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস জপ তপ ছাড়ি
ও রূপ দেখিয়া কত।।
বৃকভানুপুর নাগর নাগরী
পড়িছে মুরছা খাই।
ঢলিয়া পড়িল বৃকভানু রাজা
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই।।

শ্রীকৃষ্ণের তুলনাবিহীন রূপমাধুরী যে কত অপূর্ব, কত ব্যতিক্রমী তা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোকে উদ্ধবের মুখে শুনতে পাই। সাধারণত সৌন্দর্যময় কোন অঙ্গে সুন্দর অলঙ্কার পরিধান করলে সেই সমস্ত অলঙ্কার সেই সুন্দর অঙ্গের সৌন্দর্যকে বর্ধিত করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বীয় যোগমায়ার প্রভাব প্রদর্শনের জন্য ও মনুষ্যলীলা প্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত যে দিব্য শ্রীঅঙ্গ তিনি ধারণ

৪৫। পঞ্চানন তর্করত্ন—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্।

করেছিলেন সেই শ্রীঅঙ্গে পরিহিত অলঙ্কারগুলির সৌন্দর্য তাঁর শ্রীঅঙ্গের দিব্যসৌন্দর্যের কাছে নিষ্প্রভ। তাই সেই সমস্ত অলঙ্কারগুলি তাঁর শ্রীঅঙ্গের ভূষণস্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি; বরং তাঁর শ্রীঅঙ্গই সেই অলঙ্কারগুলির ভূষণ হয়ে উঠেছিল যা শ্রীনারদের ভাষায়—"ভূষণভূষণাঙ্গম্"।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজেই তাঁর পূজার নিমিত্ত তাঁর আদর্শ মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ভক্তরা তাঁর যে মূর্তির পূজা ও ধ্যান করবে তা হল তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল। সেই দেবমূর্তির প্রতি রোমকূপে শান্তির নির্ঝরিণী। মনোহর দীপ্তিময় আজানুলম্বিত চতুর্ভুজ সেই মূর্তির বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অপূর্ব শোভায় বিরাজমান। কমলকেশরের ন্যায় হরিদ্বর্ণ অঙ্গবসনসমূহ মৃদু সমীরণে সতত উড্ডীয়মান। তাঁর সর্বাঙ্গ অপূর্ব দ্যুতিময় আভরণে ভূষিত। মস্তকে কিরীট, মণিবন্ধে বলয়, বাহুদেশে বাজুবন্ধ, কটিদেশে মেখলা। বক্ষঃস্থলে শোভা পাচ্ছে শ্রীবৎসচিহ্ন। কণ্ঠদেশ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণির উজ্জ্বল আলোকছটা। গলদেশে বিরাজ করছে আজানুলম্বিত বনকুসুমের মালা—

তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্।।৩৮
স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্।।৩৯

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতার ৫/২৬ মন্ত্রে ব্রহ্মার অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমূর্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ম্।
শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরম্।।
প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতম্।
সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে।।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।।
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্।।

—শ্রীশ্রীগোবিন্দের প্রসন্নতা লাভের মানসে প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্বেতদ্বীপের অধিপতি গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ধ্যানস্থ হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের এক অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করলেন—চিন্তামণি-ভূমিতে সহস্রদল সম্পন্ন কোটিকেশর-অলঙ্কৃত এক পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। সেই পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষের উপর এক মহাসন অবস্থিত। সেই মহাসনের উপরে সমারূঢ় সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ময় সনাতন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মুখাম্বুজলগ্ন মুরলী হতে স্বতোৎসারিত শব্দব্রহ্মস্বরূপ সুললিত বেণুগীত প্রবাহিত। বিলাসিনী গোপীগণ ও তাঁদের নিজ নিজ অংশ-বিলাসস্বরূপ সহচরগণ তাঁর বন্দনারত। আর গুণময়ী রূপধারিণী প্রকৃতি সেই উপাস্য দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত।

আবার, যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার পর এবং জড়া নামক ব্যাধের কালান্তক শরাঘাতে ইহলোক ত্যাগ ক'রে স্বধাম গোলকে প্রত্যাবর্তনের ঠিক প্রাক্কালে অগ্রজ শ্রীবলরামকে সমুদ্র তটভূমিতে উপবিষ্ট হয়ে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মতত্ত্বে নিমগ্ন হয়ে পরমপদে লীন হয়ে যেতে দেখে যখন সর্বজগতের রাজাধিরাজ নিষ্কাম নির্গুণ পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তচিত্তে সমুদ্রতীরে একটি পিপুল বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন তখন সেই অন্তিম মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের যে অপরূপ সুষমা মণ্ডিত রূপমাধুর্যের বর্ণনা ভাগবতাকার একাদশ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে দিয়েছেন তা নিম্নে বিবৃত করা হল—

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ।।২৮
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসম্।
কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্।।২৯
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।।৩০
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ।
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্।।৩১
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্।।৩২

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অপূর্ব উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি সহ চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর অঙ্গ তখন ধূম্রবিহীন অগ্নির মত অতি উজ্জ্বল বর্ণকান্তি ধারণ করেছিল।২৮

তাঁর নবজলধরশ্যামল অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তপ্ত কাঞ্চনসদৃশ অঙ্গজ্যোতি। বক্ষদেশে শোভিত হচ্ছিল সেই শ্রীবৎস চিহ্ন। কৌশেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়ে শোভিত সেই মঙ্গলময় রূপ অতি মনোরমরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল।২৯

তাঁর অধরযুগলে বিরাজিত ভুবন ভোলানো স্মিতহাস্য, কপোলে অনুপম সৌন্দর্যসমন্বিত নীলকুণ্ডল। পরমসুধাময় স্নিগ্ধদৃষ্টিসংযুক্ত কমললোচনদ্বয় ভক্তদের পরমকৃপা বিতরণে ব্যস্ত। কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল দিব্যজ্যোতি।৩০

কটিদেশে মেখলা, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে কিরীট, করদ্বয়ে বলয়, বাহুযুগলে বাজুবন্ধ, কণ্ঠে কণ্ঠহার, বক্ষস্থলে কৌস্তুভমণি অপূর্ব শোভায় শোভিত।৩১

আজানুলম্বিত বনমালা। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি আয়ুধসকল সেবকের রূপ ধারণ ক'রে প্রভুর সেবায় রত। আর তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ জানুর উপর বাম পদ স্থাপন ক'রে বসেছিলেন। তাঁর রাতুল শ্রীচরণযুগল হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল উজ্জ্বল রক্তিম আভা।৩২

তাঁর অপরূপ দেহকান্তি হতে যে কেবলমাত্র বিচ্ছুরিত হয় দিব্য লাবণ্যের অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি তাই নয়; তাঁর নবজলধরশ্যাম নয়নলোভন তনুদেহ থেকে সতত প্রবহমান অনির্বচনীয় সৌরভ যা কস্তুরীসিক্ত নীলোৎপলের সুবাসকেও পরাভূত করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল তার যেই পরিমল
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।

সেই মনোহর গন্ধ-লোভাতুর ভক্ত সতত কৃষ্ণ দরশনের জন্য ধাবিত হয় চতুর্দিকে। কিন্তু কোথায় তাঁদের প্রাণবল্লভ! নয়নযুগল তো তাঁর নাগল পায় না। অথচ তিনি আছেন! তঁদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনুভব করতে পারে তাঁর উপস্থিতি। ঐ তো তিনি বিরাজ করছেন বৃক্ষ-লতা-পত্র-কুসুমে-কুসুমে সৌরভরূপে! আনন্দের আতিশয্যে দুহাত প্রসারিত করে 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলে বক্ষে

জড়িয়ে ধরে বনস্পতিকে। ভক্তের এই আবগকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

এই মত গৌরহরি মন গন্ধে কৈল চুরি
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা পাশে কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আসে
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়।

রবীন্দ্রনাথ বোধকরি এই ভাবের বশবর্তী হয়েই লিখেছিলেন—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।।"

অথবা

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো,
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।"

কৃষ্ণের তো অনন্ত রূপ—কখনও তিনি ননীচোরা, কখনও তিনি ব্রজরাখাল, কখনও তিনি বেণুকর, কখনও বা গোপীজনবল্লভ, প্রেমরাজ, কখনও ভয়ংকর তেজোরাশি-সমৃদ্ধ মহাপাপিষ্ঠ কংস নিধনকারী মহাবলী, কখনও সখা, সারথি, সুদর্শনচক্রধারী। তিনি যে কোন রূপেই পূজ্য। কিন্তু গোপালতাপনী উপনিষদের ১।২৩ মন্ত্রে বলা হয়েছে যেসব ব্যক্তি বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করে নিত্য যত্নবান হয়ে বিষ্ণুপদের আরাধনা করেন, তাঁদের প্রতি প্রীত হয়ে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ভজনকালেই তাঁদের সম্মুখে গোপবেশে আবির্ভূত হন—

"এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে
নিত্যোযুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্।
তেযামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ
প্রকাশয়েৎ আত্মপদং তদৈব।।

আবার পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

চেত কৃষ্ণদেবস্য সর্বমেবাম্ অদ্ভুতং ভবেত
গোপলীলা তত্রাপি সর্বতোৎ মনোহরাঃ।।[৪৬] পদ্মপুরাণ

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে রূপেই লীলা করুন না কেন, সকল রূপে লীলাই পরম অদ্ভুত, পরম মনোহর। কিন্তু গোপালরূপে তাঁর লীলা যেরূপ মনোরম এবং অদ্ভুত তদ্রূপ অপর কোন প্রকার লীলা নয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্বয়ং ভগবান স্বমুখে বলেছেন—

সন্তি ভূপি নিরূপানি মম পূর্ণানি ষড়গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপয়া।।[৪৭]

—ঐশ্বর্য্য, বীর্যাদি ষড়গুণসম্পন্ন আমার অনন্ত মূর্তি বিদ্যমান। আমি সকল রূপেই লীলা করি। কিন্তু আমার সমস্ত কৃষ্ণরূপের মধ্যে আমার গোপালরূপ সর্বথা অতুলনীয়।

এর দ্বারা এইটিই প্রতীয়মান হয় যে গোপাল বা ব্রজরাখাল রূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজনাই সর্বোত্তম।

৪৬। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী, হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার
৪৭। ঐ

একত্রিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের পূজার উদ্দেশ্যে আদর্শ মূর্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শালগ্রামশিলা বা শালিগ্রাম শিলার বিষয়ে আলোচনা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বস্তুত পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অনুযায়ী কৃষ্ণের পূজার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল শালগ্রামশিলা পূজা। তাই বৈষ্ণবগণের অন্তরে শালগ্রামশিলা এক বিশেষ সম্ভ্রমের অধিকারী। কারণ তাঁদের আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ যিনি ব্রহ্মপুরাণে ভগবদব্রহ্মসংবাদে এবং পদ্মপুরাণে কার্তিকমাহাত্ম্যে নিজমুখে বলেছেন যে তিনি নিরন্তর শালগ্রামনামক গৃহে অধিষ্ঠান করেন—"নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামাখ্যবেশ্মনি।" শালগ্রামশিলার গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে অসংখ্য মত প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হয়েছে যে শালগ্রামশিলা যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই তীর্থস্বরূপ, তপোবনস্বরূপ, কারণ ভগবান মধুসূদন সেখানে বিরাজ করেন—"শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং তত্তপোবনং। যতঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।।" পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে বেদান্তে যাঁকে নির্গুণ অচ্যুত ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি শালগ্রামশিলাপূজাকারীকে মহৎ করুণা করেন। কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সুপ্ত থাকে, সেরকমভাবে শ্রীহরি শালগ্রামশিলার মধ্যে অবস্থান করেন—

যথামনন্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নির্গুণমচ্যুতং।
তৎপ্রসাদো ভবেন্নৃণাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।।
মহাকাষ্ঠস্থিতো বহ্নির্মথ্যমানঃ প্রকাশতে।
যথা তথা হরির্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে।।

স্কন্দপুরাণে কার্তিকমাহাত্ম্যে শিবকার্তিকেয়সংবাদে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীহরি তাঁর স্বর্ণপ্রতিমা বা রত্নময়ীপ্রতিমা বা পাষাণপ্রতিমা কোনটাতেই নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন না। কিন্তু শালগ্রামশিলাতে নিয়ত বিরাজ করেন—"সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম। শালগ্রামশিলায়াং তু সর্বদা বসতে হরিঃ।।"

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে প্রচারিত হয়েছে যে শালগ্রামশিলাতে শ্রীকৃষ্ণের যে রকম মনস্তুষ্টি হয়, কমলাতে বা নিজমন্দিরেও সেরূপ হয় না—“ন তথা রমতে লক্ষ্মাং ন তথা নিজমন্দিরে। শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা।।” ব্রহ্মবৈবর্ত্যপুরাণে বলা হয়েছে যে যেখানে শালগ্রামশিলা অবস্থান করেন সেখানে ভগবান শ্রীহরি অধিষ্ঠান করেন, সেখানে সর্বতীর্থসহকারে লক্ষ্মীদেবী অবস্থান করেন—“শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তত্রৈব লক্ষ্মীর্ব্বসতি সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা।” পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের প্রয়াগমাহাত্ম্যে পঞ্চদশ অধ্যায়েও একই ভাবে বলা হয়েছে যে যেস্থানে শালগ্রামশিলা অবস্থিত সেখানেই হরির নিত্য অধিষ্ঠান—“শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।” আবার ঐস্থানেই আরও বলা হয়েছে যে বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষ্যারণ্য প্রভৃতি মহাতীর্থক্ষেত্রে স্নান ও দান ক'রে যে পুণ্য লাভ করা যায় তার কোটিগুণ পুণ্য শালগ্রামশিলার্চনার দ্বারা লাভ করা যায়। যে স্থানে শালগ্রামময়ী মুদ্রা সংস্থিত সেখান থেকে বারাণসীধামে যে পুণ্য অর্জন করা যায় তৎসর্বই অর্জিত হয়—

তত্র স্নানং চ দানং চ বারাণস্যাঃ শতাধিকং।
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং চ নৈমিষ্যারণ্যমেব চ।।
তস্য কোটিগুণং পুণ্যং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
শালগ্রামময়ী মুদ্রা সংস্থিতা যত্র হি ক্বচিৎ।।
বারাণস্যাং চ যৎপুণ্যং সর্ব্বং তত্রৈব তদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মাহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎকুরুতে নরঃ।।
তৎসর্ব্বং নাশয়েদাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।।

শালগ্রামশিলার এমনই মাহাত্ম্য যে কেউ ব্রহ্মহত্যার মত অতি গর্হিত পাপে নিমজ্জিত হলেও শালগ্রামশিলার ভজন-পূজনের ফলে তার সেই পাপও ক্ষালন হতে পারে—‘যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।।” ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে শালগ্রামশিলা এবং দ্বারকাচক্রাঙ্কিতশিলা যেখানে একসঙ্গে অবস্থান করে, সেখানে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী—“শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ। উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ।।” আবার স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মানারদসংবাদে বলা হয়েছে

যে যেস্থানে শালগ্রামশিলার অগ্রভাগে দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলা অবস্থান করে সেখানে সমস্ত প্রকার সম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—“চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ। তিষ্ঠতে মুনিশার্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ।।”

এইভাবে পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য বিষয়ে এত বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে তার সমুদায় এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে গেলে এই পত্রের কলেবর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তাই সেই সমস্ত থেকে তার কিছুটা অংশ এখানে আলোচনা করার প্রয়াসী হব।

শালগ্রাম শিলা বা শালিগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন দেবতার নাম যুক্ত নেই। বরং তার সঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম সংযুক্ত হয়ে আছে।

নেপালের উচ্চমস্তাঙ্গ অঞ্চলে কাগবেনী ও মুক্তিনাথ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অস্থিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দামোদর কুণ্ড হতে উৎপন্ন এবং ধৌলাগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে গণ্ডক নদের পূর্বদিক দিয়ে প্রায় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়ে মুঙ্গেরের অপর পারে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে একটি নদী। নাম গণ্ডকী। নেপালে তাকে নারায়ণী নদীও বলা হয়। কথিত আছে এই নদীর পারে একস্থানে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলহের আশ্রম অবস্থিত ছিল। তাঁর আশ্রম সংলগ্ন এই স্থানটি শালবৃক্ষ পরিবেষ্টিত ছিল। তাই এই স্থানের নাম শালবন বা শালিবন। আর এই শালবন সংলগ্ন গণ্ডকী নদীবক্ষ থেকে পাওয়া যায় এই শিলা। তাই এই শিলাকে শালগ্রাম শিলা বলা হয়।

শালগ্রাম শিলার পরিচয় সম্পর্কে গৌতমীয়তন্ত্রের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

গণ্ডক্যাশ্চৈব দেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতং।।

অর্থাৎ গণ্ডকী নদীর প্রদেশে অবস্থিত বিস্তৃত শালগ্রামস্থান। এই দেশে উৎপন্ন প্রস্তরকে শালগ্রাম বলা হয়।

শালগ্রামশিলার উৎপত্তি বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে একটি উপাখ্যান আছে। অতি বিস্তারিত সেই উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বিবৃত হল। শ্রীরাধিকার অভিশাপে শ্রীহরির অনুচর সুদামা একবার মর্ত্যলোকে শঙ্খচূড় নামে দানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তুলসীদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মার বরে অজেয় হওয়ার কারণে প্রবল দেব বিদ্বেষী হয়ে দেবতাদের উপর প্রবল উৎপীড়ন শুরু করেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে মহাদেবের সঙ্গে তাঁর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে ভগবান বিষ্ণু তাকে ছলনার সাহায্যে দেবী তুলসীর ধর্মভঙ্গ করে মহাদেবের দ্বারা শঙ্খচূড়কে হত্যা করেন। তখন দেবী তুলসী পতি বিয়োগের শোকে বিহ্বল হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন—

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্য চ।
ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেণ মম স্বামী ত্বয়া হতঃ।।
পাষাণসদৃশস্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতঃ প্রভো।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভবে দেব ভবাধুনা।। ২১।২৩-২৪

—হে নাথ! আপনার হৃদয় পাষাণবৎ দয়াহীন। ছলের সাহায্যে আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন। তাই যেহেতু আপনি পাষাণসদৃশ দয়াহীন, তাই আপনি পৃথিবীতে পাষাণরূপে বিরাজ করবেন।

এতে তুলসীদেবীর প্রতি রুষ্ট না হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁর নিকট অঙ্গীকার করেন যে তিনি (তুলসীদেবী) তাঁর বর্তমান দেহ পরিত্যাগ পূর্বক দিব্যদেহ ধারণ ক'রে মর্ত্যে গণ্ডকী নামক নদীরূপে বিরাজ করবেন এবং তাঁর কেশ হতে তাঁর তীরে জন্মগ্রহণ করবে অগণিত তুলসীবৃক্ষ যা সমস্ত লোকে সকল পত্র-পুষ্পের মধ্যে সমস্ত দেবতাদের পূজার প্রধান উপকরণরূপে পরিগণিত হবে—

ইদং শরীরং ত্যক্ত্বা চ দিব্যং দেহং বিধায় চ।
রাসে রম ময়া সার্দ্ধং ত্বং রমাসদৃশী ভব।।
ইয়ং তনুর্নদীরূপা গণ্ডকীর্তি চ বিশ্রুতা।
পূতা সুপুণ্যদা নৃণাং ভবতু ভারতে।।

তব কেশসমূহশ্চ পুণ্যবৃক্ষো ভবত্বিতি।
তুলসীকেশসম্ভূতঃ তুলসীতি চ বিশ্রুতঃ।।
ত্রিলোকেষু চ পুষ্পাণাং পত্রাণাং দেবপূজনে।
প্রধানরূপা তুলসী ভবিষ্যতি বরাননে।। ২১।৩১-৩৪

অতঃপর তিনি তুলসীদেবীকে এও বললেন যে তিনি নিজে তাঁর শাপে শৈলরূপে গণ্ডকীনদীতে অধিষ্ঠান করবেন। সেখানে বজ্রকীট নামক কৃমিগণ তাদের তীক্ষ্ণ দন্তের সাহায্যে সেই শিলার মধ্যে চক্রাকারে ছিদ্র করবে—

অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিস্যামি ভারতে তব শাপতঃ।।
বজ্রকীটাশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাংশ্চ তত্র বৈ।
তচ্ছিলাকুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্।। ২১।৫৮-৫৯

ব্রহ্মপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ অনুযায়ী এইভাবে পৃথিবীতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি হয়।

শালগ্রামশিলার ভূতাত্ত্বিক গঠন ও উৎপত্তি সম্পর্কে W. J. Wikins তাঁর Hindu Mythology, Vedic and Puranic গ্রন্থে বলেছেন, ''It is a black ammonite, found in Mount Gandaka in Nepal. The popular belief is that in this mountain there are insects which perforate the stones; and when perforated, falling into the river Gandaki, they are taken out by means of nets.''

স্কন্দপুরাণের বিবরণ অনুযায়ী শালগ্রাম বিভিন্ন প্রকারের যথা—স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাণ্ডুর বা পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, বক্র, রুক্ষ, লোহিতবর্ণ, অতিস্থুল, চিহ্নহীন, কপিলবর্ণ, ভেকাকৃতি, ভগ্ন, বহুচক্রযুক্ত, একচক্র, বৃহন্মুখ, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র অথবা অধোবদন—

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডুরা বা পীতা নীলা তথৈব চ।
বক্রা রুক্ষা চ রক্তা চ মহাস্থূলাত্বলাঞ্ছিতা।
কপিলা দর্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ বা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথ বা কাচিদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী।

বিভিন্ন প্রকারের শালগ্রাম শিলা বিবিধ প্রকারের লক্ষণসম্পন্ন হয়ে থাকে। আর লক্ষণভেদে বিভিন্ন প্রকারের শালগ্রাম শিলার চক্রচিহ্নের বিভিন্নতাহেতু নামও বিভিন্ন প্রকারের।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—"অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ।" অর্থাৎ যে শালগ্রামের আকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি তাকে হৃষীকেশ বলা হয়। এই পুরাণে আরও বলা হয়েছে—"প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃতবনমালাবিভূষিতা। যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা ইতি।।" অর্থাৎ যে শিলাতে দক্ষিণাবর্তভাবে বনমালা বিরাজিত তাঁকে কৃষ্ণ বলা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে মণির বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, একটি চক্র ও ত্রিধ্বজযুক্ত এবং মুখছিদ্রের উপরিভাগে পদ্মাকৃতি মনোহর রেখা সমন্বিত শালগ্রামশিলাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়—"বৈকুণ্ঠং মণিবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজং। দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মকারা সুশোভনা।" বনমালার চিহ্ন যুক্ত কদম্বকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও বিন্দুচিহ্নবিশিষ্ট শালগ্রামশিলাকে শ্রীধর বলা হয়—"শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া। কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চকভূষিতঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে যে একটি দ্বার ও চার চক্র বিশিষ্ট বনমালা শোভিত নবজলধরশ্যাম বর্ণবিশিষ্ট শিলাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলা হয়—"একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতম্। নবীননীরদশ্যামং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্।।" আবার একই চিহ্নবিশিষ্ট কিন্তু বনমালা চিহ্নবিহীন হলে তাকে লক্ষ্মীজনার্দন বলা হয়—"একদ্বারে চতুশ্চক্রংনবীননীরদোপমম্। লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া।। দুই দ্বার ও চার চক্র বিশিষ্ট, গোষ্পদের চিহ্নদ্বারা সুশোভিত কিন্তু বনমালার চিহ্নরহিত শিলাকে রঘুনাথ বলা হয়—"দ্বারদ্বয়ে চতুঃশ্চক্রং গোষ্পদেন সমন্বিতম্। রঘুনাথাভিধং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া।। যে মধ্যম শ্রেণীর শিলা সাতটি চক্র এবং ছত্র ও তুণ দ্বারা শোভিত তাকে রাজরাজেশ্বর বলা হয়—"মধ্যমং সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রতুণসমন্বিতম্। রাজরাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজসম্পৎপ্রদং নৃণাম্।।" যে শিলার দুই দ্বারদেশে দুইটি চক্র বিরাজমান এবং যার উপর শ্রীচিহ্ন স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় এবং যার পৃষ্ঠদেশ বৃহৎ তাকে বাসুদেব বলা হয়—"দ্বারদেশে দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকঞ্চ সমং স্ফুটম্। বাসুদেবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।।"

ব্রহ্মপুরাণে ভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে উল্লিখিত আছে যে যেসমস্ত শিলার দ্বারদেশে সমান চক্রদ্বয়, নিতান্ত মধ্যস্থলে সংস্থিত নয় এবং যার বর্ণ শুভ্র ও অতীব মনোহর সেই শিলা 'বাসুদেব' নামে চিহ্নিত—"দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যতে নান্তরীয়কে। বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ।।" একভাগে সংযুক্ত দুইটি চক্রবিশিষ্ট কিন্তু সম্মুখভাগ পৃথক পরিপুষ্ট অতীব শোভাময় লোহিতবর্ণের শালগ্রামকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়—দ্বে চক্রে একলগ্নে তু পুর্বভাগস্তু পুষ্কলঃ। সঙ্কর্ষণাখ্যো বিজ্ঞয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনঃ।।" দীর্ঘ মুখছিদ্রযুক্ত এবং তার অভ্যন্তরে বহুছিদ্রবিশিষ্ট সূক্ষ্ম চক্রসমন্বিত পীত বর্ণের শিলা প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত—"প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈব চ। শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ।।" মনোহর দর্শন, বর্তুলাকার মুখদ্বারে তিনটি রেখা সংযুক্ত ও পৃষ্ঠদেশ পদ্মচিহ্নিত নীলবর্ণের যে শিলা তাকে অনিরুদ্ধ বলা হয়—"অনিরুদ্ধস্তু নীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ। রেখাত্রয়স্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাঞ্ছিতং।।" চতুষ্কোণবিশিষ্ট শালগ্রামশিলা কেশব নামে অভিহিত—"সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাৎ চতুষ্কোণবিশিষ্ট ভবেত্তু যঃ।" উন্নত নাভিচক্র, দীর্ঘ রেখা ও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত মুখছিদ্র বিশিষ্ট শ্যামবর্ণের শিলা নারায়ণ নামে পরিচিত—"শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতং।" বিল্বের মত আকার বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠদেশে সুস্পষ্ট মুখছিদ্র সমন্বিত ও পদ্ম ও চক্রযুক্ত লোহিত বর্ণের যে শালগ্রাম শিলা তাকে পরমেষ্ঠী বলে—"পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ।" আর পৃষ্ঠে ছিদ্রযুক্ত পরম সুন্দর ও দুইটি স্থূলচক্রবিশিষ্ট বিল্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণের শালগ্রাম বিষ্ণু নামে কথিত—"বিল্বাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরং চাতিপুষ্কলং। কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ।।" পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ছিয়াত্তরতম অধ্যায়ে কার্তিকমাহাত্ম্যে অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শালগ্রামশিলার নামকরণ করা হয়েছে।

শালগ্রামশিলাতে চক্রের সংখ্যানুযায়ী কোন শিলার কি নাম তার সহজ সূত্র পাওয়া যায় প্রহ্লাদসংহিতায়। সেখানে বলা হয়েছে যে শালগ্রামশিলাতে একটি চক্র থাকলে তার নাম সুদর্শন, দুইটি চক্র থাকলে তার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, তিনটি চক্র থাকলে তার নাম ত্রিবিক্রম, চারটি চক্র থাকলে তার নাম জনার্দন, পাঁচটি চক্র থাকলে তার নাম বাসুদেব, ছয়টি চক্র থাকলে তার নাম প্রদ্যুম্ন, সাতটি চক্র থাকলে তার নাম বলদেব, আটটি চক্র থাকলে তার নাম পুরুষোত্তম,

নয়টি চক্র থাকলে তার নাম নবব্যূহ, দশটি চক্র থাকলে তার নাম দশমূর্তি, এগারটি চক্র থাকলে তার নাম অনিরুদ্ধ, বারোটি চক্র থাকলে তার নাম দ্বাদশাত্মক এবং এর চাইতেও বেশী চক্র থাকে তাহলে তার নাম হবে অনন্ত—

একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দনঃ।
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ষড়্‌ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ।।
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভির্দশমূর্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।

এইরূপে পদ্মপুরাণাদি বিভিন্ন গ্রন্থে চিহ্ন, বর্ণ, আকৃতি ইত্যাদির প্রকার ভেদে শালগ্রামের আরও বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে যেমন—কপিল, নরসিংহ, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম, হয়গ্রীব, বামন, দামোদর, যোগেশ্বর পদ্মনাভ, হিরণ্যগর্ভ, লক্ষ্মীনৃসিংহ, চতুর্মুখ, বিষ্ণুপঞ্জর, গরুড় ইত্যাদি যাদের পুরাণোক্ত মূল শ্লোকসহ বিশদ বিবরণ গবেষণা পত্রের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনুক্ত রাখলাম।

শাস্ত্রে সমস্ত শালগ্রামশিলাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কতকগুলি শিলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে হিতকারী ও অভীষ্ট ফলপ্রদ হিসাবে এবং অপরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে অহিতকারী হিসাবে। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা।
নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগ-প্রদায়িকা।
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্যদায়িকা।
স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ুর্নিষ্ফলা তু অলাঞ্ছিতা।
কপিলা কর্ব্বুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ বা পুনঃ।।
বদ্ধচক্রাথ বা যা স্যাড্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী।
পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত সঃ।।

—স্নিগ্ধবর্ণের শিলা মন্ত্র-সিদ্ধি প্রদানকারী, কৃষ্ণবর্ণা কীর্তিপ্রদানকারী, পাণ্ডুবর্ণের শিলা পাপনাশকারী, পীতবর্ণের শিলা পুত্রফলদানকারী, নীলবর্ণের শিলা লক্ষ্মীবর্ধনকারী, রক্তবর্ণা শিলা রোগ বর্ধনকারী, রুক্ষশিলা উদ্বেগ সৃষ্টিকারী, বক্র শিলা দারিদ্র্য আনয়নকারী, স্থূলশিলা পরমায়ু হরণকারী, চিহ্নবিহীন শিলা নিষ্ফলা। সুতরাং ভুলবশতও কোন ব্যক্তি পিঙ্গলবর্ণ, মিশ্রবর্ণা, ভগ্ন, বহুচক্র-বিশিষ্ট, একচক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র বা অধোমুখী শিলার পূজা করলে তার দুঃখলাভ অনিবার্য।

প্রায় অনুরূপভাবে অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

তথা ব্যালমুখী ভগ্না বিষমা বদ্ধচক্রিকা।
বিকারাবর্ত্তনাভিশ্চ নারসিংহী তথৈব চ।।
কপিলা বিভ্রমাবর্ত্তা রেখাবর্ত্তা চ যা শিলা।
দুঃখদা সা তু বিজ্ঞেয়া সুখদা ন কদাচন।।

অর্থাৎ যে শিলার মুখ সাপের মুখের ন্যায়, যা ভগ্ন, যার চক্র পরস্পর মুখোমুখি, যার চক্র বদ্ধ, যার নাভিপ্রদেশ পূর্ণরূপে প্রকাশিত নয় এবং সেহেতু ঘূর্ণায়মান রেখা-যুক্ত, যে শিলা নরসিংহমূর্তি, যার বর্ণ পিঙ্গল, যে শিলার আবর্তবিষয়ে সংশয়ের উদ্রেক হয়, এবং যার আবর্ত রেখাময় তার পূজা করলে সুখপ্রাপ্তির আশা নাই।

শুভদ শিলা সম্পর্কে অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তাহমায়া বা সমচক্রিকা।
ঘোণিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গম্ভীরা সম্পুটা তথা।
সূক্ষ্মমূর্তিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখা সিদ্ধিদায়িকা।
ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়সম্পুটা।
পূজনীয়া প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা।।

অর্থাৎ যেসব শিলা স্নিগ্ধ, শ্যামলবর্ণ, মুক্তাফলসদৃশ, গোলাকার, অকৃত্রিম, সমচক্র, বরাহাকার, গভীরনাভিবিশিষ্ট, সমপুট, সূক্ষ্মমূর্তি, বাসুদেবমূর্তি, সমবদন, আমলকী ফলের মত ক্ষুদ্রকায়, করপৃষ্ঠের মত উন্নত ও করতলের মত সমানাকার তাদের পূজা করাই বিধেয় কারণ সেগুলি মঙ্গলদায়ক।

কিন্তু হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উপরোক্ত মতের সঙ্গে কিছুটা ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে—"দোষাশ্চৈতে সকামার্চ্চনবিষয়াঃ।" অর্থাৎ অগ্নিপুরাণে কতিপয় প্রকারের শিলার যে সমস্ত দোষের কথা বলা হয়েছে সেগুলি কেবলমাত্র সকাম পূর্জার্চনার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। সুতরাং নিষ্কাম ভজনাকারী শিলার এই দোষের দ্বারা আক্রান্ত হন না। কৃষ্ণ ভজনার মূল কথাই তো হল নিঃস্কাম ভজনা।

বৃহন্নারদীয়পুরাণের আটত্রিশ অধ্যায়ের একশত তেইশ সংখ্যক শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি নিষ্কাম ভক্তির সুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

পূজয়ন্তি হরিং যে তু নিষ্কামাঃ শুদ্ধমানসাঃ।
তেষাং বিষ্ণু প্রসন্নাত্মা সর্বান্ কামান্ প্রজচ্ছন্তি।।

সুতরাং হরিভক্তি বিলাসের মতানুযায়ী নিষ্কাম ভজনাকারী যে কোনও প্রকার শিলার অর্চনা করতে পারেন।

কিন্তু শালগ্রামশিলা মাত্রই যে দোষহীন সেকথা প্রচার করে শ্রীভগবান ব্রহ্মপুরাণে বলেছেন—

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতিং।
শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং ন হি।।

—খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন, পার্শ্বভগ্ন, বিভিন্ন প্রকার যে রকমই হোক না কেন, শালগ্রামস্থলীতে উৎপন্ন শিলা দোষরহিত।

অনুরূপভাবে স্কন্দপুরাণে শ্রীরূদ্রকে বলতে শোনা যায়—"খণ্ডিতং ত্রুটিতং ভগ্নং শালগ্রামে ন দোষভাক্।" অর্থাৎ খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন যে প্রকারেরই হোক না কেন, শালগ্রাম শিলায় কোন দোষ হয় না।

এখানে বৈষ্ণবভক্তগণের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শাস্ত্রের নিষেধ অনুযায়ী শালগ্রাম শিলার আকার যত বেশী হবে ততই বেশী ফলপ্রদ হবে সে বিষয়টি শাস্ত্রের পক্ষ থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। বরং তার বিপরীত। শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে স্বয়ং ভগবান বলেছেন যে শিলা যতই ক্ষুদ্রাকৃতি, সেই শিলা ততই মঙ্গলদায়ক। আবার যে শিলার আকার আমলকীর মত ক্ষুদ্র সেই শিলার মধ্যে তিনি কমলাসহ নিবাস করেন—

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা।
তস্মাত্তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
তত্রাপ্যামলকী তুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহম্।।

শাস্ত্রে শালগ্রাম শিলা ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত ব্যক্তি শালগ্রামের মূল্য নির্ধারণ করে, বিক্রয় করে, শালগ্রামের গুণ-দোষ বিচার ক'রে তার মূল্যনির্ধারণে অনুমতি প্রদান করে তাদের অনন্তকাল নরকপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং শালগ্রামশিলার ক্রয়-বিক্রয় সর্বৈবভাবে পরিহার করা বিধেয়—

শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ।
সর্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবং।
অতঃ সংবর্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ং।।

অপরপক্ষে শাস্ত্রে শালগ্রামশিলা দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে শালগ্রাম শিলা দান করলে গিরি কাননাদিবিরাজিতা বসুন্ধরা দানের ফল লাভ হয়ে থাকে—

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমং।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননং।।

এই কারণে যে সমস্ত প্রাচীন পরিবারে শালগ্রামশিলা দেখা যায় সেখানেই শোনা যায় যে ঐ সমস্ত শিলা একদা গণ্ডকী তীরস্থ সাধুগণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের দান হিসাবে অর্পণ করে গিয়েছিলেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রে শালগ্রামশিলার আবাহন ও বিসর্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের ষষ্ঠ উল্লাসে বলা হয়েছে—"শালগ্রামস্থাপনে চ নাবাহনবিসর্জনে" এবং "শালগ্রামর্চ্চনে নৈব হ্যাবাহনবিসর্জনে।"

অনুরূপ ভাবে হরিভক্তি-তরঙ্গিণী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে যেহেতু শ্রীহরি শালগ্রামশিলায় নিত্য অধিষ্ঠান করেন সেই জন্য শালগ্রামশিলায় পূজার্চনাদি করলে আবাহন বা বিসর্জন নিষিদ্ধ—

শালগ্রামে স্থাবরে চ নাবাহনবিসর্জ্জনে।
শালগ্রামশিলাদৌ হি নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।।

শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য ও পূজা সম্পর্কে এত গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হলেও গৃহে বা মন্দিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—"শালগ্রামশিলায়াং তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।" এই কারণে বঙ্গদেশের সর্বত্র অনেক প্রাচীন পরিবারের নিকট শালগ্রামশিলা গচ্ছিত থাকলেও কোথাও তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এমনটি দেখা যায় না।

শাস্ত্রে শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে। গরুড়পুরাণের পঁতাল্লিশতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে যে শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করলেই কোটিজন্মার্জিত পাপ নাশ হয়—"শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটীজন্মাঘনাশনং।" পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে যিনি সদা শালগ্রামশিলায় গোবিন্দের পূজা করেন তিনি যতদিন এই মহাসৃষ্টির প্রলয় না হয় ততদিন দেবতাদের আলয়ে বিরাজ করেন—"যঃ পূজয়তি গোবিন্দং শালগ্রাম সদা নরঃ। আহূতসংপ্লবং যাবৎ ন স প্রচ্যবতে দিবঃ।।" ঐ স্থানে আরও বলা হয়েছে যে তীর্থভ্রমণ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, জ্ঞানার্জন ব্যতীতই কেবলমাত্র শালগ্রামপূজা করলেই মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে—"বিনা তীর্থৈর্বিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিং। মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।" স্কন্দপুরাণে কার্তিকমাহাত্মে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে বলা হয়েছে যে দিবাকরের উদয়ে যেমন নিশাকালের সমগ্র তমোরাশি দূরীভূত হয় তেমনি শালগ্রামশিলাকে অর্চনা প্রদান ক'রে প্রণাম করলে অর্চনাকারীর সমগ্র পাপরাশি বিলীন হয়ে যায়—"নমস্করোতি মনুজঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনে। পাপানি বিলয়ং যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।।" পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে শালগ্রামশিলার সম্মুখে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃকুল পরম তৃপ্ত হন এবং শতকল্পকাল স্বর্গে বাস করেন—"শালগ্রামশিলায়াং তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি।।" স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে যে শালগ্রাম শিলার সন্নিকটে পিণ্ড প্রদান করলে পিতৃকুল অনন্তকাল তৃপ্ত থাকেন—"শালগ্রামশিলাগ্রে তু সকৃৎ পিণ্ডেনতর্পিতাঃ। ভবন্তি পিতরস্তস্য ন সংখ্যা তত্র বিদ্যতে।।" পদ্মপুরাণে মহাদেব বলেছেন, যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার পূজা করেন না তিনি বিষ্ণুভক্তিহীন বলে বিবেচিত—"কিমর্চ্চিতৈর্লিঙ্গ শতৈর্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতৈঃ। শালগ্রামশিলাবিম্বং নার্চ্চিতং যদি পুত্রক।।"

শাস্ত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শালগ্রামশিলার পূজার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে ভক্তিপূর্ণভাবে ভগবানের অর্চনাপরায়ণ হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্ত্রীজাতি, শূদ্র সকলেই শালগ্রামশিলার পূজা করতে পারেন—"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শুদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ।।"

এইভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রে শালগ্রামশিলা সম্পর্কে অগণিত মত প্রকাশ করা হয়েছে যার সমস্তটি এই ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ

শালগ্রামশিলা পূজার পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিপূজারও বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে পাঠকের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে শাস্ত্রে যখন শালগ্রামশিলা পূজার সপক্ষে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তখন কৃষ্ণের মূর্তিপূজা কি অশাস্ত্রীয়, কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান বহির্ভূত বৈষ্ণব সমাজের লোকাচার মাত্র? এক্ষেত্রে উত্তর হল—না, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিপূজা মোটেই অশাস্ত্রীয় নয়। শালগ্রামশিলার পূজার স্বপক্ষে প্রবল সওয়াল করার পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পূজাকেও শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়েছে। পদ্মপুরাণের কার্তিকমাহাত্ম্যে যমধুম্রকেশসংবাদে বলা হয়েছে যে প্রতিমাতে হরির অর্চনাবিধি আছে—"পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ।" সেখানে মূর্তি কতপ্রকার হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে প্রতিমা আট প্রকার যথা 'শৈলী' অর্থাৎ শিলানির্মিত, 'দারুময়ী' অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত, 'লৌহী' অর্থাৎ ধাতুনির্মিত, 'লেপ্যা' অর্থাৎ মৃচ্চন্দনাদিনির্মিত, 'লেখ্যা' অর্থাৎ বস্ত্র ইত্যাদির উপর অঙ্কিত চিত্র, লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি, 'সৈকতা' অর্থাৎ বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী—"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা। মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূর্তিরষ্টধা।" এই অষ্টবিধ মূর্তিপূজার কথা শাস্ত্রে বলা হলেও ঐ স্থানেই শাস্ত্রকার একথাও বলতে বিস্মৃত হন নি যে এক শালগ্রামশিলার পূজা করলেই সমস্ত প্রকার মূর্তি পূজার ফললাভ করা যায়—'শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।" যাইহোক, শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণমূর্তির আয়তন ও গঠনশৈলী কেমন হবে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। গৌতমীয়তন্ত্রের দশম অধ্যায়ের ২৫ এবং ২৬তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে পঞ্চদশ অঙ্গুলি পরিমিত কৃষ্ণমূর্তিই হল উত্তম ও আদর্শ মূর্তি, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত কৃষ্ণমূর্তি মধ্যমশ্রেণীভুক্ত এবং অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত মূর্তি অধম শ্রেণীর। এই মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। অজ্ঞানতা বশতঃ কখনও কৃষ্ণমূর্তি এই মাপের সামান্যতম অধিক নির্মাণ করা উচিৎ নয়—

প্রতিমা কৃষ্ণদেবস্য যত্নতঃ কারয়েৎ সুধীঃ।
শিল্পিনা কৃষ্ণভক্তেন বিশ্বকর্ম্মোক্তজ্ঞানতা।।২৫

দশপঞ্চাঙ্গুলা মুখ্যা মধ্যমা দ্বাদশাঙ্গুলা।
অষ্টাঙ্গুলাধমা সা তু ন্যূনাধিকাং ন কারয়েৎ।।২৬

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাস্ত্রনির্ধারিত এই বিধিনিষেধের কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রদান করা হয়েছে। গৌতমীয়তন্ত্রের এই অধ্যায়েরই তেত্রিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে পর্বতাগ্রে, নদীতীরে, প্রাঙ্গণে, গোচারণক্ষেত্রে, বা সমুদ্রকূলে স্থাপিত প্রতিমার পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হলে কোন ক্ষতি হয় না—

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে চত্বরে গোষ্ঠভূমিষু।
সমুদ্রকুলে চান্যে বা মানহীনান্ন দূষণম্।।

এভাবে শাস্ত্রনির্ধারিত নিয়মে নির্মিত বাসুদেব মূর্তির অবয়ব ও অঙ্গসজ্জা কেমন হবে সে সম্পর্কে বিষ্ণুধর্মোত্তরে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে—

একবক্ত্রশ্চতুর্ব্বাহুঃ সৌম্যরূপী সুদর্শনঃ।
সলিলাম্লাতমেঘাভঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।।
কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্বুতুল্যেন রাজতা।
বরাভরণযুক্তেন কুণ্ডলোত্তমভূষিতঃ।।
অঙ্গদী বদ্ধকেয়ূরো বনমালা বিভূষিতঃ।
উরসা কৌস্তুভং বিভ্রং কিরীটং শিরসা তথা।।
শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্য কর্ত্তব্যশ্চারুকর্ণিকঃ।
পুষ্টাশ্লিষ্টায়তভুজস্তনুতাম্রনখাঙ্গুলিঃ।।
মধ্যেন ত্রিবলীভঙ্গশোভিতেন সুচারুণা।
স্ত্রীরূপধারিণী কার্য্যা ক্ষৌণী তৎপদমধ্যগা।।
তৎকরস্থাঙিঘ্রযুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দনঃ।
সুচারুপদবিন্যাসঃ কিঞ্চিন্নিষ্ক্রান্তদক্ষিণঃ।।
অনুদৃশ্যা মহী কার্য্যা দেবদর্শনবিস্মিতা।
দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্যো জান্ববলম্বিনা।।
বনমালা চ কর্ত্তব্যা দেবজান্ববলম্বিনী।

যজ্ঞোপবীতং কর্ত্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম্।।
উৎফুল্লকমলং পাণৌ কুর্য্যাদ্দেবস্য দক্ষিণে।
বামপাণিগতং শেষং শঙ্খাকারং তু কারয়েৎ।।
দক্ষিণে তু গদা দেবী তনুমধ্যা সুলোচনা।
স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা।।
পশ্যন্তী দেবদেবেশং কার্য্যা চামরধারিণী।
কার্য্যং তন্মূর্দ্ধনি বিন্যস্তং দেবহস্তং তু দক্ষিণম্।।
বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ।।
কর্ত্তব্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণতৎপরঃ।
কার্য্যো দেবকরো বামো বিন্যস্তস্তস্য মূর্দ্ধনি।।

—বাসুদেবের এক বদন। তিনি চতুর্ভুজ, সৌম্যদর্শন, সুদৃশ্য। তাঁর সজলনীরদবৎ শ্যামল অঙ্গ হবে সর্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত। তিনি সুশোভন, কম্বুতুল্য, মনোহর কণ্ঠে বিরাজমান। সেই কণ্ঠদেশে শোভিত অপূর্ব মনোহর অলঙ্কারসমূহ। তাঁর শ্রীঅঙ্গ পরমোত্তম কুণ্ডল, অঙ্গদ, কেয়ূর অর্থাৎ বাজু, অনন্ত ইত্যাদি সুদৃশ্য বাহুভূষণ ও বলমালা দ্বারা সুশোভিত। তাঁর বক্ষদেশে কৌস্তুভ এবং মস্তকে কিরীট দীপ্যমান আর সেই মস্তকোপরি অবস্থিত মনোরম কর্ণিকাবিশিষ্ট একটি কমলপুষ্প। তাঁর ভুজচতুষ্টয় সবল, আশ্লিষ্ট এবং আয়ত, নখাঙ্গুলী সূক্ষ্ম ও তাম্রবর্ণের এবং তা তাঁর দেহমধ্যে ত্রিবলীভঙ্গে সুশোভিত এবং মনোহর। তাঁর শ্রীচরণযুগলের মধ্যে নারীরূপধারিণী পৃথিবীদেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে হবে। এই পৃথিবীদেবী স্বীয় করযুগলের দ্বারা বাসুদেবের চরণযুগল ধারণ ক'রে থাকবেন। তাঁর মূর্তি এমনভাবে নির্মিত হবে যেন তাঁর পদক্ষেপ হবে সুবিন্যস্ত এবং দক্ষিণপদ কিঞ্চিৎ বহির্দিকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকবে আর দেবী বসুমতী অবাক বিস্ময়ে সেই মনোহর মূর্তির প্রতি চেয়ে থাকবেন। তাঁর কটিবসন ও বনমালা আজানুলম্বিত হবে এবং যজ্ঞোপবীত নাভিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। তাঁর দক্ষিণহস্তে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং বামহস্তে শঙ্খ থাকবে। তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে থাকবেন সর্বালঙ্কারে ভূষিতা ক্ষীণমধ্যা সুলোচনা

স্ত্রীরূপধারিণী চামরহস্তা গদাদেবী যিনি দেবদেবেশের প্রতি দৃকপাত করে থাকবেন আর তাঁর মস্তকোপরি বিন্যস্ত থাকবে ভগবানের হস্ত। দেবদেবেশের বামপার্শ্বে সর্বালঙ্কারে ভূষিত, সুবৃত্ত, বিস্ফারিত নয়নযুক্ত এবং সর্বদা প্রভুকে দর্শনে উদগ্রীব চামরধারী লম্বোদরমূর্তি চক্র নির্মাণ করতে হবে। ভগবানের বামহস্ত সেই চক্রের মস্তকোপরি স্থাপিত থাকবে।

বিভিন্ন শাস্ত্রে পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির বর্ণনা করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণের একশত উনিশ অধ্যায়ের আটাশ সংখ্যক শ্লোক থেকে আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে কৃষ্ণমূর্তির যে বর্ণনা করা হয়েছে তার উল্লেখ করা হল। এখানে দেখি একদা রাজা পুরূরবা কোন এক সময় উপবাসকালে অভ্যঙ্গপূর্বক অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দনপূর্বক নদীজলে স্নানের অপরাধহেতু রূপহীন হয়ে পরলে সেই রূপ পুনরুদ্ধারের মানসে তিনি তপশ্চরণার্থ হিমপর্বতে গমনপূর্বক সেখানে এক অতি মনোরম কাননে মহর্ষি অত্রির আশ্রমস্থিত মনোরম প্রাসাদে মহর্ষি অত্রি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণের যে অপূর্ব মূর্তি তিনি দর্শন করেন তার বর্ণনা প্রদান ক'রে মহর্ষি সূতমুনি বলেছেন—

প্রাসাদে তত্র ভগবান্ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভোদিভোগাবলী সুপ্তঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ।।২৮
জাঙ্ঘা চ কুঞ্চিতস্ত্বেকো দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
ফণীন্দ্রসন্নিবিষ্টোঽঙিঘ্রর্দ্বিতীয়শ্চ তথানঘ।।২৯
লক্ষ্ম্যুৎসঙ্গগতোঽঙিঘ্রস্ত শেষভোগপ্রশায়িনঃ।
ফণীন্দ্রভোগসংন্যস্তবাহুঃ কেয়ুরভূষণঃ।।৩০
অঙ্গুলীপৃষ্ঠবিন্যস্ত-দেবশীর্ষধরং ভুজম্।
একং বৈ দেবদেবস্য দ্বিতীয়স্তু প্রসারিতম্।।৩১
সমাকুঞ্চিতজানুস্থ-মণিবন্ধেন শোভিতম্।
কিঞ্চিদাকুঞ্চিতশ্চৈব নাভিদেশকরস্থিতম্।।৩২
তৃতীয়স্তু ভুজং তস্য চতুর্থস্তু তথা শৃণু।
আত্তসন্তানকুসুমং ঘ্রাণদেশানুসর্পিণম্।।৩৩
লক্ষ্ম্যা সংবাহ্যমানাঙিঘ্রঃ পদ্মপত্রনিভৈঃ করৈঃ।
সন্তানমালামুকুটং হারকেয়ূরভূষিতম্।।৩৪

ভূষিতঞ্চ তথা দেবমঙ্গদৈরঙ্গুলীয়কৈঃ।
ফণীন্দ্রফণবিন্যস্ত-চারুরত্নশিরোজ্জ্বলম্।।৩৫
অজ্ঞাতবস্তুচরিতং প্রতিষ্ঠিতমথাত্রিণা।
সিদ্ধানুপূজ্যং সততং সন্তানকুসুমার্চ্চিতম্।।৩৬
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গং দিব্যধূপেন ধূপিতম্।
সুরসৈঃ সুফলৈর্হৃদ্যৈঃ সিদ্ধৈরুপহৃতৈঃ সদা।।৩৭
শোভিতোত্তমপার্শ্বং তং দেবমুৎপলশীর্ষকম্। ইতি ৩৮

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ত্বদীয় সম্পাদিত 'মৎস্য পুরাণম্' গ্রন্থে উপরোক্ত অংশের যা বঙ্গানুবাদ করেছেন তা হল—"ঐ প্রাসাদমধ্যে দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন বিরাজমান; তিনি ভোগীর ভোগসমূহে (শেষনাগের দেহোপরি) শয়ান ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত; তাঁহার এক অঙ্ঘ্রি (চরণ) জানুদ্বারা আকুঞ্চিত ও ফণীন্দ্রোপরি সন্নিবিষ্ট (শায়িত) এবং দ্বিতীয় অঙ্ঘ্রি তাঁহার সেই ভোগিভোগে শয়নাবস্থাতেই লক্ষ্মীর উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) অবস্থিত। তাঁহার একবাহু ফণীন্দ্রের ভোগোপরি (শেষনাগের দেহোপরি) সংস্তম্ভ (শায়িত), কেয়ূরভূষণে (বাজুবন্ধ অলংকারে) ভূষিত এবং অঙ্গুলিপৃষ্ঠোপরি বিন্যস্ত মস্তকধারণে তৎপর,তদীয় দ্বিতীয় বাহু প্রসারিত এবং তৃতীয় বাহু সমকুঞ্চিত (কিঞ্চিৎ ছোট) জানুর উপরিভাগে মণিবন্ধ রাখিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে তদীয় নাভিদেশে সংলগ্ন। এক্ষণে তাঁহার চতুর্থ বাহু যেভাবে আছে শ্রবণ কর। উহা একটি সন্তানক কুসুম (কল্পবৃক্ষের পুষ্প) ধারণ করিয়া নাসিকার দিকে অগ্রসর (অর্থাৎ সেই পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণরত)। লক্ষ্মী তাঁহার পদ্মপলাশনিভ কর দ্বারা তদীয় অঙ্ঘ্রিযুগ্ম (চরণদ্বয়) সম্বাহন (মর্দন) করিতেছেন। তিনি সন্তানকমালার (কল্পবৃক্ষের পুষ্পের মালার) মুকুট পরিয়াছেন, হার-কেয়ূরে বিভূষিত হইয়াছেন, অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক দ্বারা তাঁহার দেহের ভূষণ সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার চরিততত্ত্ব সকলেরই অজ্ঞাত। তিনি সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সন্তানক কুসুমে অর্চিত, তাঁহার দেহ দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত ও দিব্য ধূপে ধূপিত। সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক উপহারীকৃত সরস সুমনোহর সুফল সকল দ্বারা তদীয় দক্ষিণ পার্শ্ব সুশোভিত, তাঁহার মস্তকোপরি উপলার্ঘ্য বিরাজিত।"

শ্রীকৃষ্ণের পূজার উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে শাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করা হয়েছে। গৌতমীয়তন্ত্রের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে হরির নিত্যপূজা শালগ্রামে, মণিতে, মণ্ডলে এবং তাঁর প্রতিমাতে করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র ভূমিতলে তাঁর পূজা সর্বথা নিষিদ্ধ—

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ।
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবলভূতলে।।

এখানে পাঠকমনের বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য একটি বিষয় ব'লে রাখা প্রয়োজন। পাঠকের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে শাস্ত্রে শালগ্রামশিলা পূজার মাহাত্ম্য যখন এত প্রবলভাবে প্রচার করা হয়েছে তখন আদৌ কি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পূজার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা বৈষবভক্তদের নিকট আছে? এবিষয়ে হরিভক্তিবিলাস ও হরিভক্তিতরঙ্গিণী উভয় গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে যে যেহেতু প্রভুর ভুবনমোহন নয়নাভিরাম শ্রীমূর্তি দর্শনে ভক্ত অতি সহজেই আপ্লুত ও আকৃষ্ট হতে পারে এবং নিঃশেষে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁর শ্রীচরণে উজাড় ক'রে দিতে পারে, সেজন্য ভক্তদের পক্ষে তাঁর মূর্তিপূজা করাই বিধেয়—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপং গোকুলোৎসবং।
মনোজ্ঞং যষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে।।

শাস্ত্রে ভগবানের চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থসংহিতায় ভগবানের চারিহস্তের মধ্যে প্রথমে দক্ষিণদিকের নিম্নহস্ত, তারপর দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্বহস্ত, তারপর বামদিকের ঊর্ধ্বহস্ত এবং সর্বশেষ বামদিকের নিম্নহস্ত এই ক্রমানুসারে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর মূর্তির চব্বিশ প্রকার নাম বর্ণিত হয়েছে—

বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ।
পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ।
শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা।
গদাঞ্চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ।।

চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ।।
সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ।
চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ।।
গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ।
শঙ্খং চক্রং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ।।
গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা।
শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ।।
চক্রং শঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ।।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা।
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ।।
চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ।
পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ।।
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মলসদ্ভুজঃ।
হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ।।
পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা।
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা।।
শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ।
শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ।।[৪৮]

৪৮। হরিভক্তিবিলাস, ৫ম বিলাস, ১৭৬-১৭৭

সর্বশ্রেণীর পাঠকদের সুবিধার্থে সিদ্ধার্থসংহিতায় উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ভগবানের কোন মূর্তির কোন হস্তে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রের কিরূপ ক্রমিক অবস্থান থাকে তা নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে বিবৃত করা হল—

ক্রমিক সংখ্যা	মূর্তির নাম	চারিটি হস্তের অবস্থান			
		নিম্ন দক্ষিণহস্ত	ঊর্ধ্ব দক্ষিণহস্ত	ঊর্ধ্ব বামহস্ত	নিম্ন বামহস্ত
১	বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
২	কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
৩	নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৪	মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৫	পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
৬	অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
৭	সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
৮	গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৯	বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
১০	মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
১১	অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
১২	উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
১৩	প্রদ্যুম্ন	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৪	ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
১৫	বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৬	শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১৭	নরসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
১৮	জনার্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
১৯	অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
২০	হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
২১	পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২২	দামোদর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
২৩	হরি	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
২৪	বিষ্ণু	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ কখনও কোথাও বলেন নি যে তিনি নির্দিষ্ট ধর্মের অঙ্গীভূত, কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারই তাঁর লক্ষ্য। বরং তিনি পুনঃপুন বলেছেন যে তিনি, সত্য, তিনি শাশ্বত, তিনি সনাতন। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এ ধর্ম কোন লৌকিক ধর্ম নয়। এ ধর্ম সত্যধর্ম, এ ধর্ম ন্যায়ধর্ম, এ ধর্ম সর্বজীবে সমভাবাপন্ন ধর্ম, এ ধর্ম সেইধর্ম যা অনায়াসে সাবলীলভাবে দিকে দিকে ধ্বনিত করতে পারে—

ওম্ সহ নবাবতু সহ নৌ ভূনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।।

এ ধর্ম সেই ধর্ম যা সকলকে সমান চক্ষে দেখে, সকলের সমান জীবনধারণের অধিকার স্বীকার করে, কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না। এ ধর্ম সেই ধর্ম যা জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী সত্যের শিক্ষা, প্রেমের দীক্ষা ও করুণার ভিক্ষার আদর্শ। এ ধর্ম সেই ধর্ম যার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।"

এ ধর্ম সত্যস্বরূপ, পরম মঙ্গলময়, সর্বজীবে প্রেমময়, এবং পৃথিবী যখন অজ্ঞতা ও পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় তখন এই ধর্ম জ্যোতিষ্মান্ ধ্রুবতারা হিসাবে মানুষের হৃদয়াকাশে বিরাজ করে।

আর এহেন ধর্মের মূর্তপ্রকাশ যিনি তাঁর নাম যদি হয় 'শ্রীকৃষ্ণ' তাহলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁকে আপন করতে বাধা কোথায়? পৃথিবীতে 'সত্য'ই একমাত্র বিষয় যার মধ্যে কোন মাত্রা-ভেদ নেই। সত্য কখনও 'কম সত্য', 'বেশী সত্য' হয় না। আর পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যা অসত্যের পৃষ্টপোষকতা করে। তাহলে যে ধর্ম পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের নির্যাসের বাহক, তার গায়ে বিশেষ কোন ধর্মের গন্ধ খোঁজা কি সঙ্গত?

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলেছেন—'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ' এ কথার উদ্দেশ্য কি? এর মধ্য

দিয়ে তো তিনি পরধর্ম অসহিষ্ণুতার কথা বলেছেন? এর উত্তরে বলতে হয়—এই অনুমান সর্বৈব ভ্রান্ত। এখানে তিনি কোন লৌকিক ধর্মের কথা বলেন নি। তিনি যে ধর্মের কথা বলেছেন তা হল মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ প্রভৃতির ধর্ম, মানুষের প্রবৃত্তিধর্ম। তিনি সমগ্র মানবকুলকে অনুপ্রাণিত করেছেন শ্রুতি, স্মৃতি এবং বিভিন্ন লোকাচারমূলক ধর্মের বিভিন্ন বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে এসে সত্যাধার তাঁকে আশ্রয় করতে এবং নিজ নিজ কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন আপন কর্ম ক'রে যেতে। এ প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী বলেছেন—"বিধিকৈঙ্কর্যং ত্যক্ত্বা'। এর মধ্যে কোন পরধর্ম অসহিষ্ণুতা নেই, নেই কোন পরধর্মের প্রতি অসূয়া। তাই তিনি উদারভাবে সর্ব মানবসমাজের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে প্রচারিত করেছেন তাঁর অমর বাণী—'যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।' মানব কল্যাণে এতদপেক্ষা অধিক মূল্যবান উপদেশ আর কি হতে পারে? কোন ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে এ উপদেশ উপযুক্ত বা প্রযোজ্য নয়? কাজেই দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সকলের কাছে আদর্শ পুরুষরূপে প্রতীয়মান।

শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাজীবনপ্রবাহের মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্রের ধর্মই হল বিশ্বসংসারের সমস্ত নদ-নদী সমূহকে আহ্বান করা—হে নদ-নদী সকল। তোমরা ধেয়ে এসে আমার প্রতি। তোমাদের শরীরের স্থুলতা যখন গুরুভার মনে হবে, তখনই ছুটে এসে আমার মধ্যে লীন হয়ে যাও। আমি তোমাদের সকলকে আশ্রয় দেব।

বস্তুত মহাসমুদ্রের এইভাবে সকল নদ-নদীর আশ্রয়স্থল হওয়ার জন্য তাকে সর্বগ্রাসী অপবাদ দেওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণও তেমনি সকল জীবকুলকে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের আপন আপন আচারধর্ম, বিচারধর্ম, সংস্কারধর্ম, চিত্তবৃত্তি, অহঙ্কার, ষড়রিপুর বিকৃত-বাসনা ত্যাগ ক'রে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিতে। এটা তাঁর সঙ্কীর্ণতা নয়; মহানুভবতা। সমুদ্রকে যেমন কোন কিছু দিলে সে তার গ্রহণ না ক'রে ফিরিয়ে দেয়; ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে তিনি শরণাগতকে দুহাত ভ'রে উপহার দেন চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষতা যা মানবজীবনের পরম সম্পদ। ফলে তাঁকে শরণ নেওয়ার মধ্যে

মানবসমাজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বরং এর মধ্য দিয়ে মানব সমাজের আন্তরিক উৎকর্ষতারই বৃদ্ধি ঘটবে। শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধর্মের সংজ্ঞা এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে যা অন্যান্যদের সঙ্গেহ মেলে না। তাঁর কাছে ধর্ম কোন বিশেষ মতবাদের প্রচার নয়; তা অন্যান্য অনেক ধর্মের মত অপর ধর্ম মতাবলম্বীদের অচ্ছুৎ বা বিধর্মী মনে করা নয়। তিনি কোন পৌত্তলিকতার কথা প্রচার করেন নি; তিনি তাঁর সাকার, আকার কোন রূপের অর্চনার কথা কদাপি বলেন নি। বরং তিনি তাঁর ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের উনত্রিশ অধ্যায়ের একুশ ও বাইশ সংখ্যক শ্লোকে স্বয়ং তাঁর শ্রীমুখে আমরা একথা শুনতে পাই—

অহং সর্বেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্।।
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।

—আমি সর্বজীবে আত্মারূপে অবস্থান করি। সেজন্য যারা সেই সর্বজীবস্থ আত্মাকে অবজ্ঞা ক'রে আমার প্রতিমা-পূজায় রত থাকে তাদের সেই পূজা বিড়ম্বনা মাত্র।।২১।। যারা জানেনা যে আমি সর্বভূতে পরমাত্মা রূপে সদা বিরাজমান এবং সেই সমস্ত সর্বভূতস্থ আমাকে উপেক্ষা ক'রে কেবলমাত্র আমার মূর্তি-পূজায় ব্যাপৃত থাকে তারা অজ্ঞান এবং তাদের সেই প্রতিমা-পূজার অর্থ হল ভস্মে ঘি ঢালা।।২২।।

অর্থাৎ তাঁর কাছে ধর্ম মানে কেবল দেবালয়, ধর্মস্থানে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে মূর্তিপূজা নয়; তাঁর কাছে ধর্ম হল সর্বজীবের প্রতি অনন্ত প্রেম ও সর্বজীবের কল্যাণ সাধন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ ক'রে বলেছেন "ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।" সেই কারণে সর্বমানবকুলের নিকট তাঁর উপদেশ যে সমগ্র প্রাণীকুলের মধ্যেই তিনি পরমাত্মারূপে বিরাজিত জেনে সমস্ত ভেদভাব পরিত্যাগ ক'রে মৈত্রীভাবে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রেখে দান, মান ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা অর্চনা করলে তাঁর প্রকৃত পূজা করা হবে—

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।।
ভা ৩।২৯।২৭

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে শ্রেষ্ঠ ধর্মের কাজ হল মানুষের অন্তরে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিসাধন ও রজোগুণ ও তমোগুণকে বিনাশ ক'রে তাদের প্রভাবে সৃষ্ট অন্তরের ক্লেদ ও কালিমাযুক্ত পাপরাশিকে সমূলে বিনষ্ট করা—

ধর্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে।

যে ধর্মের সারকথা এধরণের তত্ত্ব ধারণ করে সেই ধর্মাদর্শকে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে আপত্তির কি থাকতে পারে?

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের প্রয়াগমাহাত্ম্যে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উমামহেশ্বরসম্বাদে মহাদেব উমাকে বলেন, যে ব্যক্তি শৌচপরায়ণ অর্থাৎ যিনি নিষিদ্ধ ভক্ষ্য বর্জন, সৎসঙ্গ গ্রহণ ও স্বধর্মে অবস্থান পূর্বক সর্বপ্রকার দেহ ও মনের আন্তর-বাহির নির্মলতাসাধন করেন, যিনি সদা সত্যপথে অধিষ্ঠিত, যিনি সর্বপ্রকার রাগদ্বেষবিবর্জিত, যিনি বেদাদি জ্ঞানশাস্ত্রে অনুরক্ত, যিনি নিত্য অতিথিসেবায় নিরত, যিনি পিতৃভক্ত ও মাতৃভক্ত, যিনি দয়াধর্মে সংযুক্ত এবং পাপপরাঙ্মুখ তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব নামে পরিগণিত—

শৌচসত্যাক্ষান্তিযুক্তো রাগদ্বেষবিবর্জিতঃ।
বেদবিদ্যাবিচারজ্ঞঃ স বৈ বৈষ্ণবঃ উচ্যতে।।
অগ্নিহোত্ররতো নিত্যং নিত্যং চাতিথিপূজকঃ।
পিতৃভক্তো মাতৃভক্তঃ স বৈ বৈষ্ণবঃ উচ্যতে।।
দয়াধর্মেণ সংযুক্তস্তথা পাপরাঙ্মুখঃ।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো যো বৈ স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে।।

সুতরাং যে তত্ত্বের অনুগামীদের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য এবম্প্রকার, সেই তত্ত্বের প্রবক্তাকে কোন বিশেষ সংকীর্ণ লৌকিক ধর্মীয় গোঁড়ামির নাগপাশে নিগড়িত

করার প্রয়াস কি সাধুবাদযোগ্য? পৃথিবীর যে কোন ধর্মের মানুষের যদি এই প্রকার চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে তা কি সার্বিকভাবে আদর্শ কল্যাণকামী মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে না? পৃথিবীতে এমন কোন শ্রেণীর মানুষ থাকতে পারে যার এ ধরণের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রচেষ্টার পথে তার লৌকিক ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারিত গীতোক্ত ধর্ম বা ভাগবত ধর্মের পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের থেকে একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী মহান বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য অনেক ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত কোন প্রকার বলপ্রয়োগকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি বলে গিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর প্রদর্শিত ধর্মমতে আগ্রহী হবে, একমাত্র তার কাছেই যেন তাঁর ধর্মমতের কথা উত্থাপন করা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতষট্টি সংখ্যক শ্লোকে তিনি অর্জুনকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।

—তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, তা তুমি তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং আমার নিন্দাকারী ব্যক্তিদের নিকট কখনও বলবে না।

তাই তাঁর ক্ষেত্রে অপর ধর্মের কাউকে ধর্মান্তরকরণে প্ররোচিত করার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ

বসুদেবনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময়। প্রকৃত ভক্তের জন্য তাঁর অন্তরে সদা বিরাজ করে অনন্ত প্রেম। তাঁর প্রতি সমর্পিতপ্রাণ ভক্ত যেমন সদা ব্যাকুল তাঁর শ্রীচরণ দর্শন লাভের আশায়, তিনিও তেমনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য উদ্বিগ্ন। তাই তিনি আত্মভোলা ভক্তদের তাঁর দর্শন লাভের সহজ মার্গ দেখিয়ে দিয়েছেন। একেই বলে 'ভাগবত ধর্ম'। এই ধর্ম অবলম্বন করলে মানুষের সর্ব বিঘ্ন বিনাশ হয় এবং এই ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কোন বিধিগত ত্রুটি হলেও পালনকারী চূড়ান্ত ফললাভ থেকে বঞ্চিত হয় না—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।।
যানাস্তায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।

ভা ১১।২।৩৪-৩৫

কিন্তু এই ভাগবতধর্ম পালনের পদ্ধতি কি? ভগবান ঋষভের নিরানব্বই পুত্রের মধ্যে নয়জন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কবি'। ভাগবতকার একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে এই কবির মুখ দিয়ে ভাগবতধর্ম পালনের সহজ ও সরলতম পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। সেটি হল—কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-অহংকার সহযোগে জন্মজন্মান্তরের স্বভাবের বশবর্তী হয়ে যা কিছু করা হবে তার সম্পূর্ণটাই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত এই ভাবনা নিয়ে চলা—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাঽঽত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।।

দেবর্ষি নারদের মুখে শোনা যায় মহৎ গুণ বিশিষ্ট এই ভাগবতধর্ম শ্রবণ,

বর্ণন, স্মরণ ও হৃদয় দিয়ে স্বীকার করলে অথবা এই পবিত্র ধর্ম পালনকারীর কার্য অনুমোদন করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি।।
ভা ১১।২।১২

এই ভাগবত ধর্ম যিনি পালন করেন তিনি ভাগবত নামে পরিগণিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়েই ঋষভদেবের অপর পুত্র হরি বলেছেন—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম।।৪৫

—যিনি কারও প্রতি বৈষম্য করেন না, সর্বভূতেই যিনি ভগবানের সত্ত্বাকে অনুভব করেন, সমস্ত প্রাণী ও বস্তু সকলকেই ঈশ্বরময় বলে উপলব্ধি করেন তিনিই উত্তম ভাগবত।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃতা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ।।৪৯

—জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রম, কষ্ট, ভয়, তৃষ্ণা এই সমস্ত রিপুগুলি সংসার-ধর্মের অঙ্গ। এগুলি শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে থাকে যে এই রিপুগুলি তাকে ভগবত চিন্তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত রিপুর কাছে বশ্যতা করেন না তিনিই উত্তম ভাগবত।

ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।৫০

—যার মনে বিষয়ভোগ লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই সবের কারণস্বরূপ বাসনার উদ্রেক হয় না এবং যিনি কেবলমাত্র বাসুদেবের চিন্তায় মগ্ন তিনিই পরম ভাগবত।।

এখান থেকে সহজেই অনুমেয় যে শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত এই ভাগবত ধর্ম সব মানবকুলের পক্ষে পরম কল্যাণকারী এবং জাগতিক প্রদাহের হাত থেকে মুক্তির উপায়।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ অবিসংবাদিতভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ সংখ্যক শ্লোক থেকে বাইশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবানের বিভিন্ন অবতার গ্রহণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে কোন অবতার সম্পর্কে 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু ঠিক পরবর্তী তেইশ সংখ্যক শ্লোকে ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্।।

অর্থাৎ এই শ্লোকস্থ 'ভগবান' শব্দ প্রমাণ করে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবান।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামীর কথনে শুনতে পাই যে পিতামহ ভীষ্ম বলেছের্ন, "এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।" অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। সকলের আদি কারণ ও পরমপুরুষ নারায়ণ।

বস্তুত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত জুড়ে এরকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে অবিসংবাদিত ভাবে 'ভগবান' রূপে স্বীকার করা হয়েছে।

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে তাঁর পরমেশ্বরত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।

—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই হলেন পরমেশ্বর। তিনি অনাদি, সকলের আদি এবং সর্ব কারণের কারণ।

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাখ্য নামক স্থানেও একই ভাবে প্রচারিত হয়েছে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই হলেন পরমব্রহ্ম—'কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

তাপনীয়শ্রুতিসমূহে দেখা যায় যে একদা সনকাদি ঋষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট জানতে চাইলেন পরমব্রহ্ম কে—"কঃ পরমো দেবঃ।" ইতি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন সমবেত ঋষিগণের কৌতূহল নিরসনের নিমিত্ত তাদেরকে বললেন—'কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম।

অনুরূপভাবে গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে দেখি যে নৈমিষারণ্যে একদা মহাভাগ শৌনকাদি ঋষিগণ মহাত্মা সুত ঋষিকে প্রশ্ন করেন—"দেবতানাং হি কো দেব ঈশ্বরঃ পূজ্য এব কঃ। কো ধ্যেয়ঃ জগৎপতি চ হন্তি কঃ। কস্মাৎ প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো ইতি।" অর্থাৎ দেবতাদের দেবতা কে? ঈশ্বরই বা কে? সকলের পূজ্য কে? ধ্যানের যথার্থ পাত্র কে? কেই বা পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা? কোন ব্যক্তি এই সনাতন ধর্মের সৃষ্টিকর্তা? উত্তরে সূতমুনি দ্বাদশ শ্লোকে বললেন—"একো নারায়ণো দেবো দেবানামীশ্বরেশ্বরঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম জন্মাদ্যস্য যতো ভবে।" অর্থাৎ একমাত্র নারায়ণ দেব দেবতাদেরও ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম এবং তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে তাঁর পরমেশ্বরত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
> তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
> পতিং পতিনাং পরমং পরস্তাদ্—
> বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।

—তিনি (বৈবস্বত যমাদি) সকল প্রভুর পরম প্রভু, (ইন্দ্রাদি) সকল দেবতার পরম দেবতা, (প্রজাপতিগণাদি) সকল প্রতিপালকেরও পরম প্রতিপালক।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ৩.৬.১ মন্ত্রে বলা হয়েছে—"'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ।" অর্থাৎ আনন্দময় বস্তুসকলই ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তো পরমানন্দময়—পরম আনন্দের আধার—পরম আনন্দের মহার্ণব। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মধ্যভাগের ছত্রিশতম অধ্যায়ের তেতাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—"কৃষ্ণপ্রেমামৃতং নাম পরমানন্দদায়কম"। তাই যেহেতু 'আনন্দ' শব্দের

অর্থ 'ব্রহ্ম', সেহেতু পরমানন্দের আধার সেই পরমানন্দমাধব পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' টীকা গ্রন্থে এরকম বহু সূত্র বিশ্লেষণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ ভগবান—"তদ্ এব বিরোধ পরিহারেণ বিরুদ্ধার্থানাম্ অপি অর্থানুকুল্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্তম্ এব দৃঢ়ীকৃতম্"। বস্তুত, নিছক রক্তমাংসের কোন মানুষ সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। আর যদি বা কোন এক ক্ষেত্রে সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, সেই শ্রেষ্ঠত্ব একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌছাতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ— স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, ঐশ্বর্য, সারল্য, মাধুর্য, শৌর্য, ক্ষমা, দয়া, দানশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বন্ধুবৎসলতা, রাজ্যশাসন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ অর্থে 'একম্ এবম্ অদ্বিতীয়ম্'।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬/১১ মন্ত্রে সর্ব জগতের কারণ পরমপুরুষ ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
> কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।

—তিনিই একমাত্র দেবতা যিনি সর্বপ্রাণীর মধ্যে লীন হয়ে আছেন। তিনি সর্বব্যাপী এবং সকল প্রাণীর অন্তর্যামী পরমাত্মা। তিনি সকলের সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা। তিনি জগন্নিবাস—বিশ্বচরাচরের সকল জীবের নিবাসস্থল। তিনি সকল কিছুরই সাক্ষী, তিনি সর্বভূতের চেতনস্বরূপ, তিনি সর্বৈবভাবে বিশুদ্ধ ও গুণাতীত।

ভাবতে অবাক লাগে শ্রীকৃষ্ণের কত রূপ। আর সর্বরূপেই তিনি শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয়। আমরা তাঁর এই সর্বশ্রেষ্ঠ বহুরূপের বর্ণনা পাই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের তেতাল্লিশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে অগ্রজ বলরাম সহ তাঁর কংসের মল্লক্রীড়াস্থলে প্রবেশকালে—

> মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণং স্মরো মূর্তিমান্
> গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

—মল্লযোদ্ধাদের কাছে তিনি বজ্র, সাধারণ মানুষের কাছে তিনি নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোকদের নিকট মূর্তিমান কন্দর্প, গোপেদের কাছে পরমাত্মীয়, স্বজন, দুষ্ট রাজাদের কাছে দণ্ডদাতা শাসনকর্তা, জনক-জননীর কাছে শিশু, অত্যাচারী ভোজরাজের কাছে কালান্তক যম, অজ্ঞজনের কাছে দেহাত্মাভিমানী, যোগীগণের কাছে পরমতত্ত্ব, পরমভক্ত বৃষ্ণিদের কাছে পরমদেবতা।

একই অঙ্গে এত পূর্ণরূপ কি পরমপুরুষ ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব?

আহা! কি অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত তাঁর শৈশব! ঘনদূর্বাদলশ্যামকান্তি এক শিশু, মাথায় মোহনচূড়া, কোমল হাতে রমণীয় সুর সৃষ্টিকারী মুরলী, কর্ণে-গলদেশে-বাহুতে-কটিদেশে শোভিত বনফুল ও পত্রের সুরম্য অলঙ্কার, সর্বাঙ্গে গোময় ও ধূলিলিপ্ত হয়ে নব গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ ক'রে বৃন্দাবনের গোঠে গোঠে গোচারণে রত। গোচারণকালে তাঁর মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ ক'রে ব্রজের বৃষ, মৃগ, গাভীগণ সেই বেণুধ্বনিতে অপহৃতচিত্ত হয়ে দলে দলে দন্তে তৃণগ্রাস ধারণ ক'রে উর্ধ্বকর্ণ হয়ে নিদ্রিত ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করে। এইভাবে সজ্জিত হয়ে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন পর্বতের সানুদেশে বিচরণশীল গাভীসকলকে বেণুধ্বনির দ্বারা আহ্বান করেন তখন নদী তার বহমানতা বিস্মৃত হয়, বনের বৃক্ষ-তরুলতা সমূহ শিহরিত হয়, আনন্দে, পুলকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণসার মৃগদের গৃহিণী মৃগীরা সবকিছু ভুলে তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়। তাঁর বাঁশী তো শুধু বাঁশী নয়! সমগ্র বিশ্বজগতকে আত্মানন্দের উচ্ছলনে পরিপ্লাবিত করার মূর্ত বিগ্রহ! কি অপূর্ব এই শিশু! গোচারণ অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় ব্রহ্মাদি বয়োবৃদ্ধ দেবতাগণ তাঁকে বন্দনা করেন! এ কি কল্পনা করা যায় এ শিশু কোন শিশু! শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত তাঁর গোচরণ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর অনুপম রূপমাধুর্য বর্ণনার মূল অংশের কিছুটা উদ্ধৃত না করলে তাঁর রূপমাধুর্য বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্ মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা।।
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপয়াতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্।।
ভা ১০।৩৫।২৪, ২৫

গোধূলি লগ্ন। শ্রীকৃষ্ণ গরু চরিয়ে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকগণকে সঙ্গে নিয়ে গৃহাভিমুখী হয়েছেন। সারাদিন বনে-বনে গোধনের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ পরিভ্রমণ ক'রে পরিশ্রান্ত তিনি। কপোলে বিক্ষিপ্ত অবিন্যস্ত অলকদাম বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণিকা। তবুও শ্রমক্লান্ত সেই শ্রীঅঙ্গের কি অপরূপ শোভা। ''চোখ-দুটি ঢুলু-ঢুলু, ঈষৎ লাল আভা লেগেছে, তাতে যেন আরও সুন্দর লাগছে। গলায় দুলছে বনমালা। সোনার কুণ্ডলের দীপ্তি কোমল কপোলে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাতে এক অদ্ভুত শোভা এনে দিয়েছে, আপক্ক বদরীফলের পীতকান্তি বিস্তীর্ণ হয়েছে বদনে। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে, বিশেষত মুখকমল থেকে ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা। ওই যে, তিনি তাঁর সখা গোপবালকদের বিদায় জানাচ্ছেন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে। দেখ, সখীরা, দেখ সবাই। ব্রজের ভূষণ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের মতো অভিজাত গতিতে আসছেন এ ব্রজে, আসছেন আমাদের দিকে। ব্রজে আবদ্ধ গোধনসমূহের মতো আমাদের সারাদিনের দীর্ঘ অসহ বিরহতাপ মোচন করার জন্যই সন্ধ্যামুখে উদিত পূর্ণ চন্দ্রসদৃশ আমাদের হৃদয়-হরণ শ্রীকৃষ্ণ এসে পড়েছেন।''[৪৯]

আহা কি অপরূপ! শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। কল্পনার চক্ষে এহেন দৃশ্য অবলোকন ক'রে স্নেহে, ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বাৎসল্যে, দাস্যসুখে, সর্বান্তকরণ পরিপ্লাবিত হয়ে যায়। দু'নয়নের প্রান্ত যেন এক দুর্লভ স্বর্গীয় সুখানুভূতিতে সিক্ত হয়ে ওঠে। নিবিড় পুলকে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা উপশিরা, রক্তবিন্দু-স্বেদকণিকা যেন ব'লে ওঠে—কে গো তুমি! তুমি কি হতে পারো না আমার প্রাণের দুলাল, আমার প্রাণের বান্ধব, আমার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা, আমার জীবন গাঙের মাঝি, আমার অন্তরের আরশি-নগরের পরমপ্রিয় পরশি।

৪৯। গীতাপ্রেসকৃত অনুবাদ।

তাঁর প্রেম সর্বকালে, সর্বযুগে শ্রেষ্ঠ। বস্তুত জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় কোন পুরুষের উদাহরণ পাওয়া যায় না যার প্রেমে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবহমানকাল জুড়ে আত্মহারা। তাঁর প্রেম এমনই সর্বজনীন ও হৃদয়-কর্ষণকারী যে তাঁর প্রতি নিবিড়, নিখাদ, নিঃস্বার্থ, নির্মল, নিরহংকার, নিঃশঙ্ক, নিরবদ্য, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম প্রেমানুভূতিতে প্রেমিক মন ঘর-সংসার, আত্মীয়-পরিজন, অর্থ-সম্পদ, কামনা-বাসনা সবকিছু বিস্মৃত হয়ে সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ধাবিত হয় তাঁর পরমকাঙ্ক্ষিত শ্রীপাদপদ্মের অভয়াশ্রয়ের আশায়। কখন পরনের বসন স্খলিত হ'লে পরে খেয়াল থাকে না, চলার রুক্ষ বন্ধুর পথের তীব্র-তীক্ষ্ণ কঙ্কর-কণ্টকে কোমল চরণ বিদীর্ণ হয়ে রুধিরাপ্লুত হলেও তা তার গতিকে স্তব্ধ করতে পারে না। তাঁর প্রেম যে স্বর্গীয়। স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির কোন স্থান সেখানে কল্পনাতীত। বরং তাঁর প্রেম ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে সুদূর অতীন্দ্রিয়ের সুদুর্লভ পারমার্থিক আস্বাদ দান করে। তাঁর প্রেমের আকর্ষণ এমনই দুর্বার যে কেবলমাত্র মানব-মানবীই নয়, পশু, পক্ষী, এমনকি লতা-বৃক্ষরাজিও তাঁর প্রেমে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ভাগবতকার কৃষ্ণপ্রেমের এই প্রকৃত স্বরূপ ব্রজগোপীগণের মধ্য দিয়ে বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করেছেন—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্ছিতেন সম্মোহিতাঽর্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।

ভা ১০।২৯।৪০

—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে কোন অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ এনে দাও যে তুমি, বাঁশীতে তোমার কী তান বাজে, কোন স্বর, কোন্ অলৌকিক সুরের মূর্ছনা, শ্রবণপথে প্রবেশ করে যা মুনির মানসকেও করে তোলে চঞ্চল? সেই বিশ্ববিমোহন গীতধারামৃতের আকর্ষণে আর তোমার এই রূপ, যার একটি কণা ক্ষরিত হয়ে তিন ভুবনের সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্যের জন্ম দিয়েছে, যা দেখে মানুষ তো কোন ছার, গোবৃন্দ থেকে শুরু করে সকল পশু, পাখি, এমন কি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত পুলকিত-রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে। লৌকিক ধর্মের তথাকথিত সাধু আচারের পথ থেকে ভ্রষ্ট না

হয়ে পারে এমন কেউ আছে কি, কোনো স্ত্রী, কোনো পুরুষ? লোকাতীতের আহ্বান যার কাছে এসে পৌঁছেছে, তাকে বাঁধবে কোন লোকাচার?"[৫০]

বস্তুত তাঁর প্রেম হল পরমপ্রেম, তাঁর রূপ হল পরমরূপ। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর সেই প্রেম, তাঁর সেই রূপ তুলনা-রহিত যার স্বরূপ ব্রজগোপীগণের অন্তর্নিহিত মর্মকথা রূপে সমগ্র কৃষ্ণানুরাগীর হৃদয়ানুভূতিকে প্রতিধ্বনিত করে—

"তোমার রূপের মোহিনী শক্তিতে গবাদি পশুগণ তৃণভক্ষণ ত্যাগ করে, পক্ষীগণ নয়ন মুদিয়া ধ্যানী যোগীর মত বৃক্ষশাখায় নীরবে বসিয়া থাকে। হরিণ-হরিণী বন ছাড়িয়ে তোমার অনুগমন করে। বাঁশীর তানে যমুনা স্থির হয়, গোবর্ধনশিলা গলিয়া যায়, শুষ্ক তরু পল্লবিত হয়। যখন আমরা তোমার রূপ দেখি, ভাবি, সব ইন্দ্রিয়গুলি কান হইলেই ধন্য হইতাম—

বিলোক্য কৃষ্ণং ব্রজবামনেত্রাঃ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং নয়নত্বমেব।
আকর্ণ্য তদ্বেণু-নিনাদভঙ্গী
বৈচ্ছন্ পুনস্তাঃ শ্রবণত্বমেব।।"[৫১]

৫০। গীতাপ্রেসকৃত অনুবাদ।
৫১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—ডঃ মহানমব্রত ব্রহ্মচারী।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

বন্ধুবৎসলতার ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণ বিরল হতে বিরলতম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। একথা সর্বজনবিদিত যে একজন আদর্শ সখা হিসাবে তিনি অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে যেভাবে সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে অর্জুনকে সাহস যুগিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সমস্ত বিপদ অতিক্রম ক'রে অর্জুন সহ সমগ্র পাণ্ডবপক্ষকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমি থেকে নিরাপদে বের ক'রে এনেছিলেন তা এককথায় অপ্রতিম। কিন্তু বোধকরি এখানে একথা বলা হয়ত অসমীচীন হবে না যে অর্জুনসখা হিসাবে তিনি যা যা করেছিলেন তা না যতখানি বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বস্ততা বোধে উদ্বুদ্ধ ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল তাঁর অবতারত্বের প্রতি বাধ্যবাধকতা। বস্তুত অর্জুনের সখা হিসাবে এই ভূমিকা পালন করতে তিনি বাধ্য ছিলেন। তিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার পূর্বপ্রতিশ্রুতি নিয়েই। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর পক্ষে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করা ও তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে সখা অর্জুনকে এভাবে সাহায্য করা ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। একাজ না করলে তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পাপে লিপ্ত হতেন যা তাঁর মতো পরমপুরুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু তিনি তাঁর এক অতি দীন, দরিদ্র, নিরন্ন, অতি কাঙাল বাল্যসহপাঠীর প্রতি যে অতুলনীয় উন্নত মার্গের বন্ধুবৎসলতা প্রদর্শন করেছেন তা সর্বকালে, সর্বযুগে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ধারণ ক'রে থাকবে। তাঁর এই বন্ধুসৎকারের ঘটনা একথাই নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করে যে তিনি সত্যই পরমপুরুষ। একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্যতিরেকে অপর কারও পক্ষে বন্ধুসৎকারের এরকম দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব নয়। এই কাজের পিছনে তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। একাজ করা বা না করার সঙ্গে তাঁর কোনও লাভালাভের বিষয় জড়িত ছিলনা। কৃষ্ণের মত প্রবল ঐশ্বর্যপূর্ণ, প্রবল পরাক্রমী, প্রবল প্রতাপবান নরপতি সুদামার মতো হতদরিদ্র, নিরন্ন, ছিন্নবসন সুদীর্ঘ বৎসর সাক্ষাৎহীন বাল্য সহপাঠীকে অনায়াসে বিস্মৃত হতে পারতেন। তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত

অট্টালিকার দ্বারে দণ্ডায়মান সর্বাঙ্গে ধুলিধূসরিত, শীর্ণকায়, অতি মলিনদর্শন সেই ব্রাহ্মণকে দেখে উপেক্ষা করতে পারতেন। বস্তুত কোন মানুষ যখন ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের অতি উচ্চতম শিখরে অবস্থান করেন তখন তাঁর এধরণের ব্যবহারই স্বাভাবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সুদামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত হল। জীর্ণবসন সুদামাকে অতি সহসা তাঁর অট্টালিকার দ্বারের দিকে আগত হতে দেখে তিনি তাঁকে উপেক্ষা তো করলেনই না, বরং যেন ছুটে এসে তাঁকে ঐ অবস্থায় বক্ষে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। পরমপ্রিয় সখা ব্রাহ্মণদেবতার অঙ্গস্পর্শ করে নিবিড় আনন্দে তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত হল। তাঁর কোমল নয়নকমল হতে বিগলিত হল প্রেমাশ্রুধারা। পরম আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যে মহামূল্যবান পালঙ্কে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী উপবেশন করছিলেন সেই পালঙ্ক থেকে লক্ষ্মীদেবীকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে উপবেশন করালেন আর স্বয়ং পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন ক'রে তাঁর পূজা করলেন। অনন্তর তিনি স্বহস্তে তাঁর পাদপ্রক্ষালন ক'রে সেই পাদোদক নিজ মস্তকে ধারণ করলেন ও বাল্যসখার অঙ্গ দিব্যগন্ধ, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমের দ্বারা লেপন ক'রে দিলেন। তারপর সুগন্ধি ধূপ ও দীপ সহযোগে তাঁর আরতি করলেন এবং তাম্বূল ও গাভী প্রধান করলেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গে পরম মমতাময় ভঙ্গীতে বাল্যকালের অতি সুমধুর স্মৃতি রোমন্থনে প্রবৃত্ত হলেন। সাক্ষাৎ রুক্মিণীদেবী স্বহস্তে চামর ব্যজনের দ্বারা তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

সাধারণের কাছে এ এক অতি অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীগণ তাঁদের নির্মলকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই মলিন বেশধারী ব্রাহ্মণকে পরম প্রীতি সহকারে অর্চনা করতে দেখে পরম বিস্মিত হলেন। তাঁদের কাছে এটা কিছুতেই বোধগম্য হল না এই নিতান্ত শ্রীহীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কোন পুণ্যকর্ম করেছিলেন যার ফলে ত্রিলোকগুরু শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পর্যঙ্কের উপর তাঁকে বসিয়ে প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে অগ্রজ শ্রীবলরামের ন্যায় তাঁকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁকে নিবিড় আলিঙ্গনে রত। শ্রীশুকদেবের ভাষায়—

অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্তিনা।
বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্।।

কিমনেন কৃত পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ।।
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভূতঃ।
পর্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা।।

ভা ১০।৮০।২৪-২৬

এধরনের বন্ধুসৎকার শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ বলেই সম্ভব। এরকম অতি উচ্চ অবস্থানে আসীন কোন সাধারণ পুরুষের পক্ষে তার ঐশ্বর্য ও পদের অহঙ্কার ও দম্ভ এভাবে পরিত্যাগ ক'রে এরকম দীন, হীন, অখ্যাত, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর একজন মানুষ যিনি কবে কখন ঘটনাচক্রে তাঁর সাধারণ সহপাঠী ছিলেন, কতদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণে যাঁর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, সেই রকম একজন মানুষকে পরম আত্মীয়তায় বক্ষে জড়িয়ে ধ'রে আলিঙ্গন ক'রে স্বহস্তে তাঁর পাদপ্রক্ষালন ক'রে তাঁর পূজা করা নিতান্তই অসম্ভব। এমন অন্তহীন উদারতা, এমন সীমাহীন চারিত্রিক উৎকর্ষতা তিনি পরমপুরুষ বলেই সম্ভব হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় যে কৃষ্ণসখা হিসাবে 'সুদামা' নামের কোন উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে নেই। কেবলমাত্র দশম স্কন্ধের অশীতিতম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে—"কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কোন একজন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর বর্ণনা ও তাঁর প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আচরণ দেখে অনুমান করা হয় এই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সখাই ছিলেন কৃষ্ণসখা সুদামা। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একচল্লিশ অধ্যায়ের তেতাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে 'সুদামা' নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইনি কৃষ্ণসখা সুদামা নন, ইনি একজন মালাকার। "ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ" অর্থাৎ অতঃপর তাঁরা দুইজন (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) সুদামা নামে একজন মালাকারের গৃহে গমন করলেন।

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ

মহাভারত ও বিবিধ পুরাণ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণের বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা ক'রে শেষ করা কেবল দুষ্করই নয়, তা অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে দেখতে পাই ব্রহ্মা নারদকে বলছেন যে পৃথিবীতে এমন কোন বৈজ্ঞানিক থাকতে পারেন যাঁর পক্ষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণু-পরমাণুও গণনা ক'রে ফেলা সম্ভব, কিন্তু তাঁর পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ, শৌর্য, ঐশ্বর্য, উৎকর্ষতা প্রভৃতির প্রাচুর্য, বিশালতা, গভীরতা, প্রসারতা ইত্যাদি পরিমাপ ক'রে শেষ করা সম্ভব নয়—

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরু কম্পযানম্।।

ভা ২।৭।৪০

ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষুদ্র অণ্ডের অভ্যন্তরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংরক্ষণের মতো অতি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সমগ্র বৈশিষ্ট্যকে প্রোথিত ক'রে রেখেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে অর্থসহ শ্লোকটি প্রথমে উদ্ধৃত করা হল—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

—"যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, যাহার সত্তায় এই জগৎ সত্ত্বাবান, যাহার অসত্ত্বায় ইহা অসৎ, সকল সদ্বস্তুর স্বরূপ-তত্ত্বের যিনি জ্ঞাতা, যাহার নিজের জ্ঞান ও সত্ত্বা স্বতঃসিদ্ধ, কাহারও উপর

নির্ভরশীল নহে, যে দুর্বোধ্য বেদতত্ত্ব নির্ধারণে দেবতারাও মোহযুক্ত তাহা যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকট করিয়াছেন, যিনি অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া মায়াময় জগৎও সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেই স্বপ্রভায় সকল অন্ধকার বিনাশকারী সত্যস্বরূপ পরম বস্তুকে ধ্যান করি।"[৫১]

শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য যা এই শ্লোকে উক্ত হয়েছে তা হল তিনি 'স্বরাট্' অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ। প্রকাশিত হবার জন্য তাঁর কোন মাধ্যম বা কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কাষ্ঠে যেমন অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে এবং সঠিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ উপস্থিত হ'লেই সে যেমন স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে অরণ্যে মহাদাবানল সৃষ্টি করে, তদ্রূপ তিনিও উপযুক্ত শুভক্ষণ উপস্থিত হ'লেই স্বয়ং প্রকাশিত হ'য়ে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্মে লিপ্ত হন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকটি এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য বহন করে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সহ বিভিন্ন লীলামাধুর্যের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই এই স্কন্ধটি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। বিশেষভাবে এই স্কন্ধের উনত্রিশ অধ্যায় থেকে তেত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে ভাগবতপ্রেমীদের কাছে তা "ঔষধিভ্যোঽমৃতং যথা" অর্থাৎ সমগ্র ওষধির মধ্যে অমৃততুল্য। এই পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের যে মহৎ লীলা বিবৃত হয়েছে তার অর্থ বড়ই গূঢ়, তত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। সঠিক তত্ত্বজ্ঞানহীন মানুষ অসাবধান কৌতুহলবশতঃ এর রসাস্বাদনে ব্রতী হলে এর বহিরঙ্গের শক্ত দুর্ভেদ্য আবরণে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পরে সমগ্র তত্ত্বটি সম্পর্কে তপ্ত মরুভূমি বক্ষে "তেজোবারিমৃদাং যথা" অর্থাৎ মারীচিকাকে সুমিষ্ট পেয় বারিরাশি মনে করার মত ভ্রমাত্মক ধারণার অধিকারী হবে। হীরক সম্পর্কে ধারণাবিহীন ব্যক্তি যেমন হীরকখণ্ডকে তুচ্ছ কাঁচখণ্ড মনে করবে, তেমনই মিথ্যা অজ্ঞান-নাশকারী 'মহৎতত্ত্ব' এর জ্ঞানের আলোকে অন্তর সম্যক আলোকিত না হ'লে এর প্রকৃত রসাস্বাদনে মানুষ কেবল অপারগই

৫১। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকৃত অনুবাদ। দ্রষ্টব্য-তৎকৃত 'শ্রীমদ্ভাগবতম্, দশম স্কন্ধ তৃতীয় খণ্ড।

হবে না, এর বাহ্যিক স্থূল অর্থটিকে সত্য ভেবে নিতান্ত ভ্রমাত্মক ধারণার অধিকারী হবে যা ভাগবত বিরোধী। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে রাসলীলা হল অপ্রাকৃত ও শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াসম্ভূত মায়াচিত্র মাত্র। ফলে এখানে যা চর্মচক্ষে আপাতভাবে দৃশ্যমান হয়েছ তা সত্য নয়। এর গভীরে যে গূঢ় অর্থ নিহিত আছে তা অনুধাবন করতে হ'লে প্রয়োজন গভীর অন্তর্দর্শন যা অর্জন করতে হ'লে প্রয়োজন সুদীর্ঘ অনুশীলন ও সাধনা। তাই ব্যাসদেব অতি সঙ্গত কারণেই ভক্তের উপকারার্থে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম শ্লোকেই তার সোপান রচনা করেছেন। এই শ্লোকের অন্তিম পদ হিসাবে তিনি চয়ন করেছেন সুগভীর তাৎপর্যবহ একটি শব্দ—'ধীমহি' যেটি গায়ত্রীমন্ত্রের একটি অতি পবিত্র অঙ্গ। গায়ত্রী এমনই এক মন্ত্র যা সঠিক ও পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করতে পারলে অন্তরের সমস্ত তমসা দূরীভূত হয়ে অন্তরের গভীরে এমনই এক স্বর্গীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যেখানে নিত্য সত্য ও জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়। অন্তর তখন শুক্তিকে অতিক্রম ক'রে তার অন্তরস্থ মুকুতাকে খুঁজে পেতে সমর্থ হয়। ঐশ্বর্য-পরিপূর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধীরে ধীরে আলোর প্রকাশ ঘটতে থাকলে যেমন প্রকোষ্ঠস্থ মূল্যবান ঐশ্বর্যসমূহ ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে, তেমনই যেমন যেমন গায়ত্রীমন্ত্র আত্মস্থ হতে থাকে তেমন তেমন অন্তরের সমস্ত অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তবোধ অপসারিত হ'য়ে বস্তুর বাহ্যিক স্থূল সত্বাকে অতিক্রম ক'রে মানব তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পায়। তাই ব্যাসদেব দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলামাধুর্যের যে নবনীত পরিবেশন করবেন তার অমৃতরস যাতে ভক্তগণ সঠিক অর্থে আস্বাদন ক'রে মানব জনম ধন্য করতে পারেন তার জন্য তাঁদের আত্মিক অবস্থাকে উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'ধীমহি' এই পবিত্র পদটি ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদেরকে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের আবহে সিক্ত রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যার তুলনা পৃথিবীর আর কোন ধর্মশাস্ত্রোক্ত অপর কোন ধর্মপুরুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। বস্তুত অপর কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে এমন কোন আরাধ্য দেবতার দৃষ্টান্ত মেলে না যাঁকে আপন সন্তান হিসাবে লাভ করার কামনা করা যায়, যিনি নিজেকে পরমেশ্বর জেনেও ঢেঁকিশালে ধূলি-কঙ্করপূর্ণ ভূমিতে আনন্দে টলোমলো ছন্দে হামাগুড়ি

দিয়ে বেড়ান, যাঁকে জন্মদানের পর আর পাঁচটি মানব সন্তানের মতই বক্ষে ধারণ ক'রে জননী মাতৃজীবনের পরমার্থ স্বর্গীয় স্নেহসুধা পান করতে পারেন, যাঁর আকাশ-নীল পেলব কোমল কপোলদ্বয় পরম মাতৃস্নেহে মর্দন ক'রে, স্বর্গীয় সুষমাযুক্ত অধরে চুম্বন ক'রে প্রতিবেশী রমণীগণ জগতে অতুল আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, যাঁর জন্মগ্রহণের পর আর পাঁচটি মানব সন্তানের মতই জাতক্রিয়াদি সম্পন্ন করা যায়, যাঁকে জননী আর পাঁচটি মানব শিশুর মতই দুরন্তপনারজন্য লাঠি-হাতে কপট শাসন করতে পারেন, দুরন্তপনা প্রতিহত করার জন্য রজ্জু দ্বারা তাঁর কোমর বদ্ধ ক'রে কীলকের সঙ্গে আটকে রাখতে পারেন, যাঁকে অতি শৈশবেই বিপদ সঙ্কুল প্রান্তরে-জঙ্গলে যষ্ঠি হাতে গোয়ালের গাভী চড়াতে পাঠানো যায়, যাঁকে তাঁর পিতৃস্বসা তিনি স্বয়ং ভগবান জেনেও ভ্রাতুষ্পুত্র বোধে স্নেহ করতে পারেন, যাঁকে অতি সাধারণ জনও প্রাণের সখা হিসাবে, বাল্যবন্ধু হিসাবে লাভ করতে পারেন, যাঁর স্বর্গীয় মোহনরূপে মোহিত হ'য়ে পুরাঙ্গনাগণ সর্বসংস্কার বর্জন ক'রে পরমানন্দে তাঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে অপাপবিদ্ধ স্বর্গীয় প্রেম নিবেদন করেন, যাঁর সঙ্গে নিবিড় আলাপচারিতায় ব'সে ঘর-সংসারের টুকিটাকি বিষয় আলোচনা করা যায়। আরাধ্য দেবতা এত কাছের জন। আত্মার আত্মীয়। ঈশ্বর সম্পর্কে এ এক অতি অভিনব চিন্তাধারা যার প্রতিফলন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য অন্য কোন দেবদেবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত আরাধ্য দেবতা সম্পর্কে এধরণের অভিনব মতবাদের স্ফুটন শ্রীকৃষ্ণেই শুরু, শ্রীকৃষ্ণেই শেষ।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে তিনি বলেছেন— ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'' অর্থাৎ তাঁকে যে যেভাবে লাভ করতে চাইবে, তিনি সেভাবেই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। গীতাশাস্ত্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' শীর্ষক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন—''শ্রীভগবান্ ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, ভাবগ্রাহী, অন্তর্যামী। যিনি তাঁহাকে যে-ভাবে উপসনা করেন, তিনি সেইভাবেই তাঁহাকে তুষ্ট করেন। ব্রহ্মবাদীগণ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন; যোগীগণ পরমাত্মারূপী তাঁহাতেই কৈবল্য প্রাপ্ত হন; কর্মীগণ কর্মপ্রবর্তক কর্মফলদাতা ঈশ্বররূপে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন; ঐশ্বর্যভক্তগণ বিধিমার্গে ঐশ্বর্যরূপী তাঁহারই

সালোক্যাদি লাভ করেন; মাধুর্যভক্তগণ রাগমার্গে তাঁহারই নিত্যদাস্যাদি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।'' বিষয়টির মধ্যে কোন অস্পষ্টতা, বিকৃতি বা অস্বাভাবিকত্ব নেই। একটি অতি বাস্তব চেনা-জানা উদাহরণ দিলে বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। একজন ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি আবার সঙ্গীতজ্ঞ, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক পদাধিকারী, হোমিওপ্যাথিক সুচিকিৎসক। এতগুলি গুণের অধিকারী যিনি তাঁর কাছে যে গণিত শিক্ষা করতে চায় তাঁকে সে গণিতজ্ঞ হিসাবে পাবে, যে তাঁর সঙ্গীত উপভোগ করতে চায় তাঁকে সে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে পাবে, যে প্রাশসনিক প্রতিষ্ঠানের পরিসেবা পেতে চায় সে তাঁকে এইপ্রকার প্রাশসনিক পদাধিকারী হিসাবে পাবে। যে তাঁর কাছে রোগের চিকিৎসা করাতে চায় সে তাঁকে চিকিৎসক হিসাবে পাবে। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও বক্তব্যটি একই ভাবে প্রযোজ্য। তিনি তো অনন্তগুণের অধিকারী। সর্বজীবের প্রতি পরম প্রেমময় ও দয়াশীল। তিনি যে জগৎপিতা! তাই তাঁর বিভিন্ন সন্তান, বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন নির্মল আবদার যে তিনি স্নেহার্দ্র হৃদয়ে পূরণ করবেন এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। তাই দেখা যায় মহর্ষি অত্রি তাঁকে পুত্ররূপে লাভ করার কামনা করেছিলেন ব'লে তিনি তাঁকে বলেছিলেন— ''দত্তো ময়াহমিতি।'' অর্থাৎ 'আমি নিজেকে তোমায় দান করলাম' এবং তিনি তাঁর পুত্ররূপে অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন এবং তিনি মহর্ষিকে 'আমি নিজেকে তোমায় দান করলাম' এরূপ কথা বলেছিলেন ব'লে সেই অবতারে তাঁর নাম হয় 'দত্তাত্রেয়'। আর মাতা দেবকীর অভিলাষ পূরণ করার জন্য তিনি যে বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হন একথা তো পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ভয়ঙ্কর রাক্ষসী পূতনা অসদুদ্দেশ্যে হলেও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্তন্যপান করাতে চেয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জেনেও তার সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন যদিও অসাধু উদ্দেশ্যের জন্য কৃষ্ণের হাতে তাকে অন্তিম পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। নিষ্কাম প্রেমের প্রতীক গোপিনীগণ তাঁর সঙ্গে পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে নিরাশ করেননি। অতি দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামা নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে প্রিয়সখা হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সে বাসনা অপূর্ণ রাখেন নি। অর্জুন তাঁকে সখা ও যুদ্ধে রথের সারথি রূপে কামনা করেছিলেন, কৃষ্ণ সেই রূপেই তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

অষ্টাত্রিংশ তরঙ্গ

প্রশ্ন হতে পারে বর্তমান জগতের এই অত্যাধুনিক জীবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের উপযোগিতাই বা কি এবং আমরা কেনই বা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের অনুশীলন বা অনুগমন করবো। এই প্রশ্নের উত্তরে অপর একটি খুব সঙ্গত প্রশ্ন করতে হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও নিত্য উন্নয়নশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ সমগ্র মানব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য কি? নিঃসন্দেহে এর লক্ষ্য উন্নততর সমাজব্যবস্থা এবং উন্নততর মানবজাতি সৃষ্টি করা। এখানে আর একটি প্রশ্ন জাগে যে একটি সুঠাম শক্তিশালী সুদৃঢ় শরীর যদি উলঙ্গদেহে সমাজের মধ্যে বিচরণ করে তাহলে সভ্য মানুষ কি তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে? নিশ্চয়ই নয় বরং সভ্য রুচিশীল মনুষ্যসমাজ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু সেই শরীর উপযুক্ত বসনাবৃত হয়ে এলে মানুষ তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অতি উন্নত আধুনিক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে এই সমাজব্যবস্থা মাত্রাতিরিক্তভাবে দেহাত্মবাদী হয়ে পরছে এবং ক্রমশ অন্তরের বসন লুপ্ত হয়ে চলেছে। ফলে এই সমাজব্যবস্থা একটি নগ্ন পেশীবহুল শরীরে পরিণত হচ্ছে যা সার্বিক মানব কল্যাণের পক্ষে নিতান্ত হানিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞানের কাছে শরীরের শ্রীবৃদ্ধির পথ জানা আছে, কিন্তু মনের শ্রীবৃদ্ধির উপায় তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মানুষ যত বেশী দেহাত্মবাদী হয়ে পরছে, ততই মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধ্বংসাত্মক ষড়রিপুদোষ মানুষকে গ্রাস করছে। এখন মানুষের সামনে লক্ষ্য কেবল দুটি— যে কোন উপায়ে অধিক উপার্জন ও অত্যধিক পরিমাণে দৈহিক ভোগ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুটি জগৎ—একটি পশুজগৎ ও অপরটি মনুষ্য জগৎ। অন্যান্য সমস্ত দিক বিচারে মানুষ পশুদের থেকে ভিন্নতর হবে কিন্তু আত্মিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না—পশুদের মত মানুষের জীবনও আহার-নিদ্রা-মৈথুন সর্বস্ব হয়ে থাকবে এটা কাম্য নয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কোন মানুষ চায় না যে তার সন্তান ধনকুবের হোক আর ব্যক্তিগত জীবনে মদ্যপ, লম্পট, জঙ্গী ইত্যাদি হয়ে জীবন অতিবাহিত করুক। এটা যদি

সত্য হয় তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজ যখন এই রকম অন্ধকারের অতলে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে তখন তার প্রতিকারের পথ অন্বেষণ করা কি সমীচীন নয়? বর্তমান পৃথিবীতে দিকে দিকে পরিলক্ষিত হচ্ছে হিংসা, ঘৃণা, হানাহানি, রক্তপাত, তীব্র রিরংসা, দেহের প্রতি অত্যধিক প্রেম অর্থাৎ তীব্র ভোগবাদ ইত্যাদি রিপুদের অভ্যন্তরে মানুষ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। তার বহিরঙ্গের উন্নতি ঘটছে ঠিকই, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ রিক্ত, দীন। তার না আছে বিবেক, না আছে বৈরাগ্য, না আছে সত্য, তপস্যা, শৌচ (অন্তর ও বাহিরর পবিত্রতা), দয়া দান। মানুষ এখন নিজ নিজ উদর পূর্তির চিন্তাতেই বিভোর এবং অসত্যভাষী—

সত্যং নাস্তি তপঃ শৌচং দয়া দানং ন বিদ্যতে।
উদরম্ভরিণো জীবা বরাকাঃ কূটভাষিণঃ।।[৫২]

এখন পরিপূর্ণরূপে আত্মসুখসর্বস্ব মানুষের পরিচয় মদিরাপূর্ণ কাচপাত্রের ন্যায়। কিন্তু এ তো মানুষের চিরন্তন পরিচয় নয়। আদর্শ মানুষ হবে নবনীতপূর্ণ স্বর্ণকলসের মতো। তার বহিরঙ্গ যেমন হবে অতি মূল্যবান, তার অন্তরাত্মা তেমনি হবে পবিত্র, স্বর্গীয় সুষমাযুক্ত। কিন্তু কিভাবে কোন আগুনে পুড়িয়ে ভোগসর্বস্ব মানুষের পুতিগন্ধময় দেহকে করা যাবে সুবর্ণমণ্ডিত। কোথায় আছে সেই নবনীতামৃত যা আত্মস্থ করতে পারলে মানুষের অন্তর হতে নিত্য বিনির্গত হবে স্বর্গীয় সৌরভ! শ্রীমদ্ভাগবত উদাত্ত ঘোষণা করছে যে সেই দুষ্প্রাপ্য নবনীতামৃত নিহিত আছে তার ছত্রে ছত্রে, প্রতিটি শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে। রসিক জন তা আহরণ ক'রে নিতে পারলেই হল।

ব্যাসদেব ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তিনি জানেন কালচক্রের আবর্তনে একদিন মনুষ্যকুলকে গ্রাস করবে নিদারুণ অবক্ষয়। কলিগ্রস্ত মানুষ একদা বিস্মৃত হবে প্রাচীন মুনি-ঋষিদের যুগ-যুগান্তরে সাধনালব্ধ উন্নত মানববৈশিষ্ট্য। জীবনবোধের ক্ষেত্রে পশু-মানুষের সহাবস্থান ঘটবে। জীবদ্দশায় উভয়েরই একমাত্র লক্ষ্য হবে যে কোন উপায়ে অধিক দৈহিক ভোগ। আত্মতত্ত্ব তার কাছে হবে হাস্যকর। চরম দেহাত্মবাদ হবে তাদের একমাত্র সাধন-মার্গ। কিন্তু এর ফলে তো সৃষ্টির মহিমা ও সৌন্দর্য লয়প্রাপ্ত হবে! মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসবে পাপের গহন অন্ধকার! তাই ব্যাসদেব কলিগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য গ্রথিত করেন

৫২। পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড

শ্রীমদ্ভাগবত। তাই শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্মকথনে বলা হয়েছে—

কালব্যালমুখগ্রাসত্রাসনির্ণাশহেতবে।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কিরেণ ভাষিতম্।।[৫৩]

বস্ত্র মলিন হলে যেমন তাকে শোধনের প্রয়োজন হয় তেমনি কর্মপ্রবাহের আবর্তে চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে। তখন সেই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বলা হয়েছে যে চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলময় উপায় আর কিছু নেই, "এতস্মাদপরং কিঞ্চিন্মনঃশুদ্ধ্যৈ ন বিদ্যতে।"

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত জুড়ে দুগ্ধের মধ্যে সুপ্ত নবনীতের ন্যায় ছড়িয়ে আছে আদর্শ ব্যক্তিচরিত্র, দেশ ও সমাজ গঠনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য পরম মূল্যবান লোকশিক্ষা যা মূলত শ্রীকৃষ্ণমুখনিসৃত যদিও অপরাপর বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বহুল পরিমানে লোকশিক্ষা প্রচার করা হয়েছে। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবত শুরুই হয়েছে এক পরম লোকশিক্ষা দিয়ে—'সত্যং পরং ধীমহি' অর্থাৎ আমরা যেন সার্বিকভাবে জীবনে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হই। এই ধ্যানমন্ত্রের মাধ্যমে সকলের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে অন্তরের সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার ও মিথ্যার আবরণ ছিন্ন ক'রে সাত্ত্বিক চিত্তে সত্য ও জ্ঞানের চির ভাস্বর দীপশিখা প্রজ্বলনের আহ্বান। অজ্ঞানতা ও মিথ্যা দ্বারা আদর্শ জীবন গঠিত হতে পারে না। সফল জীবনের দুটি মন্ত্র—সত্য ও জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্য ও জ্ঞানের পূজারী। মহাভারতে তিনি এই সত্য ও জ্ঞানের আদর্শে অবিচল থেকেছেন। শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় তিনি প্রচার করেছেন এই সত্য ও জ্ঞানের বাণী যা সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব হতে অদ্যাবধি মানবজীবনের আদর্শস্বরূপ এবং যার যথার্থ অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে আসতে পারে প্রকৃত সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। আর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি ছত্রে মানুষের জীবনে এই সত্য ও জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করার প্রয়াস। কিন্তু যারা অজ্ঞান, যারা মূঢ় তাদের কাছে এ তত্ত্ব মূল্যহীন। কারণ বর্ণান্ধ ব্যক্তির কাছে বর্ণের প্রভেদ নেই। তাই তাকে বর্ণের প্রকারভেদ বোঝাতে গেলে অজ্ঞানতা বশতঃ তাকে সে অসত্য ব'লেই ভাববে।

৫৩। পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড

বস্তুত মানুষ আজ দিকভ্রষ্ট, তার অন্তরে উচিৎ-অনুচিতের বোধ অবলুপ্ত, সে তার পক্ষে উপযোগী নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম বোঝে না, সর্বভুক বায়সের ন্যায় সে যখন যা পায় তাই ভক্ষণ করে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের বিপরীতধর্মী কর্মে আসক্ত। একই ব্যক্তি শিক্ষকতা করে, শুঁড়িখানায় আকণ্ঠ মদ্যপান ক'রে প্রতিবেশীদের গালাগালি ক'রে উচ্ছন্নে দেয়, সেই আবার রাজনৈতিক পদাধিকারী হয়ে দেশ শোষণ করে, নিতান্ত অসৎ পথে অর্জিত বিপুল অর্থ দিয়ে মন্দির নির্মাণ ক'রে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য পূজার আয়োজন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ খুবই স্পষ্ট ভাষায় শিক্ষা দিয়ে বলেছেন যে মানুষের এহেন আচরণ সঠিক নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের সতের থেকে বাইশ শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে মহান শিক্ষা দিয়ে বলছেন—হে উদ্ধব! সকলের জন্য সব কাজ নয়। যে ব্যক্তি মাটিতে শায়িত আছে, তার আর যেমন পড়ে যাবার ভয় নেই, তেমনই অধঃপতিত ব্যক্তি দুষ্কার্য করলে তাতে তার আর অধঃপতনের ভয় থাকেনা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষদের পক্ষে সেই কাজ একান্তভাবে বর্জনীয় কারণ তার উপরে নির্ভর করে সমাজ। তার পদস্খলন ঘটলে সমাজের অধঃপতন ঘটবে। তাই তিনি উন্নতচরিত্রের মানুষদের কর্মচয়নের ব্যাপারে একান্তভাবে যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন—

সমানকর্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ।।১৭

তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে কোন কোন কাজে তার অধিকার। তাহলেই উত্তরোত্তর তার অন্তর থেকে তার পক্ষে অনধিকার বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ দূরীভূত হয়ে সে ধীরে ধীরে এক পরিচ্ছন্ন মানুষ হয়ে উঠবে। সে তখন তার পক্ষে অশোভন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ-মুক্ত হয়ে যাবে। সেই বিষয়ের প্রতি তার অন্তরে আর কোন মোহ, দুঃখ বা না পাবার বেদনা বা হারাবার ভয় থাকবে না। সে ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারব যে সেই না পাওয়াটাই তার পক্ষে আশীর্বাদ—

যতো যতো নির্বতেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ।।১৮

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা এই মহান শিক্ষার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করি—

'আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই
বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে।'

কোন বিষয়ের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অন্তরে সৃষ্টি করে তীব্র আসক্তি, যার ফলে সেই বিষয়টি অধিকত করার জন্য তার অন্তরে প্রবল বাসনা জাগে এবং বাসনা পূরণের পথে বাধার সৃষ্টি হলে কলহ ও অশান্তির সূত্রপাত ঘটে—

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্।।১৯

কলহ যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তখন তার থেকে সৃষ্টি হয় ক্রোধ যা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে যা পরিণামে তার চেতনাশক্তিকে তমসাচ্ছন্ন করে। এর ফলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর মত আচরণ করে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ফলে তার সমস্ত কিছুই হারিয়ে যায়। বৃক্ষ যেমন জীবিত হলেও জড়পদার্থ বলে বিবেচিত হয়, কর্মকারের হাপরের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বায়ু চলাচল করলেও যেমন সে অচেতন পদার্থ রূপেই থেকে যায়, ঠিক তেমনই অতিরিক্ত বিষয়ান্ধ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মানুষ মৃতবৎ মানুষের সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়; তার কে আপন, কে পর বোধ থাকে না এবং সে সর্বপ্রকারে আত্মবঞ্চিত থেকে যায়—

কলের্দুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রতম্।।২০
তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ।।২১
বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্।।২২

এর দ্বারা কৃষ্ণ এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে এই ধরণের আচরণ সর্বথা বর্জনীয়। সমগ্র মানব সমাজের জন্য এতবড় মহামূল্যবান শিক্ষা বোধকরি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র দিয়ে যায় নি।

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বড় শিক্ষা হল এই যে পবিত্র কর্ম কখনও নিজে একা উপভোগ করতে হয় না, তা অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। নিজে যেমন উত্তরোত্তর পবিত্র কর্মপথে এগিয়ে যেতে হয়, তেমনই অপরেও যাতে তদ্রূপ শুভকর্মপথের প্রতি আকৃষ্ট হয় এই ব্যাপারেও সকলকে সচেষ্ট হতে হয়। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের একত্রিশ শ্লোকে রাজা নিমির প্রশ্নের উত্তরে যোগীশ্বর প্রবুদ্ধ বলেন—

স্মরতঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।

এই তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই লঘুভাগবতে—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে।।

—যে সমস্ত ব্যক্তি কলিযুগে হরির নাম স্মরণ করে বা অপরকে স্মরণ করিয়ে দেয় তারা নিশ্চিতরূপে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। সেটি হল এই যে নারীজাতির সম্মান রক্ষা করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাবতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জীবনের বিভিন্ন কর্ম ও লীলার মধ্য দিয়ে একথা পুনঃপুন প্রচার করেছেন যা বর্তমান যুগে, যেখানে নারীজাতি পদে পদে নরপিশাচদের হাতে লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা হচ্ছে, সকলের জীবনে শিক্ষণীয় আদর্শরূপে পরিগণিত হ'তে পারে। চূড়ান্ত অর্ধার্মিক কৌরবগণ যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ক'রে তাঁকে চরমতম ভাবে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হয়েছিল তখন তাঁর করুণ আর্তিতে সাড়া দিয়ে শ্রীকৃষ্ণই অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর লাঞ্ছনা নিবৃত্তির জন্য। রুক্মিণীকে হরণের পিছনেও ছিল তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে নারীমর্যাদা রক্ষার তাগিদ। ভৌমাসুরের অন্তঃপুরে অপহৃতা বন্দিনী রমণীগণের আর্ত-বিলাপে ধরণী ভারাক্রান্তা হলে ভৌমাসুরকে নিধন ক'রে তিনিই করেছিলেন তার প্রতিকার। সেই অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত ছিন্নমূল নারীগণের প্রকৃত সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিৎ করার জন্য তাঁদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা অর্থাৎ পত্নীত্বের মর্যাদা দান ক'রে তাঁদের সামগ্রিক ভাবে সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই পৃথিবী কেবলমাত্র মানুষের জন্যই নয়। প্রাণ হিসাবে অন্যান্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা সকলের এই পৃথিবীর উপর সমান অধিকার আছে। বস্তুত সকল পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, অরণ্য-পর্বত, নদী-সমুদ্র আদি সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপরই নির্ভর করে সৃষ্টির নান্দনিক সৌন্দর্যের অক্ষুণ্ণতা। কারও প্রতি অযথা হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, অবহেলা বা ঘৃণা নয়। চেতন-অচেতন সকলের প্রতি প্রেম, সকলের প্রতি সহমর্মিতা, সকলের প্রতি সহনশীলতা, সকলের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া-এর মধ্য দিয়েই যেমন একদিকে সৃষ্টি সুন্দর থাকে, অপর দিকে তেমনই এরকম শুভ ও কল্যাণকর চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে উন্নততর মনুষ্যত্বের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত উত্তমরূপে অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে সমগ্র মানব সমাজের কাছে এই বার্তাটিই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তিনি সমগ্র মানুষের অন্তরে সকল জীবের প্রতি প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে বারংবার বলেছেন যে সর্বজীবের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। তাই জীবে উপযুক্ত প্রেম করলে তাঁরই পূজা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের উনত্রিশ অধ্যায়ের চৌত্রিশ শ্লোকে মানবজাতিকে এমনও পরামর্শ দিয়েছেন যে তারা যেন অন্যান্য সকল জীবের মধ্যে তিনি বর্তমান আছেন জেনে সকল জীবকুলকে প্রণাম করে—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।।

আসলে তিনি তো সর্বদর্শী। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে সকল মানুষের অন্তরে সমগ্র জীবের প্রতি অনন্ত প্রেমভাব জাগরিত করার মতো সুক্ষ্ম শুভবোধের উন্মেষ ঘটানো সহজসাধ্য নয়, সাধারণ উপদেশ বা প্রচেষ্টা এবিষয়ে আশানুরূপ ফলদায়ী নয়। কিন্তু তিনি জানেন যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল। কাজেই তিনি যে প্রকৃতই সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করছেন এই বার্তা সকল মানুষের কানে পৌঁছে দিলে সকলেই তাঁর প্রতি অপার ভক্তি বশতঃ সকল জীবের প্রতিও প্রেমপূর্ণ হবে।

বস্তুত এভাবেই তিনি তাঁর সমগ্র কার্যকলাপের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। লোকশিক্ষাই ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান আদর্শ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চুরাশিতম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হয়েছে ঈশ্বর হয়েও তাঁর মানবসুলভ সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল 'জনসংগ্রহঃ' অর্থাৎ লোকশিক্ষা। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাভাষ্যকার শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন—"ঈশিতব্যতাম্ অনীশ্বরতাং কর্মাধিকারিতাং জনসংগ্রহমাত্রমেতদিতি।"

তাঁর সমস্ত কর্মপ্রবাহের মধ্যে বিভিন্নভাবে বারংবার এই লোকশিক্ষার দিকটি প্রকটিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন যে অপরের দারিদ্র কখনও ঘৃণার্হ নয়। তাই তিনি দীন-দরিদ্র ছিন্ন বসন, মলিনকায় কাঙালসম বাল্যবন্ধুকে পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় আপ্লুত ক'রে বাল্য সুহৃদকে যথোপযুক্ত আপ্যায়ন করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য এমনই যে যখনই শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকৃত ভক্ত প্রত্যক্ষ করে যে তার আরাধ্য দেবতার দৃষ্টিভঙ্গি এত উদার, এত স্বর্গীয় তখন এই দৃষ্টান্ত তার অন্তরকে পবিত্র গঙ্গাবারির ন্যায় ধৌত ক'রে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করে এবং সেও শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হয়। ফলে তাঁর এই দৃষ্টান্ত সমাজ সংস্কারের কাজ করে।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত লোকশিক্ষার আকরস্বরূপ। এখানে বর্ণিত অসংখ্য কাহিনী, উপদেশ, ঘটনা, ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি যে লোকশিক্ষার বার্তা বহন করে তা সর্বকালে, সর্বযুগে অতুলনীয়। এক পরিক্ষিতের জীবনকাহিনীর মধ্যেই কত যে লোকশিক্ষার উপাদান নিহিত আছে তা বর্ণনা ক'রে শেষ করা দুষ্কর। জীবনে একটি ছোট্ট ভুল যে কত বড় বিপর্যয় ব'য়ে আনতে পারে তা পরিক্ষিতের জীবনকাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে ভাগবতকার মানবকুলকে বোঝাতে চেয়েছেন। পরিক্ষিতের দ্বারা শমীক মুনির কণ্ঠে মৃত সর্প লম্বিত করার ঘটনা বর্ণনার মধ্যদিয়ে ভাগবতকার সকলের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছেন অহংকার, ঔদ্ধত্য, আবেগ, হঠকারিতা ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কাজ করা উচিৎ নয় যেহেতু তা ভবিষ্যতে দুস্তর দুঃখের কারণ হতে পারে। আবার শমীকমুনির পুত্র ব্রহ্মতেজসম্পন্ন শৃঙ্গী কর্তৃক রাজা পরিক্ষিৎকে অভিশাপদানের

কথা জ্ঞাত হ'লে শমীকমুনি পুত্রকে যা বললেন তাও এক অতি উচ্চমার্গের লোকশিক্ষা যা অনুসরণ করতে পারলে মানুষ এক অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। অভিশাপ দানের কথা শ্রবণ করার পর পুত্রকে প্রথম যে অতি মূল্যবান কথাটি তিনি পুত্রকে বললেন সেটি হল—

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।
অহো বতাংহো মহদজ্ঞ তে কৃতমল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ।।

ভা ১।১৮।৪১

এর দ্বারা তিনি সমগ্র মানবসমাজকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে উত্তমরূপে না ভেবে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ নয় এবং কখনই কাউকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া উচিৎ নয়। এরপর তিনি যে কথাগুলি বললেন তার মর্মার্থ হল যে অপরাধীকে শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অপরাধীর অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা বিচার করা ও তাকে প্রয়োজনে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিৎ যা আধুনিক বিচারব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

বর্তমান জগতে গান্ধীবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবী বিখ্যাত মতবাদ। মহাত্মা গান্ধী সকলকে শিখিয়েছিলেন যে কেউ আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করা উচিৎ নয়। বরং কেউ কাওকে আঘাত করলে তাকে প্রত্যাঘাত না করে তার প্রতি অহিংস আচরণ করা বিধেয়। এই শিক্ষা কোন নূতন বিষয় নয়। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে মানব সমাজে এই মহান শিক্ষা প্রচার করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বাইশ অধ্যায়ে এই মহান শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে—

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিবদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ।।৫৭
নিষ্ঠিতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়োস্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মানাত্মানমুদ্ধরেৎ।।৫৮

—সজ্জন ব্যক্তিকে অসজ্জনেরা অর্ধচন্দ্র প্রদান করে বিতাড়িত করবে, মন্দ ভাষায় অপমানে বিদ্ধ করবে, বিদ্রূপ করবে, নিন্দা করবে, বেঁধে রাখবে, গায়ে থুতু দেবে, তার জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ করে তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করবে এবং তাকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু

অসজ্জনদের এই আচরণে সজ্জনদের ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিৎ নয়। মনে করতে হবে সেই সমস্ত অসজ্জনদের অন্তর প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়নি। তাই যাঁরা নিজেদের আত্মিক উন্নতি ঘটাতে চান তাঁদের বাহ্যিক বলপ্রয়োগ নয়, নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সকল বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার পথ হল আপনার আত্মদৃষ্টি, শারীরিক বলপ্রয়োগ নয়।

অনুরূপ ভাবে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়েও এই একই তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। রাজা পরিক্ষিৎকে অভিশাপ দানের অযৌক্তিকতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শমীকমুনি পুত্র শৃঙ্গীকে বলেন—

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি।।

ভা ১।১৮।৪৮

অর্থাৎ তাঁর ভক্ত প্রতিবাদে সক্ষম হলেও অন্যের নিকট হতে অপমান, বঞ্চনা, অবজ্ঞা, নিন্দা, তাড়না ইত্যাদি লাভ করলেও সেই ব্যক্তির প্রতি কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না।

ফলে যে মহান 'অহিংস' তত্ত্ব প্রচারের জন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বিশ্বজুড়ে সমাদৃত, সেই একই তত্ত্ব হাজার হাজার বৎসর পূর্বে জগজ্জীবের কল্যাণার্থে প্রচার করেছে যে শ্রীমদ্ভাগবত তাকে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতিদান ও শ্রদ্ধা করার অসুবিধা কোথায়?

ভাগবত চেয়েছে মানুষ যেন উন্নত চরিত্রের হয়। অন্তরের সমস্ত কলুষতা, সংকীর্ণতা, নীচতা, দৈন্য অতিক্রম ক'রে মানুষ যেন মহান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে অপরের নিকট হতে প্রাপ্ত সুখ বা দুঃখে অতি উল্লসিত বা ব্যথিত না হয় সেই লোকশিক্ষা তিনি জগতকে দান করেছেন—

প্রায়শ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ।।

ভা ১।১৮।৫০

শ্রীকৃষ্ণ এমনই ক্ষমতাশালী যাঁর ইচ্ছাতেই কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটিত হয়। তিনি মর্ত্যলীলাকালে বহু দুঃসাধ্য সাধন করেছিলেন।

সান্দীপনী গুরুর পুত্রের মৃত্যু হলে তিনি তাকে পুনরায় জীবিত করেন। জড়া নামে যে ব্যাধ তাঁর রক্তিমাভ পদতলকে মৃগমুখমণ্ডল ভ্রমে শরবিদ্ধ করেছিল তাকেও তিনি সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেছিলেন। পরিক্ষিৎ মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে দগ্ধ হলেও তিনি তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এমনই দয়ালু ও শরণাগতবৎসল তিনি। এত ক্ষমতাবান যিনি তিনি ইচ্ছা করলেই নিজের দেহকে চিরকাল সংরক্ষণ করতে পারতেন। শ্রীশুকদেবের ভাষায়—

মর্তেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাং চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্।।

ভা ১১।৩১।১২

কিন্তু তিন তা করেন নি। তিনি তো সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি সম্যকভাবেই সেই পরম সত্যকে জানেন যে আত্মা অবিনশ্বর। তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই। কিন্তু যে জড় দেহের জন্ম আছে, প্রকৃতির নিয়মে একদিন তার পরিসমাপ্তি ঘটবেই। সুতরাং মৃত্যুর জন্য শোক করা বৃথা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার সাংখ্যযোগ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে তিনি অর্জুনকে উদ্দেশ্য ক'রে সমগ্র জগজ্জীবের জ্ঞাতার্থে বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।

অর্থাৎ জীবদেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য স্বাভাবিক ভাবেই আসে, তেমনি মৃত্যুও ঘটে। জ্ঞানী ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না।

শ্রীকৃষ্ণ সম্যক জানেন যে জীবনে যা অবশ্যম্ভাবী সেই মৃত্যুকে বরণের ক্ষেত্রে মানুষ বড়ই বিচলিত বোধ করে। এর মূল কারণ হল সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের নিতান্ত অজ্ঞানতা। তাই তিনি অতি তুচ্ছ আঘাতপ্রাপ্তির ছলে নিজ দেহের অবলুপ্তি ঘটিয়ে স্বধামে প্রত্যাবর্তন ক'রে জগজ্জীবের প্রতি এই বারতা দিয়ে গিয়েছেন যে মানুষ যেমন শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হওয়াকে স্বাভাবিক পরিণতি ভেবে এই তিন অবস্থাকে সাধ্যমত উপভোগ করে, ঠিক তেমনই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক

ভেবে যেন বিচলিত না হন এবং তাঁরা যেন দেহ ধ'রে রাখার জন্য নিষ্ফল চেষ্টায় ব্রতী না হন—

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ম্বন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্।।

ভা ১১।৩১।১৩

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে মৃত্যুর আগমনে বিচলিত বোধ করা কেবল সাধারণ মানুষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। স্বয়ং অর্জুন যিনি অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও তত্ত্বজ্ঞানী তিনিও প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াণে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যদিও পরে শ্রীমদ্ভগবদগীতার উপদেশ স্মরণ ক'রে সংযত হয়ে ছিলেন—

অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ।।

ভা ১১।৩১।২১

এখানে ভাগবতের স্পষ্ট বার্তা এই যে কেউ যদি সঠিকভাবে ভাগবতের উপদেশাবলী অন্তরে গ্রহণ করে তাহলে অর্জুনের মতই নিশ্চিতভাবে তাঁরও অন্তরে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সত্য ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে।

রাজা পরিক্ষিতের মধ্য দিয়ে ভাগবত আমাদের বুঝিয়েছেন যে আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে কারও ভীত বা বিচলিত হয়ে পড়া উচিৎ নয় বরং পরিক্ষিতের মতো সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া উচিৎ। এখানে পরিক্ষিতের দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে এই লোকশিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু এই বার্তার দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়ে যায় না। কারণ এক বার্তা সমাজে অপর ভ্রান্তি বা অপব্যাখ্যার জন্ম দিতে পারে। তাই যাতে মানুষ আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ জেনে অবশিষ্ট সময়ের জন্য অসংযমী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পরিক্ষিতের মাধ্যমে সকলের জন্য এক সতর্ক বার্তা দিয়েছেন—যদি কেউ কখনও তার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ অবগত হয় তাহলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বা খেয়াল-খুশি অনুযায়ী অসৎ কামনা-বাসনা পূরণে তৎপর না হয়ে সৎ-পবিত্র পথে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ যেমন পরিক্ষিত করেছিলেন। পরিক্ষিত সাত দিন পর তাঁর মৃত্যু হবে জেনে মোটেই বিচলিত হন নি বা অবশিষ্ট দিনগুলি যত বেশী

সম্ভব রাজ ঐশ্বর্য ভোগে সচেষ্ট হন নি। বরং তিনি পুত্র জনমেজয়ের হাতে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে দিয়ে শ্রীশুকদেবের নিকট জানতে চান মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের পক্ষে কায়মনে করণীয় নির্দোষ কর্তব্য কি—

তত*চ বঃ পৃচ্ছ্যমিমং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্।
সর্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধং চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ।।

ভা ১।১৯।২৪

সর্বমানবকুলের কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এ এক সুমহান শিক্ষা যা প্রতিটি মানুষের অবশ্য শিক্ষণীয়। পরিক্ষিতের জীবনের সাতটি দিন একটা প্রতীক মাত্র। মহাকালের ব্যাপ্তির কাছে মানুষের জীবনের আয়ু মুহূর্তমাত্র। কাজেই জীবনে আর বিশ/পঞ্চাশটি বৎসর অবশিষ্ট আছে মানে মৃত্যু আসন্ন জেনে পূর্ণ জীবদ্দশা-ব্যাপী সময় রাজা পরিক্ষিতের মতো 'শুদ্ধ', নির্দোষ কর্মে ব্যয় ক'রে জীবনকে সার্থক করা সকলের কর্তব্য এই পরম মূল্যবান উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবত উৎসর্গ করেছেন সর্ব মানবের উদ্দেশ্যে। আর এই উপদেশ যদি সমস্ত মানুষ অন্তর দিয়ে যথাযথ গ্রহণ করতে পারে এবং তা জীবনে অনুসরণ করতে পারে তাহলে তার ব্যক্তিসংসার থেকে বিশ্বসংসার সত্যই স্বর্গে পরিণত হবে। একারণেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে একাদশ অধ্যায় এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা প্রতিটি মানুষের অবশ্য পঠনীয়। এই অধ্যায়ের প্রতিটি শ্লোক, প্রতিটি পদ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ ক'রে তার প্রকৃত মর্মার্থ ও তাৎপর্য যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মানুষের জীবনে বিরাট উন্নতমার্গের পরিবর্তন আসতে পারে যার সুফল দেশ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে গরিমান্বিত করতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করেও যদি সামাজিক অর্থে, মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের উপায় অর্থে, সমাজের অন্ধকারময় কলুষতা দূর ক'রে উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার আলোকবর্তিকা হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবতকে গ্রহণ করা যায় তাহলেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের গুরুত্ব অসীম।

মানুষের নৈতিক চরিত্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে যে মহামূল্যবান উপদেশ সমূহ দিয়েছেন সেগুলি নিম্নে ক্রমানুসারে আলোচিত হল। বোধকরি পৃথিবীর অপর কোন ধর্মশাস্ত্রে, অপর

কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক মতাদর্শে তার ভক্তদের বা অনুগমনকারী বা অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্যে এধরনের স্পষ্ট ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আচরণবিধি উচ্চারিত হয় নি।

তিনি তাঁর ভক্তদের হতে বলেছেন কৃপার প্রতিমূর্তি। তারা যেন কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ না করে, চরম দুঃখেও যেন প্রসন্নচিত্ত থাকে, একমাত্র সত্যই যেন হয় তাদের জীবনের ধ্রুবতারা, কোনরকম পাপ বাসনা যেন তাদের চিত্তে স্থান না পায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন হয় সাম্যবাদী এবং সকলের কল্যাণসাধনই যেন হয় তাদের জীবনের পরম ব্রত—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ।।

ভা ১১।১১।২৯

তিনি তাঁর ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছেন কলুষপূর্ণ কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে, সংযমী, স্বভাবে মধুর ও পবিত্র হতে, সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত উপার্জনে উৎসাহী না হতে, আহার-বিহারে পরিমিতিবোধ রাখতে, প্রকৃতিতে শান্ত হতে এবং স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হতে—

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।।

ভা ১১।১১।৩০

তিনি চান তাঁর ভক্তরা হবে প্রমাদরহিত, স্বভাবে গম্ভীর ও ধৈর্যশীল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ, এবং জন্ম-মৃত্যু তাদের বশে থাকবে, তারা সম্মান পাবার জন্য লালায়িত হবে না কিন্তু অপরকে সম্মান প্রদানে কার্পণ্য করবে না—

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমাঞ্জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ।।

ভা ১১।১১।৩১

অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি মানুষের জীবনের অভিশাপ। এগুলি কেবল যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমানুষেরই ক্ষতি করে তাই নয়, তার দ্বারা সমগ্র সমাজ, জাতি,

দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তিনি তাঁর সমস্ত ভক্তদের আদেশ করেছেন যে তারা যেন কখনও অহঙ্কারী না হয়, দম্ভপ্রকাশ না করে এবং নিজের ভালো কাজের অযথা জয়ধ্বনি ক'রে না বেড়ায়—"অমনিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্।"[৫২] তাঁর সমস্ত ভক্তকে অন্যায় জাগতিক কামনা-বাসনা ত্যাগ ক'রে শান্ত-সংযত হতে এবং সমস্ত জীবের প্রতি দয়াবান ও প্রেমময় হওয়ার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন—

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি যৎ তন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম।।
ভা ১১।১৪।১৭

সাম্যবাদ আধুনিক সমাজের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। কিন্তু ভালো ক'রে ভেবে দেখা দরকার এই সাম্যবাদ সত্যই কি একান্তভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি? হয়তো নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার ক'রে গিয়েছেন—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।
ভা ১১।১৪।১৬

—যিনি কারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না, কারও প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন, সকলকে সমান চোখে দেখেন এরূপ মহাত্মাকে আমি নিত্য অনুসরণ ক'রে থাকি যাতে তাঁর চরণধূলি আমার গায়ে পড়ে এবং আমি ধন্য হ'য়ে যাই।

অর্থাৎ তাঁর জীবনের অন্যতম আদর্শ হল সাম্যবাদ এবং তাঁর ভক্তগণ এই সাম্যবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। ফলে তাঁর ভক্তগণ যখনই অবগত হবেন যে তাঁদের আরাধ্য প্রভু এই রকম মতাদর্শে বিশ্বাসী, তখন তাঁরাও এই মতের অনুরাগী হবেন এতে আর সন্দেহ কি?

তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ যে কত ব্যাপক, কত গভীর, কত উদার তার প্রমাণ তিনি তাঁর স্বমুখ নিঃসৃত বাণীর মধ্যে রেখেছেন—

৫২। (ভা ১১।১১।৪০)।

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।।
ভা ১১।২৯।১৬

এই শ্লোকে তিনি শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর সমস্ত ভক্তদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেছে যে সমস্ত অহমিকা, অপরের দোষ দেখা ইত্যাদি পরিত্যাগ ক'রে চণ্ডালকে পর্যন্ত প্রণাম করতে। তখনকার সমাজের চরম ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চূড়ান্ত সাম্যবাদ এবং প্রচলিত সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যেতে পারে?

তিনি যে পরিপূর্ণ সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা আরও পাই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তাঁর স্বমুখনিঃসৃত বাণী থেকে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৫।১৮

অর্থাৎ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ইতর প্রাণী সকলেরই সমানাধিকারে তিনি বিশ্বাসী। পদমর্যাদা, শ্রেণী, ব্যক্তি অধিকারবলে কারও বিশেষাধিকারের তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন।

আদ্বিজ চণ্ডাল চতুর্বিধ বর্ণ ও আশ্রমস্থ উচ্চ-নীচ সকলের জন্যই তিনি একই আচরণবিধি নির্ধারিত করেছেন, সকলের জন্য একই প্রকার ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, কোন বৈষম্য নেই, কোন ভেদাভেদ নেই। সকল শ্রেণীর, সকল বর্গের ভক্তদের তিনি উপদেশ দিয়েছেন কায়-মন-বাক্যে কারও প্রতি হিংসা না করতে, সত্যে অধিষ্ঠিত থাকতে, চৌর্যবৃত্তি পরিহার করতে, কাম, ক্রোধ, লোভ দমন করতে এবং যে কাজের দ্বারা সমগ্র প্রাণীকুলের প্রসন্নতা ও মঙ্গল সাধন হয় সেই কাজ করতে—

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিকঃ।।
ভা ১১।১৭।২১

সভ্যতার অগ্রগতির একমাত্র উদ্দেশ্য হল পৃথিবীকে আরও বেশী বাসযোগ্য ও উপভোগ্য ক'রে গ'ড়ে তোলা। কিন্তু কি প্রয়োজন সেই উন্নত পৃথিবীর যেখানে থাকবে না নৈতিকতা, উন্নত হৃদয়বৃত্তি, যেখানে শুধু ঈর্ষা, হিংসা, হানাহানি, রিরংসা, আরও বেশী আত্মসাৎ করার অনৈতিক প্রতিযোগিতা, মানবতাবোধ হীনতা, দুষ্ট সংস্কৃতি? আজ পৃথিবীর দিকে দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই চিত্রটিই দৃষ্টিগোচর হয়। তাহলে কোথায় আছে সেই অমৃতবাণী যা পৃথিবীর অন্দরে-কন্দরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে পৃথিবীকে করবে অসূয়ামুক্ত? পৃথিবীর সকলকে আবদ্ধ করবে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে? আছে! শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—তাঁর সমগ্র অবয়ব জুড়ে শব্দব্রহ্মরূপে সদাজাগ্রত প্রহরীর ন্যায় অবস্থান করছে সেই অমৃতবাণী যাকে কর্ণকুহরে সফলভাবে প্রবেশ করাতে পারলে জীবন হয়ে উঠবে সুস্নাত।

জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনই জীবনের এক পরম সত্য। কিন্তু মানুষ যেন মৃত্যুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না বা পারে না যে মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী; কালের খেয়ায় ভেসে সে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এ তার ঘোর অজ্ঞতা আর এজন্যই সে যখন হঠাৎ মৃত্যুর সন্নিকটে এসে পড়ে তখন সে ঘটনার আকস্মিকতাতে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। নিদারুণ ভয় তাকে গ্রাস করে। মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করার মত কোন শিক্ষা বা মানসিক প্রস্তুতি না থাকার জন্য তার সমস্ত কিছু ছিন্নভিন্ন, এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুর মতো অতিবড় রূঢ় বাস্তব সম্বন্ধে শিক্ষা থাকা তার প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত মানুষকে এই অন্যতম অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট মার্গ ব'লে দিয়েছেন—

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ।।

ভা ১১।২২।৪৮

—পিতাকে পুত্রের জন্ম এবং পুত্রকে পিতার মৃত্যু দেখে নিজ নিজ জন্ম-মৃত্যুর অনুমান ক'রে নেওয়া উচিৎ।

ঊনচত্বারিংশ তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল সাধারণ মানুষের জন্যই আদর্শ কর্তব্য নির্দেশ ক'রেছেন তাই নয়। তিনি আদর্শ রাজারও কর্তব্য এবং প্রকৃত রাজধর্মও নির্দেশ ক'রেছেন রাজা যা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে দেশ হয়ে উঠবে স্বর্গসম। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে তাই তিনি বলেন যে রাজার কর্তব্য হল প্রজাদেরকে সন্তানসম প্রতিপালন করা এবং গজপতি যেমন গজকুলকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে, তেমনি রাজাকেও প্রজাদেরকে সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে—

সর্বাঃ সমুদ্ধরেদ্ রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যতা গজপতির্গজান্।।

ভা ১১।১৭।৪৫

বর্তমান যুগেও দেখি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক রাজধর্ম এবং প্রজাকল্যাণ বিস্মৃত হয়ে শাসিতের উপর দমন-পীড়নে প্রবৃত্ত হয়। ফলে যে প্রজা শাসকের দ্বারা রক্ষিত হবার কামনা করে, সেই প্রজাই তার দ্বারা ভক্ষিত হয়। ভাগবতের শিক্ষাকে যদি সরকার পরিচালনার বীজমন্ত্র মন্ত্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহালেই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানুষ যাতে স্বীয় কল্যাণার্থেই কুপথ পরিহার ক'রে চলে তার জন্য পদে পদে শ্রীকৃষ্ণ অতি পরিচিত উদাহরণের মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। লোভ বড় 'বিষম বস্তু'। এই লোভের জন্যই চারিদিকে হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত, নরহত্যা, পররাজ্য আক্রমণ। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ, দেশ থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এর করাল ছায়া। এই লোভের কারণেই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ সকলের সর্বাঙ্গে পুতিগন্ধময় দূষিত ক্ষত সৃষ্টি হয়ে তার সমস্ত গুণ ধ্বংস ক'রে দেয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ হল—লোভ সর্বথা পরিহর্তব্য। সমগ্র বিশ্ব-মানবকুলকে 'লোভ' নামক ভয়ানক রিপুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতি সুন্দরভাবে সকলের কল্যাণার্থে এই বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন—

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্।।
ভা ১১।২৩।১৬

—সামান্য কুষ্ঠ যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর রূপকে কুৎসিত করে, তেমনি লোভ যশস্বী ব্যক্তিদের শুদ্ধ যশ ও গুণীগণের প্রশংসনীয় গুণসমূহকে কলঙ্কিত করে।

এই সৃষ্টি, এই বিশ্ব, এই জগৎসংসার তো শ্রীকৃষ্ণের আত্মানন্দের পরম প্রকাশ। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের ক্রমবিস্তার দর্শনে তাঁর চিত্ত পরমানন্দে পুলকিত হয়। তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে গৃহস্থাশ্রমই ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। তাই তিনি ত্রিগুণাতীত হয়েও মানবরূপ পরিগ্রহ ক'রে গৃহস্থ-ধর্ম পালন ক'রে এই কথাই পুনঃপুন বুঝিয়ে দিয়েছেন—

এবং বেদোদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ।
গৃহং ধর্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্।।
ভা ১০।৯০।২৮

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে 'ধর্ম' অর্থে বেদোক্ত পবিত্র ধর্ম, 'অর্থ' অর্থে পরমার্থ এবং 'কাম' অর্থে নিষ্কাম।

উপসংহার

সভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নতির প্রধানলক্ষ্য তো মানবকল্যাণ। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র মানবকল্যাণকেই প্রকৃত জগতকল্যাণ বলেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হল মানুষ সহ সমগ্র জীবকুল, অরণ্য, বৃক্ষ, লতা এককথায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতন-অচেতন সকলের কল্যাণ। শ্রীকৃষ্ণ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যদি প্রকৃতিজগতের অক্ষত এবং অর্থপূর্ণ সহাবস্থান না থাকে তাহলে মানব সভ্যতা নিবিড় অস্তিত্ব-সংকটের সম্মুখীন হবে। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যাতে তারা বিশ্বাস করতে শেখে যে তাদের প্রভু এই জগতের সমগ্র জীবকুল, চেতন-অচেতন সকলের মধ্যে বিরাজমান। ফলে যাঁরা তাঁর ভক্ত তাঁরা আর কোন দিনই জীবজগত বা প্রকৃতি জগতের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবে না। মানুষের অন্তরে এহেন এক অতি দুর্লভ মানসিকতা তৈরীর ক্ষেত্রে তার এ এক অতীব মূল্যবান অবদান।

মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সম্পর্ক হল আধার ও আধেয়ের। মানুষ হল আধার আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফসল হল আধেয়। আধার যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে আধেয়ের অস্তিত্ব থাকে না। কাগজের পাত্রে অগ্নি সংরক্ষণ করতে চাইলে পাত্রকে রক্ষা করা যাবে না, আবার অগ্নিও পাত্রকে দগ্ধ ক'রে বৃহত্তর ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। তাই প্রকৃত অর্থে মানবকল্যাণের প্রাথমিক ও প্রধান শর্ত হল উন্নত চরিত্রগুণ সম্পন্ন আদর্শ মানবসম্পদ তৈরী করা। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য পার্থিব উন্নতি ঘটাতে পারলেও মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধনে সম্পূর্ণ অপারগ। বিজ্ঞান মানুষের দৈহিক পেশী সবল করতে পারে, কিন্তু হৃদয় বৃত্তিকে স্বর্গীয় সুষমা দান করতে পারে না। বিজ্ঞান মানুষকে তস্কর বানাতে পারে, কিন্তু কখনই তাকে সাধু বানাতে পারে না। একাজ করতে পারে সাহিত্য, দর্শন, ধর্মীয় মূল্যবোধ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে সকল মানুষের অন্তরে এই মূল্যবোধের বীজ রোপণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো অতীব বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি জানেন যে উপযুক্ত মার্গদর্শন ব্যতিরেকে মানুষ কখনও কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই সর্বকালের সর্বযুগের মানুষকে সর্বথা সঠিক পথ পরিচালিত করার জন্য তিনি এক পরম মূল্যবান ও চূড়ান্ত উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন যা প্রকৃত এবং উন্নত মানব-চরিত্র গঠনের পক্ষে অতীব মূল্যবান—

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা ব্যসনানি চ।।
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ।।
ভা ১১।২৩।১৮-১৯

—চুরি, হিংসা, মিথ্যাচার, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংঙ্কার, ভেদবুদ্ধি, বৈরীভাব, অবিশ্বাস, ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য, জুয়া ও মদ্য—মানুষের এই পঞ্চদশ অনর্থের মূল হল ধনসম্পদ। তাই মুক্তিকামী মানুষ সর্বদা স্বার্থ ও পরমার্থ বিরোধী এই অর্থরূপ অনর্থ থেকে দূরে থাকবে।

এই নীতিশিক্ষার মধ্যে কোথাও কি কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি আছে? কোথাও কি কোন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা আছে? কোথাও কি কোন বিশেষ ধর্মমত প্রকাশের বা প্রচারের ইঙ্গিত আছে? নিশ্চয়ই না। এধরনের উপদেশ কোন বিশেষ ধর্মের কুক্ষিগত বিষয় হতে পারেনা। বরং এধরণের উপদেশাবলী যেকোন ধর্মের কাছে সমাদৃত ব'লে বিবেচিত। যদি কোন সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্র নাগরিকদের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই উপদেশাবলী অনুশীলন ও পালনে সার্বিক ও সফলভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তাহলে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভ করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত, লঘু সংস্করণ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লি, ১৯৬৩।

২। ক্ষেমরাজ, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুধর্মোত্তরমহাপুরাণ, দিল্লি, ২০০৭।

৩। গীতা প্রেস, বিবেক-চূড়ামণি (হিন্দি সংস্করণ), শ্রী শঙ্করাচার্য।

৪। গীতাপ্রেস, শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ, একাদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।

৫। গোস্বামী গোপালভট্ট, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ, সনাতন গোস্বামিকৃত 'দিগ্‌দর্শিনীটীকা' সহিত, শ্রীশ্যামাচরণকবিরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

৬। গোস্বামী তুলসীদাস, শ্রী রামচরিতমানস।

৭। গোস্বামী বিপিনবিহারিদেব, শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী, শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী কৃত অনুবাদ সহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক ১৮২৪ শকাব্দে প্রকাশিত।

৮। গোস্বামী বেদান্তভূষণ ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল, শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ, শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে ১৯৫৫ সালে মুদ্রিত।

৯। গোস্বামী, শ্রীধরদেব কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, গোস্বামী শ্রীরূপ।

১০। গোস্বামী ঠাকুর, হিস ডিভাইন প্রেস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীব্রহ্মসংহিতা।

১১। গোস্বামী, সীতানাথ, কঠোপনিষদ্, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।

১২। ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, সাঁইত্রিশতম সংস্করণ, ২০১০।

১৩। চক্রবর্তী, শ্রীনরহরি ভক্তিরত্নাকর, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রী রামদেব মিশ্র কর্তৃক ৪২৬ চৈতন্যাব্দে প্রকাশিত।

১৪। চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বনাথ কৃত টীকা সহিত, গোপালতাপনী, শ্রী রাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থ কর্তৃক সংশোধিত ও শ্রী রামদেব মিশ্র কর্তৃক ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ।

১৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান।

১৬। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, অগ্নিপুরাণম্, ১৮১২ শকাব্দ।

১৭। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, গরুড়পুরাণম্, কলিকাতা ১৮১২ শকাব্দ।

১৮। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, পদ্মপুরাণম্।

১৯। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত বামনপুরাণম্, সম্পাদিত।

২০। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, নবম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১।

২১। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, কলিকাতা, ১৩৯৬।

২২। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, মৎস্যপুরাণম্, শ্রীনটরবর চক্রবর্তী কর্তৃক ১৩১৬ সালে প্রকাশিত।

২৩। তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পাদিত, স্কন্দপুরাণম্, কলিকাতা ১৩১৮ সাল।

২৪। ন্যায়তীর্থ, শ্রীজীব, বিষ্ণুপুরাণম্, কলিকাতা, ১৩৭২।

২৫। পোদ্দার, হনুমানপ্রসাদ, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী, গীতাবাটিকা প্রকাশন, গোরখপুর, প্রথম সংস্করণ।

২৬। প্রভুপাদ, হিজ ডিভাইন গ্রেস এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী, নারদ-ভক্তি-সূত্র।

২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৯।

২৮। বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৭

২৯। বিদ্যারত্ন, শ্রীরামনারায়ণ অনুবাদিত, হরিভক্তিসুধোদয়ঃ, সন ১৩০১।

৩০। ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত, গীতাধ্যান (সমগ্র), একাদশ সমগ্র সংস্করণ, ২০১১।

৩১। ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত, শ্রীমদ্ভাগবতম্, দশমস্কন্ধঃ, দশম সংস্করণ, ২০০৯।

৩২। ভট্ট গোপাল, হরিভক্তিবিলাসঃ, শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৯৮।

৩৩। মহর্ষিপ্রবর গৌতম, গৌতমীর-তন্ত্রম্, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৪। মহারাজ, শ্রীভক্তিজীবন হরিজন শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার।

৩৫। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৭

৩৬। রায়, দিন্দ্রেকুমার চণ্ডীদাস—জীবনী ও প্রতিভাবিশ্লেষণী, ১৩৪০।

৩৭। রায়, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মহাকবি চণ্ডীদাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

৩৮। শর্মা, আচার্য শ্রীরাম নারদপুরাণ, সংস্কৃতি সংস্থান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭১।

৩৯। শাস্ত্রী দোলগোবিন্দ, শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম নিঃসৃত, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯১।

৪০। শাস্ত্রী, পণ্ডিত হৃষিকেষ, বৃহন্নারদীয়পুরাণম্, চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫।

৪১। শাস্ত্রী পাণ্ডেয় 'রাম', শ্রীহরিবংশপুরাণ, (হিন্দি টীকা সহিত); টীকাকার—পণ্ডিত রামনারায়ণদত্ত। অষ্টম সংস্করণ ২০৫২ শকাব্দ, প্রকাশক-গোবিন্দভবন কার্যালয়, গীতাপ্রেস, গোরখপুর।

৪২। শাস্ত্রি, শ্রীশ্রীরাম-শ্রীনির্মলানন্দসরস্বতী পাদটীকা ও বঙ্গানুবাদ সমন্বিত এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামিশাস্ত্রি কৃত বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত, শ্রীশ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্ (জ্ঞানামৃতসারসংহিতা), ১৩৫২ বঙ্গাব্দে সংস্কৃত বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত।

৪৩। শাস্ত্রী, হরিদাস সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ।

৪৪ সিংহ, কালী প্রসন্ন অনূদিত, মহাভারত, প্রথম তুলি-কলম সংস্করণ, ১৯৮৭

৪৫। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস, মহাভারতম্।

৪৬। স্বামী ত্যাগীশানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, মাদ্রাজ কর্তৃক ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ।

English

1. Banerjea, Rev. K. M. The Nārada Pancha Rātra, Asiatic Society of Bengal, Bishops College Press, 1865
2. Goswāmi Padmanābha, Śālagrāma-Śilā, Second Print 1996.
3. Swāmi Mādhavānanda, Edit. Vivekachurāmani, Sri Sankrāchārya, The Advaita Ashrama Mayavati, Almora Himalaya, 1921.
4. Swāmi Prabhupāda, His Divine Grace A. C. Bhaktivedānta, Śrimadbhāgavatam, Canto 1-9.
5. Swāmi Sharvānanda, Taittiriya-Upanishad, The Ramkrishna Math, Mylapore, Madras, 1921.

6. Swāmi Tyāgīśānanda, Śvetāśvataropanisad, Sri Ramkrishna Math, 1994.
7. Wilkins, W. J. Hindu Mythology, Vedic and Puranic, 2nd Edition, Calcutta, 1900.
8. Wilson, H. H. Rgveda Saṁhitā, Edt. Resed by Ravi Pravash Arya, K. L. Joshi, parimal Publications, New Delhi, Foruth Edition, 1916.